এক দিগন্ত দিনান্তের

ফরাসী কবিতা পরিক্রমা

লোকনাথ ভট্টাচার্য



প্রকাশক :
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম. এ.
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদপট শিল্পী : ইন্দু মুখার্জি

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম. এ.
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা ১৩

পূজ্যপাদ পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যকে

এক দিগন্ত দিনান্তের। এ-কথাটাকে একটু আলংকারিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে, বোঝাতে চেয়ে ফরাসী কাব্য-দিগন্তের একটি বিশিষ্ট অংশের রূপ গত শতাব্দীর অন্তে। মুখ্য আলোচ্য যা', তা' ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা।

আবার ঐ শতাব্দীর অন্তটাকেও তার আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ভুল হবে। যেসব কবি আলোচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদিকে আছেন বোদলেয়ার, যিনি শতাধিক বৎসরেরও আগেকার কবি, অন্যদিকে রয়েছেন আজকের স্যাঁ-জন পের্স। তবু যাত্রার পথ বিভিন্ন হ'লেও এঁরা সকলেই চলতে চেয়েছেন একই মন্দিরের অভিমুখে। তাই এঁদের এখানে একত্রিত করা।

এঁদের প্রসঙ্গে দিনান্ত কথাটি প্রযোজ্য আরো এক অর্থে। আজকের কবিতার একটি অতি বৃহৎ অংশ প্রেরণা পেয়েছে এই ফরাসী কবিদেরই দুয়েকজনের কাছ হ'তে। তাঁদের দিনাবসান ঘটেছে, এসেছে আরেকটি দিন, যা' আজকের। কিন্তু সেই গতকালের ও আজকের মধ্যে সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

সেই সম্বন্ধের রূপই আমি উপলব্ধি করতে চেয়েছি, শুধু আমাদের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, আমাদের দেশ ও দেশীয় ঐতিহ্যেরও পরিপ্রেক্ষিতে। যতদূর জানি, ফরাসী সাহিত্য বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ বাংলায় এই প্রথম। এরকম একটি গ্রন্থের প্রয়োজন বহুদিন হ'তে ছিল নিশ্চয়ই, তবে সে-অভাব পূরণ করার যোগ্যতা আমার কতটুকু আছে জানি না।

যে-আটটি প্রবন্ধের সংকলনে এই গ্রন্থ, সেগুলি লেখা ১৯৫৩ হ'তে ১৯৫৩-র মধ্যে। সব কটিই আগে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। 'বোদলেয়ারের পাপবোধ ও আমরা,' 'মায়াবী কবি র‍্যাঁবো' ও 'চলতি কালের ফরাসী কবিতা' প্রকাশিত হয়েছিল "কবিতা" পত্রিকায়। 'স্তেফান মালার্মেঃ ভালেরি-র ও আমাদের চোখে' ও 'লেঅঁ-পল ফার্গ' প্রকাশ করেন "উত্তরণ।" 'জাগ্রতের যে-স্বপ্ন পল ভালেরি-র' ও 'তিনজন ফরাসী কবি, যাঁরা আমাদেরও' বেরোয় "উত্তরসূরী"-তে। এবং "সাহিত্যপত্র" প্রকাশ করেন 'স্যাঁ-জন পের্স।'

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস মহাশয় এই প্রবন্ধগুলিকে একত্রিত ক'রে গ্রন্থ

হিসেবে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে আমার অতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীসুরজিৎ দাস অত্যন্ত যত্নসহকারে বইটির মুদ্রণের দিকটি দেখেছেন—তাঁকেও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

সবশেষে, বানানে একটি প্রবর্তিত নূতনত্ব এখানে অনুসরণ করেছি। ইংরেজি *Z* অথবা দুই স্বরবর্তী ফরাসী *S* ব্যঞ্জনের (যেমন ইংরেজি *Elizabeth*, ফরাসী *Isabelle*) স্থলে ব্যবহার করেছি জ়, এবং ফরাসী *J*-র (যেমন ফরাসী *Joseph*) স্থলে ব্যবহার করেছি জ়।

লোকনাথ ভট্টাচার্য



বোদলেয়ারের পাপবোধ ও আমরা

প্রথমেই বলতে চাই যে পাঠকের রসিক-চিত্তকে আমি কোনো নৈতিক তর্কের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করতে চাই না। আমার প্রবন্ধের বিষয় এমন এক কবির কাব্য, যা সমসাময়িকের কঠোর তর্জনী সত্ত্বেও পরবর্তী কালের কষ্টিপাথরে তার অম্লান অমর স্বাক্ষর এঁকেছে—শুধু তাই নয়, সেই স্বাক্ষরকে দিনে দিনে উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন দেশ বিদেশের বহু পরবর্তী কবি,—এবং তা অভাবনীয় চিন্তা ও অনুভবের মধ্য দিয়ে নতুন পথের দিগ্‌দর্শন দিয়েছে। বোদলেয়ারের কবিতার আলোচনায় আমাদের পরিচিত প্রচলিত অর্থে ন্যায় অথবা অন্যায়ের, ভালো অথবা মন্দের, পাপ অথবা পুণ্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু যা এখানে প্রাসঙ্গিক তা আরো অনেক ভিতরের ও গভীরের জিনিস, তার উৎস অন্তর্জীবন, তাকে বলা যায় সত্তার আন্তরিক ও অন্তঃস্থ নির্যাস, অত্যুক্তির সীমা পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক অর্থে তার নাম দেওয়া চলে অধ্যাত্ম অথবা দর্শন। দর্শন বলছি এই অর্থে যে এক পূর্ণ নির্মল দর্পণের মতো তা ব্যক্তির বহুতর অনুভবকে প্রতিফলিত করে, বিচিত্র আলো-ছায়ার মর্মভেদী দোটানার মধ্য দিয়েই। বলা বাহুল্য, সেই অন্তরের নির্যাসকে অধ্যাত্ম অথবা দর্শন বলব না, যদি সে সৌন্দর্যের পথ ধরে প্রকাশিত হতে না পারে, অন্য হৃদয়ে প্রবেশের পথ খুঁজে না পায়। তাকে দর্শন বলব তখন যখন সেই ব্যক্তিটি হন দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, এবং পরবর্তী বহু অনুচিন্তিত সৃষ্টির জনক। এক কথায় যে সব কবি দার্শনিক—এবং সমস্ত যথার্থ কবিই দার্শনিক—তাঁদের কাব্য ও দর্শনের এই হলো ভূমিকা।

সংক্ষেপে এ কথা বলা সহজ হবে যে বোদলেয়ার তৎকালীন ও পরবর্তী ফরাসী কবিতায় দিলেন তাঁর পাপবোধ, যদিও তার সবটুকুই একান্ত তাঁর নিজস্ব নয়, তার একটি বৃহৎ অংশ তাঁর যুগের দান, যে যুগে বোদলেয়ার বাস করেছেন, এবং যে যুগে আমরা বাস করছি। তবু, যে অংশটুকু তাঁর নিজের, তারই সংযোগে সেই সমগ্র পাপবোধ একটি দর্শন হয়ে উঠেছে, পেয়েছে একটি অশ্রুতপূর্ব ঐক্য ও পূর্ণতা। ফরাসী ভাষার প্রতীকী কবিতা—যার ছায়া পড়েছে জগতের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট সাহিত্যে—তা এই পাপকে দিলো পূর্ণতা, বোদলেয়ারের উৎস থেকে তা নেমে এসেছে আজকের দিন পর্যন্ত, ছুটে চলেছে আগামীর অভিমুখে,

অন্তত তার অনেক অসামান্য লক্ষণে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত আজকের বহু সার্থক, সম্পন্ন কবি ও কবিতা। বাংলা কবিতা ও কাব্যসচেতন বাঙালী সুধী পাঠক সমাজের পক্ষে এটা আমি বলব একটা গর্বের কথা যে আজ আমরা ক্রমশই জাগ্রত হয়ে উঠছি এই অতি বিশেষ ধর্মী কাব্যের বিষয়ে, তা কবিতাতেও অবশেষে খুলে দিয়েছে নতুন জানালা, নতুন দিগন্ত, নতুন অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করেছে। পুনরুক্তি করতে চাই না, তবু বলি ভেরলেন, র‍্যাঁবো, মালার্মে ও ভালেরির মধ্য দিয়ে কাব্যলক্ষ্মী যে বিশেষের মুকুট পরলেন, যা এমন কি পরবর্তী ও আমাদের নিকটবর্তী এলুয়ারের রাজনৈতিক উত্তর জীবনেও দীপ্যমান, তার উজ্জ্বলতম কোহিনূর সেই এক ও একমেবা-দ্বিতীয় শার্ল বোদলেয়ার। এবং কারো যেন নমস্কার করতে দ্বিধা না থাকে সেই প্রহেলিকা-শিশুকে, যাঁর প্রজ্ঞা প্রথম দেখেছিল বোদলেয়ারকে দ্রষ্টাদের প্রথম, কবিদের রাজা হিসেবে। যদিও বাংলা দেশে আমরা ধরেছি এক ধরনের উল্টো পদ্ধতি যাতে আমাদের কয়েকজন আগে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন—কেউ-কেউ হয়তো দীক্ষিতও হয়েছেন—র‍্যাঁবো, মালার্মে বা ভালেরিতে, এবং যদিও বোদলেয়ার স্বয়ং খাপছাড়াভাবে অনূদিত হয়েছেন কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী কবির দ্বারা এর আগেও, ফরাসী প্রতীকী কবিতার উৎসাভিমুখে আমাদের তীর্থযাত্রা আরম্ভ হ'লো অতি সম্প্রতি, বুদ্ধদেব বসুর 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রায় সম্পূর্ণ অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে। সেই অনুবাদের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়, শুধু এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুকে স্মরণ করি অতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, যেহেতু এই প্রবন্ধের কারণ তাঁর অনুবাদ, এবং যে সমস্ত প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে বোদলেয়ার ও বিশেষ করে তাঁর 'পাপে'র সম্বন্ধে, তা বলবার কোনো অবকাশই ঘটত না যদি না এই অনুবাদ বেরোত।

গোড়াতেই শপথ করেছি নৈতিক দ্বন্দ্বের প্রশ্ন তুলব না, সাহিত্যে নীতি বা সাহিত্য ও নীতির সম্বন্ধ নিয়ে সমস্ত আলোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে মরচে-পড়া বুলিমাত্র, বিপুলতার দরুন যার ভার নিশ্চয়ই অনেক, কিন্তু যাতে আর ধার নেই। না, এ প্রশ্ন নীতির নয়, সুন্দরের, প্রশ্ন পাপের, পাপ ও সুন্দরের সম্বন্ধ নিয়ে। সমস্যাটি এত সূক্ষ্ম, এত বেশি অন্তরের যে কোনো নিরপেক্ষ বিচার এ বিষয়ে হয়তো সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমার পক্ষে তো নয়ই, কেননা আমার জ্ঞান ও বিচারশক্তি অতি পরিমিত, আর উপরন্তু আমি হয়তো নিজেই ইতিমধ্যে এই পাপের মোহে মুগ্ধ, তার মাহাত্ম্য ও গৌরবের সামনে নতজানু। এবং

আমি জানি এই মুগ্ধতায় হয়তো বিক্ষোভের বা অস্বস্তির কোনো কারণ নেই, যদি এই পাপবোধের মধ্যে আমরা দেখতে পাই নতুন প্রাণের চেতনা, প্রকাশের ও প্রকাশভঙ্গির নতুনতর সম্ভাবনা। জানি, বুদ্ধদেব বসুর মতো যাঁরা আশা রাখেন যে বোদলেয়ারের এই 'পাপের ফুল' বাংলা কবিতায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে, তাঁদের বিরুদ্ধে বলার হয়তো আমার কিছুই নেই, উল্টে হয়তো তাঁদেরই আমি পক্ষপাতী।

তবে দ্বন্দ্বটা কিসের? জানি না, হয়তো এটা দ্বন্দ্বই নয়—শুধু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এবং কিছুকাল ধরে বড়ো বেশি করে কেবলই মনে হচ্ছে, যে এই পাপবোধ, বিশেষ করে তাকে যে অভিনব রূপ বোদলেয়ার দিলেন, এবং এই নতুনের চেতনা—এ আমাদের একটি সম্পূর্ণ বিপরীতের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে, যে বিপরীতকে আমরা ভারতে এতদিন ধরে শুধু যে স্বীকার করিনি, তাই নয়, তাকে চিনিনি, জানিনি, না আমাদের বৃহত্তর বা দৈনন্দিন জীবনে, না আমাদের কাব্যে ও দর্শনে। এবং এই না চেনার দরুন আজকের এই আলিঙ্গনে হয়তো কী এক আধ্যাত্মিক বিক্ষোভে আমাদের জাগতে হবে একদিন, না কি স্থির নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছবো এক মহত্তর শান্তি ও সুষমায়, তা নিয়ে দূর-কল্পনা করার আগে আমি একটু থিতিয়ে দেখতে চাই এই পাপের রূপ কী, এবং তার সামনে আমাদের এতদিনের আমরা কোথায় দাঁড়াই। তাঁরা আমায় ক্ষমা করবেন যাঁরা ভাববেন আমি সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি করছি এক অবাস্তব সমস্যার উত্থাপন করে, কেননা আমি মানি যে অপরিচিতের পরিচয়ের মধ্যেই ভবিষ্যতের সংকল্প নিহিত থাকে। তাঁদের ধৈর্য প্রার্থনা করে আরো একবার বলি, এখানে কোনো ওষুধ আমি বাৎলাচ্ছি না, আসলে কোনো রোগ বলেই মানছি না এটাকে।

আমার আলোচ্য বিষয় বোদলেয়ারের জীবন ও পাপবোধ, ও তার সঙ্গে তাঁর কাব্য ও জীবনদর্শনের সম্বন্ধ, পরে, সংক্ষেপে, পাশ্চাত্ত্য দেশে পাপের সনাতন রূপ, এবং অবশেষে, পাপ ও ভারত। আগেই বলেছি. আমার জ্ঞান ও অনুভবের ক্ষমতা সামান্য—যাঁরা আরো বেশি জানেন, আরো অনেক বেশি অনুভব করেন, তাঁরা ক্ষমা করবেন। এই পাপবোধের তীব্রতা ও তার একান্ত অভাবের প্রসঙ্গে যে-দুইটিকে এত ভিন্ন করে দেখছি, হয়তো তারা আসলে সৃষ্টির অচ্ছেদ্য অদৃশ্য ঐক্যের মধ্যে এক, এবং তা-ই যেন হয়, এই প্রার্থনা করি।

চমকে না গিয়ে উপায় নেই—এবং এই চমক কথাটার ওপর একটু জোর

দিতে চাই—যখন পড়িঃ

'চিরকালের নিখিলমানব দুটি পরস্পরবিরোধী সমান্তরাল ও যুগপৎ সুরে সাড়া দেয়—একটি ধাবিত হয় ঈশ্বরের দিকে, অন্যটি শয়তানের উদ্দেশে। যা ঈশ্বরের স্তুতি বা আধ্যাত্মিকতা, তাতে ধ্বনিত হয় উর্ধ্বা-রোহণের বাসনা, আর শয়তানের আহ্বান, যা পশু ধর্ম, তার আনন্দ অবতরণের।' অথবা তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি বোদলেয়ারের উপদেশে, 'ঘৃণার ব্যবহারে কৃপণ হওয়া চাই, কারণ ঘৃণা মহামূল্য সুরা, তাতে নিহিত আমাদের রক্ত, স্বাস্থ্য, নিদ্রা ও আমাদের প্রেমের দুই-তৃতীয়াংশ'।

কবির কবিতা ও দর্শন তাঁর জীবন থেকে অবিচ্ছেদ্য, এ কথা সাধারণ-ভাবে সত্য—বোদলেয়ারে তা সত্য অসাধারণভাবে। তাঁর পাপবোধ, তাঁর নির্বেদ, অতি তিক্ত বৈরাগ্য, যা ফুল হয়ে ফুটেছে তাঁর কাব্যে, তার শিকড় তাঁর জীবনে—তাই তাঁর বিশিষ্ট সমালোচকমাত্রই তাঁর জীবনের ব্যাখ্যায় বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন। বোদলেয়ার নিজেই কি অসংখ্যবার বলেন নি, 'এক নির্জনতার অনুভূতি আশৈশব আমার সঙ্গী। আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার সত্ত্বেও—এবং বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও প্রায়ই—আমি অনুভব করেছি আমার সেই চির নির্জনতার নিয়তি।' আবার, ১৮৫৪-এর একটি চিঠিতেঃ 'জানি আমার জীবন একেবারে প্রথম থেকেই অভিশপ্ত হয়েছে, এবং তা-ই তা থাকবে চিরকাল। তবু, জীবন ও ইন্দ্রিয়ের পিপাসা আমার প্রচণ্ড।'

এই দ্বৈতের অনির্বাণ সংঘাতেই জেগেছে তাঁর অদ্বৈত পাপের ফুল। অভিশপ্ত জীবন? কেন, কী করে? খুব সংক্ষেপে সেই জীবন হ'লো এই।

১৮২১-এর এপ্রিলে শার্ল-পিয়ের বোদলেয়ারের জন্ম হল পারী শহরে। পিতা জোসেফ-ফ্রাঁসোয়া বোদলেয়ার, কারিগর-শিল্পী, ১৮২১-এ যাঁর বয়স ৬১ বছর, ও মা কারোলিন দ্যুফে, বয়স ২৮। বাবা মারা গেলেন, কবি যখন ছয় বছরের শিশু। বছর না ঘুরতেই মা আবার বিয়ে করলেন ওপিক নামে সেনাবিভাগের এক পদস্থকে। এই ঘটনাটিতে কবির শিশুমন মর্মাহত হ'লো, তা তাঁর পরের ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনে ফেলল এক করাল ছায়া ও প্রভাব। পরে তাঁকে বলতে শুনি, 'আমার মতো ছেলে যাঁর থাকে, তাঁর কি আবার বিয়ে করা সাজে?'

এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে, ১৮৩৩ সালে, লিঅঁ-র এক শিক্ষালয়ে বোদলেয়ার ঢুকলেন ছাত্র হয়ে। তখন থেকেই দেখা দিল সেই নির্জনতা ও বিষণ্ণতার অনুভূতি, যা কবিকে মুক্তি দেবে শুধু তাঁর মৃত্যুকালে, কিন্তু তাঁর কাব্যের সঙ্গ যা কখনো ত্যাগ করবে না, কেননা সে কাব্য

অমর। বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়, যা প্রায়ই সহজ বাদানুবাদের চেয়েও প্রকটতর রূপ নেয়।

১৮৩৬-এ পারীতে প্রত্যাবর্তন ও কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশুনো। ইতি-মধ্যেই ভাবী বোদলেয়ারের ব্যক্তিত্বের ধীরে ধীরে উন্মেষ হচ্ছে। একটি দুটি কবিতা লেখা আরম্ভ হ'লো। তখনকার এক বন্ধু তাঁর সেই জীবন সম্বন্ধে বলেছেন, 'চিত্ত অসংযমী, দুর্বোধ্য চালচলন, মিস্টিক, সন্দিগ্ধ ও সমস্ত নীতিজ্ঞানের শৈথিল্যে তার এক মাত্রা ছাড়ানো গর্ব, কবিতা-পাগল, মুখে উগো-গোতিয়ে প্রভৃতির কবিতা লেগেই আছে, এক কথায় আমাদের অনেকের কাছে তাকে মনে হ'ত একটু বিকৃত মস্তিষ্ক।'

১৮৩৯-এ, পড়াশুনো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, ভীত বিচলিত পিতামাতার প্রতি তাঁর ঘোষণাঃ সাহিত্যই হবে তাঁর জীবনের ব্রত। এই সিদ্ধান্ত, যা থেকে পরবর্তী জীবনে একদিনের জন্যেও তিনি নড়েননি, সেনাধ্যক্ষ ওপিক-কে বিশেষ রুষ্ট করেছিল। সেই মনোমালিন্য চলবে সারা জীবন, সেনাধ্যক্ষের মৃত্যু পর্যন্ত, মাঝে মাঝে দু একটি অতি ক্ষণস্থায়ী আপোস সত্ত্বেও। তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে স্বপ্ন দেখা, জীবন দর্শন গড়ে তোলা, তৎকালীন ফরাসী সাহিত্যজগতের তরুণ ও প্রখ্যাতদের (বালজাক যাঁদের অন্যতম) সংস্পর্শে আসা। বাহির যেহেতু ছায়া ফেলে অন্তরে, তাই পোশাক-পরিচ্ছদও বদলাতে হবে, বিশিষ্ট হতেই হবে সব বিষয়ে। অতএব তাঁর প্রচেষ্টা 'ড্যান্ডি' হবার, যার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতাকে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করবেন। কুখ্যাতি ও নিন্দায় গৌরব বোধ করা, কারণ তা অস্বাভাবিক ও অসাধারণ, বোহিমিয়ান সমাজে ঘোরা। ১৮৪০-এ সংসর্গ ঘটল এক ইহুদি যুবতী বেশ্যার সঙ্গে, নাম সারা, পরিচিত লুশেৎ ব'লে, সম্ভবত যার প্রসাদে তিনি আক্রান্ত হলেন উপদংশ রোগে। এই রোগই তাঁর প্রাণ নেবে একদিন।

কোনো যুবকের পক্ষে স্বেচ্ছায় গণিকার কবলে পড়ায় তেমন আশ্চর্যের কিছু নেই, তবে বোদলেয়ারে তার রূপ স্বতন্ত্র কেননা, তা আগে থেকেই নির্বাচিত, তার পিছনেও আছে চিত্তের অনুশীলন, তাঁর দর্শন। এখানেও তাঁর মায়ের পুনর্বিবাহ এক প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। মাকে তিনি সারা জীবন ঘৃণা করেছেন অপরের স্ত্রী ও শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে, তাঁর নিজের পিতার স্ত্রী বলে নয়। হয়তো সম্ভব, কেউ কেউ ভেবেছেন, তাঁর পিতার মৃত্যুর ঠিক পরেই বোদলেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে একই বিছানায় শুতেন তাঁর মা—হঠাৎ এক অভিশপ্ত দিনে তাঁর সেই স্থান এসে কেড়ে

নিল কোথাকার এক অপরিচিত অন্য পুরুষ, আর সেই সঙ্গে যেন মায়ের হৃদয়ের কোণ থেকেও শিশু বোদলেয়ার নিজেকে বিতাড়িত হতে দেখলেন। এই ঘটনায় নরনারীর যৌনতা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটার ওপরই তাঁর মন এমনভাবে বিগড়ে গেল যে পরে ধীরে ধীরে তাঁর দর্শন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল এ কথা ভাবতে যে যাকে বলা হয় ন্যায্য যৌন সম্ভোগ, তথাকথিত বিবাহিত নরনারীর মধ্যে, তা অনিবার্যভাবে পৈশাচিক ও গভীরতর এক পাপ, কারণ তাতে পাপকে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে ন্যায়ের নাম দিয়ে। হয়তো অস্পষ্টভাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়েই লুশেৎ-এর আলিঙ্গনে তিনি ধরা দিয়েছিলেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বোদলেয়ার খৃষ্টীয় ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মেছিলেন ও বড়ো হয়েছিলেন—যে-ধর্ম তাঁকে আগে শিখিয়েছিল পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে ধবধবে শাদা ও কুচকুচে কালোর মতো পরিষ্কার উপদেশ। প্রথম সম্ভোগে তিনি জেগে উঠলেন এক মিশ্র চেতনায়, অনুভব করলেন শ্লীলতাহানির চরম লজ্জা, নিষিদ্ধ ইন্দ্রিয়সুখের গ্লানি। কিন্তু দীক্ষা যখন ঘটল একবার, তখন আর নিষ্কৃতি রইল না। আবার অন্যদিকে, এই উজানের পথে জেগে উঠল এক বিচিত্র আনন্দানুভূতি, এক ধরনের মুক্তি, পরিবারের কঠোর দৃষ্টি থেকে, সমাজ ও নীতির কবল থেকে, গতানুগতির শৃঙ্খল থেকে। এক কথায়, এ যেন সচেতন হয়ে পাপচর্চা, পাপে আনন্দবোধ। পরে বোদলেয়ার বলবেন, প্রেমের আনন্দই এই যে নরনারী সজ্ঞানে পাপ করে, তাকে পাপ বলে জেনেই।

বলা বাহুল্য, কবির এ সব কীর্তি তাঁর মাতা ও বিপিতার মনে সুখের সঞ্চার করে নি। তাঁরা শঙ্কিত হয়ে ছেলেকে এক দূর যাত্রায় পাঠাতে মনস্থ করলেন। বর্দো থেকে জাহাজে চেপে কবি চললেন কলকাতার দিকে, কিন্তু শীঘ্রই এই যাত্রায় তাঁর এমন অরুচি ধরল যে ভারতে পৌঁছনোর বহু আগেই তিনি ফিরতি পথ ধরলেন। কিন্তু যাত্রা একেবারে ব্যর্থ হলো না, কারণ তা তাঁর পরবর্তী কাব্যে ক্রমাগত প্রতিধ্বনি তুলবে তপ্ত জলবায়ুর আবেশের, তন্বী কৃষ্ণাঙ্গীদের প্রতি কামনার।

১৮৪২-এ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন। আগামী তিন বছর কাটবে আরামে, অপব্যয়ে, পূর্বের ঋণ শোধ করে, ও অধ্যয়ন ও নতুন কবি সাহিত্যিকদের সংস্পর্শলাভে। আলাপ হবে গোতিয়ে, স্যাঁৎ ব্যভ ও ভিক্তর উগো-র সঙ্গে। এই সময়েই প্রথম পরিচয় অন্য এক তরুণী গণিকার সঙ্গে, নাম জ়ীন দ্যুভাল, রূপে গুণে কোনো দিক দিয়েই যাকে অসাধারণ বলা চলে না, উপরন্তু

অশিক্ষিত, নির্বোধ, এবং যে বোদলেয়ারের প্রতি অবিচ্ছিন্ন আনুগত্যেও নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি সারা জীবন—যদিও কবির জীবনে ও কাব্যে তার প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী, কবি তাকে কখনোই একেবারে ত্যাগ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, এই আধা নিগ্রো আধা ইউরোপীয় রমণীর হাতে কবিকে সারা জীবন আর্থিক কারণেও নিগ্রহভোগ করতে হয়েছে। আবার এই সময়েই শোনা যায়, বোদলেয়ার নেশার চর্চা সুরু করেন, বিপজ্জনক গঞ্জিকা ইত্যাদি সেবন করে—স্বেচ্ছায়, জোর করে, শিখে নিতে চান, যারা এই সবে মাতে, তারা কেমন করে মাতে, কী তাদের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, ইত্যাদি।

তাঁকে নিয়ে ওপিক-দম্পতির চিন্তার শেষ নেই। ছেলে পয়সা ওড়াচ্ছে দু হাতে—ওপিক তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়ে এক তৃতীয় ব্যক্তি নিয়োগ করলেন, যার মধ্যস্থতায় কবি পাবেন তাঁর মাসিক প্রাপ্য। ১৮৪৫-এ ঘটল সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ আগমন, প্রকাশ করলেন সেই বছরের সালঁ, বা চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনা। ১৮৪৬-এ দুটি কবিতার প্রকাশ, তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি উপদেশ নামে একটি নিবন্ধ রচিত হ'লো।

একটির পর একটি রচনার প্রকাশ হ'তে লাগল। রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ, যা এলো যেমনি হঠাৎ, যাবেও তেমনি। ১৮৪৬-এ আমেরিকান কবি এডগার পো-র রচনার সংস্পর্শে এলেন, যার দ্বারা তিনি অশেষ লাভবান হবেন ও যার অনুবাদ তিনি পরে সতেরো বছর ধরে করতে থাকবেন। মার্কিন কবির দর্শন তাঁর আত্মস্থ হলো, সেই কবির মধ্যে একভাবে তিনি নিজেরই মানস আবিষ্কার করলেন।

কিন্তু পরে, ব্যক্তিগত জীবনে, সংস্পর্শে এলেন অভিনেত্রী মারী দোব্র্যাঁ-র। একই সময়ে, মাদাম সাবাতিয়ে-র প্রতি এক দুর্নিবার আবেগের জন্ম, যাঁকে কবি বেশ কিছুকাল ধরে বেনামে কবিতা ও প্রেমপত্র পাঠাতে থাকবেন। এই সময়ে উপন্যাস লেখার বাসনা জাগে তাঁর, যা কার্যে পরিণত কখনো হবে না। চলতে থাকল তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ও অবশেষে, রভ্যু দে দো মঁদ-এ, আঠারোটি কবিতার প্রকাশ, যা পরে 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর অংগীভূত হবে।

১৮৫৭-তে খুঁজে পেলেন এক প্রকাশক, নাম পুলে-মালাস্‌সি, যিনি রাজি হলেন 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রকাশে, ও যাঁর সংগে কবির সৌহার্দ্য থাকবে আমরণ। কিন্তু বইটি বেরোনোর সংগে সংগে পারীর অন্যতম দৈনিক 'ফিগারো' তাতে দেখলেন দুর্নীতির চরম। মামলা আরম্ভ হ'লো প্রকাশক, মুদ্রক ও কবির বিরুদ্ধে। তাঁর বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কবি নিষ্কৃতি

পেলেন না। কিছু জরিমানা হ'লো, শুধু তাই নয়, বইয়ের ছয়টি কবিতা অপসারিত করার নির্দেশ দেওয়া হ'লো। উচ্ছ্বসিত হয়ে ভিক্তর্ উগো লিখলেনঃ 'এই শাস্তিদানে সরকার আপনাকে মণ্ডিত করলেন এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে, তাঁদের ন্যায়ের দ্বারা তথাকথিত নীতির ওজুহাতে আপনাকে দণ্ড দিয়ে—এই শাস্তি আপনাকে পরালো আরো একটি মুকুট'। উত্তরে বোদলেয়ার বললেন, 'আমি জানি, এখন থেকে সাহিত্যের যে কোনো ক্ষেত্রেই হাত দিই না কেন, আমি থাকব এক অসুর হয়ে।' কিন্তু মালাস্সি-কে লিখেছেন পরে, ১৮৫৯-এ, 'জানি আমার ফ্ল্যর দ্যু মাল নিশ্চয়ই বাঁচবে', এবং মাকে ১৮৬১-তে, 'প্রথমবার আমার জীবনে আমি নিজেকে প্রায় সন্তুষ্ট বলতে পারি। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ অন্তত ভালোর কাছাকাছি হবে, এবং তা থাকবে এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর প্রতি আমার চরম ঘৃণা ও বিরাগের শেষ জবানবন্দি হ'য়ে।'

অবশ্য বইটি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই মাদাম সাবাতিয়ে-র কাছে এতদিনের বেনামি কবি ধরা পড়ে গেলেন। আরম্ভ হ'লো আবার এক নতুন প্রেম ও বিতৃষ্ণার নাটিকা। যার যবনিকা নামল অতি শীঘ্র। কবি লিখেই চলেছেন চিত্রকলার বিষয়ে, এবং তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা— শুধু মাঝখানে একবার, ১৮৬১-তে, ফরাসী আকাদেমীর সভ্য হতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ভাগ্যে প্রার্থীর তালিকা থেকে নাম তুলে নেন আগেই, নয়তো নির্বাচনে তাঁর পরাজয় ছিল নিশ্চিত।

১৮৬২-এর গোড়া থেকেই স্বাস্থ্য খুব খারাপ হতে আরম্ভ করলো। কৈশোরে যে যৌন ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এবং যা থেকে এতদিন ভুল করে ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন, তা তার চরম পর্যায়ে তাঁর দেহকে অধিকার করে বসল। কবি লেখা ছেড়েছেন, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। এক সন্ধ্যায় তাঁকে এইভাবে এক নাচঘরের সামনে ঘুরতে দেখে একজন জিজ্ঞাসা করেন, 'এ কী, বোদলেয়ার, কী করছেন আপনি এখানে?' বোদলেয়ার বলেন, 'মৃতদের মাথার মিছিল দেখছি।'

এদিকে আর্থিক দুশ্চিন্তাতেও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ঋণ বেড়েই চলছে, পারী থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। কী খেয়াল হ'লো, বেলজিয়ামে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে অর্থোপার্জন করা যায় না কি? গেলেন বেলজিয়ামে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু হ'ল না। রোগও বেড়েই চলেছে। একদিন হঠাৎ নাম্যুরের এক গির্জের সামনে হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ব্রাসেলে নিয়ে আসা হ'লো—ইতিমধ্যে বাক্শক্তি লোপ পেয়েছে, যদিও বুদ্ধি বিবেচনা স্মৃতিশক্তি সব ঠিকই

আছে। দেহের এক অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, জীবনের অবসান আসন্ন। এক বছর এইভাবে পড়ে থাকার পর মৃত্যু হ'লো প্যারীতে, ৪৬ বছর বয়সে, ১৮৬৭-র ৩১শে অগস্ট তারিখে।

মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে লিখেছিলেনঃ 'যেমন শরীরে, তেমনি চৈতন্যে, আমি সারা জীবন অনুভব করেছি এক অতলস্পর্শ গহ্বরের শূন্যতা, যা শুধু ঘুমের শূন্যতাই নয়, শূন্যতা কর্মের, স্বপ্নের, স্মরণের, বাসনার, অনুতাপের, মনস্তাপের—সেই শূন্যতার অনুভূতি আমার সুন্দরকে নিয়ে, সংখ্যার ধারণা নিয়ে...'। যেমন আনন্দে, তেমনি ভয়ের সঙ্গে চর্চা করেছি আমার মূর্ছার। চিরকালই আমি ঘূর্ণিরোগগ্রস্ত, এবং আজ, ১৮৬২-র ২৩শে জানুয়ারীতে, পেলাম এক অভূতপূর্ব সাবধান বাণী—দেখলাম, উন্মত্ততার ডানার ঝাপট বয়ে গেল আমার ওপর দিয়ে।'

শাতোব্রিয়াঁ ও বায়রনের বিষাদের উত্তরাধিকারী হয়ে, ভিইনি-র আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যে ও ফ্লোবের এবং ল'ক্ত দ্য লিল-এর সৌন্দর্যের শূন্যবাদের প্রভাবে, বোদলেয়ার ধরে নিয়েছিলেন যে এই পৃথিবীর সব কিছুর মূলে রয়েছে মন্দ, খারাপ, এক চরম প্রসৃত পাপ। শুধু, যা অন্যদের কাছে ছিল একটি দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যস্ত চিন্তার রূপ মাত্র, বোদলেয়ার তাকে গভীর যুক্তির দ্বারা রীতিমতো এক জীবনদর্শনে পরিণত করলেন। সমাজ যদি মন্দমুখী তো তার সংস্কার সম্ভব, কিন্তু তা করে লাভ নেই, মনের মধ্যে গুটিয়ে বসে নিজের বিষণ্ণ নিয়তির কথা ভেবে এক বিচিত্র আনন্দ পাওয়াও চলে, কিন্তু তাও বোদলেয়ার করলেন না। উল্টে তিনি নিজেকে দেখলেন অন্য সকলের মতোই একজন মানুষ হিসেবে, বিষণ্ণ, দুঃখভারে জর্জর ও এমন এক পাপে আক্রান্ত যার হাত থেকে উদ্ধার নেই। বিষণ্ণ, কেননা পতিত, দূষিত, কেননা মন এক নাম না জানা হারানো সুখের দিকে বৃথাই শক্তি চেয়ে, শান্তি চেয়ে, সামঞ্জস্য চেয়ে চিরধাবমান। কিন্তু সকলের হয়ে কথা বলার এত বড়ো অধিকার তাঁকে কে দিল? এইখানেই আত্মচেতনা, অহংবোধ, যা ব্রহ্মাস্ত্র, শুধু তাঁরই নয়, তাঁর অনুগামী পরবর্তী সকল কবির।

তবে মানুষের নিয়তিই যদি এই পাপ, তা হলে প্রচেষ্টায় লাভ কী?—পরে যেমন র‍্যাঁবো বলেছিলেন, সকল প্রয়াসেই কি মরণ নাচবে না এলোমেলো? এই পাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, না প্রেমে, না মরণে, না দেশান্তর যাত্রায়, এবং এই প্রচণ্ড দুঃখবাদ কি হেসে উড়িয়ে দেবে না মানুষের এতদিনের জয়ধ্বজাকে, দুয়ো দেবে না রোমান্টিকদের অতি-

চর্বিত অতিবাঞ্ছিত আবেগ-অনুভূতিকে? কিন্তু মজা হচ্ছে এই, এবং বোদলেয়ারের ব্যক্তিগত দ্বৈত দ্বন্দ্বের মাহাত্ম্যই এই, যে এই দুঃখবাদকে ভিত্তি করে, ও তা সত্ত্বেও, তাঁর অকূল নৈরাশ্য, পতন ও অনুশোচনাকে তিনি নিমিত্ত মাত্র ও পথ হিসেবে ধরে নিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন আবিষ্কার করতে তাঁর সুন্দরকে, যে-সুন্দর এই পৃথিবীর সকল নীচতাকে জয় করেছে, যার বিভা দিব্য, এবং সব পার্থিব ও প্রাকৃত আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা যার এক অস্বচ্ছ বিলাপকারী দর্পণ বই নয়। তাই তিনি চাইলেন যে তাঁর আর্ট, অর্থাৎ তাঁর সুন্দর, তা সমস্ত মানুষী প্রেরণাকে আলিঙ্গন করে ও এক তীব্র নিখাদে স্বর তুলে, মেলাবে উচ্চতম মিনারে সব অনুপ্রেরিতদের, বুদ্ধির সীমানা পেরিয়ে আপাত-বিভিন্নের সম্মিলন ঘটাবে সে প্রতীকের স্পর্শে—শব্দ হোক, স্পর্শ হোক, বর্ণ হোক আর গন্ধই হোক, তারা বলবে এক ভাষা, মিলবে এক হয়ে সুন্দরের জাদুদণ্ডে, কবির মধ্যস্থতায়। কবি ও সুন্দর এক নয়, শুধু তার চেতনায় সুন্দর জাগিয়েছে কবিকে। তাই, বোদলেয়ারের মতে, কবির কর্তব্য হ'লো এই আপাত-বিভিন্নের মধ্যে যে-সত্য এক ও গূঢ়, তাকে আবিষ্কার করা, প্রকাশ করা। এবং যেহেতু তা চিরাচরিতের পথে সম্ভব নয়, যা আছে বা হচ্ছে বা হতে পারে তার বর্ণনায় বা প্রশস্তিতে তা নেই, তাই কবিতার যেন শক্তি থাকে চমকে দেবার, মানসিক শান্তি ও স্থিতিকে বিচ্ছিন্ন করে গূঢ়কে উদ্ঘাটন করার। তা যেন বিদ্রূপ করতে পারে চিরাচরিতকে, তা যেন ঘৃণা জাগায় ও ঘৃণায় জেগে ওঠে। এবং যেহেতু সব কিছুই পাপ এই পৃথিবীর, সুন্দরের প্রকাশ ঘটতে পারবে শুধু পাপের মধ্য দিয়ে—পাপ হলো সুন্দরের একটি অতি বিশিষ্ট, অতি প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

হয় সবই ভালো, নয়তো ভালো মন্দের সংমিশ্রণ এই পৃথিবী, অথবা সবই মন্দ, যুক্তিতে এই তিন ধরনের দর্শন সম্ভব। এর মধ্যে প্রথমটির প্রশ্ন বোদলেয়ারে ওঠেই না, কিন্তু বাকি দুটির পরস্পরের মধ্যে ঐক্য না থাকলেও তাদের যুগপৎ অস্তিত্ব তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়, যদিও যেখানেই তিনি মন্দের সঙ্গে ভালোকেও মেনেছেন, সেখানে অন্তত প্রচ্ছন্নভাবে দেখিয়েছেন ভালোর ওপর মন্দেরই জয়, মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য। কখনো তাঁর সুন্দর নেমেছে আকাশ থেকে, কখনো অতলস্পর্শী পাতাল থেকে উঠেছে সে, সে একই সঙ্গে দিব্য ও নারকী, কখনো তিনি সুন্দরের সবচেয়ে সম্পূর্ণ রূপ খুঁজে পেয়েছেন শুধু শয়তানেরই মধ্যে। এই মন্দ ও ভালো-মন্দের যুগপৎ অস্তিত্বের যে-বেসুর বেজেছে তাকে ক্ষীণ বলব

সেই বেসুরের তুলনায়, যা তাঁকে পাপের প্রকাশের মধ্য দিয়ে ছুটিয়েছে আমরণ দিব্য বিভার সুন্দরের অনুসন্ধানে। এই জীবন দর্শন হয়তো সম্পূর্ণ নয়, কারণ তাতে সামঞ্জস্যের অভাব—তাই দর্শন হিসেবে তার সার্থকতা বা সম্পন্নতা নিয়ে তর্ক করা চলে, যদিও বোদলেয়ারের হাতে কাব্য হিসেবে যে তার উৎকর্ষ ঘটেছে তা অনস্বীকার্য। সুন্দরের শেষ কথা সে সুন্দর, যেমন তিনি বার বার বলেছেন কবিতার শেষ কথা তা কবিতা, তা ভালোও নয়, মন্দও নয়। নীতিবাদীরা সকলে বোদলেয়ারকে মানেননি, আজও মানেন না, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এক ধরনের আপোসের আশায় অবশেষে বলেছেন যে বোদলেয়ারের কাব্যও নৈতিক, কারণ সবার উপরে তা কাব্য, তা সুন্দর, এক অনবদ্য অভূতপূর্ব সুন্দর—হয়তো তা মুখে বলেছে পাপের কথা, মেতেছে পাপে, কিন্তু যে-অনুভূতি পাঠকের মনে তা জাগাতে পেরেছে, তা যে কোন শ্রেষ্ঠ কাব্য পড়ারই অনুভূতি। এর বেশি বোদলেয়ারও কিছু চান নি—বলেন নি কি তিনি নিজেই, 'এলে তুমি আকাশ হ'তে না নরক হ'তে, হে আমার সুন্দর, তাতে আমার কী এসে যায়?'

তাই তাঁর কাব্যের ও দর্শনের যা প্রথম বিশিষ্ট লক্ষণ, যা অনভ্যস্ত পাঠকেরও চোখে পড়বে ও যা তিনি নিজে বহুবার অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তা হচ্ছে চমকে দিতে পারার ক্ষমতা। এই চমকে দেওয়া তাঁর সুন্দরের ও কাব্যের একটি অতি বিশেষ ও অর্থপূর্ণ লক্ষণ, এবং এর সঙ্গে যুক্ত শুধু বেশভূষায় বা চালচলনে তাঁর 'ড্যাণ্ডি' হবার সাধনাই নয়, তাঁর পাপের প্রতি প্রেম। একটি বাহির, কিন্তু বাহ্য নয়, কারণ তার ছায়া অন্তরেও পড়েছে, আর অন্যটি অন্তরতম। একটিকে ছোঁওয়া যায়, অন্যটিকে শুধু অনুভব করতে হবে। তাঁর সুন্দরকে তাই শুধু অদ্ভুত হলেই চলবে না, হতে হবে দুঃখপূর্ণ, পাপে উচ্ছিষ্ট। দ্বিতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ, তাঁর কাব্য চেয়েছে ভালোকে নয়, সুন্দরকে।

নির্জন ও আত্মকেন্দ্রিক বোদলেয়ার যথার্থ প্রেমের কবিতা প্রায় লেখেননি বললেই হয়, তাঁর অহং-এর কেন্দ্রীকরণ ও বাষ্পীকরণের মধ্যেই ধৃত ও প্রকাশিত তাঁর কবিতা। প্রেমে, তাঁর মতে, থাকতেই হবে এক ধরনের মূঢ়তা ও ছেলেমানুষি, একমাত্র তা-ই সুন্দরকে সংরক্ষণ করে, কিন্তু প্রেমকে যদি প্রকৃত হতে হয়, হতে হয় 'প্রাকৃতিক', তবে তো তার পাপ না হয়ে উপায় নেই।

ভালো নয়, সুন্দর। এইখানে আর্টে নীতিবাদের প্রসঙ্গে বোদলেয়ারের চরম উক্তিঃ 'সমাজের বাবু গাধাগুলো যখন চেঁচায় আর্টে শ্লীলতা,

অশ্লীলতা বা দুর্নীতি নিয়ে, তখন আমার মনে পড়ে যায় সেই পাঁচ সিকে দামের বেশ্যার কথা, লুইজ় ভিইদিও, যাকে আমিই প্রথম লুভ্‌র্‌-এ নিয়ে গিয়েছিলাম একদিন। ঐ সব নগ্ন ভাস্কর্য ও চিত্র দেখে কন্যার কী লজ্জা, কাপড়ে চোখ ঢাকে, আমার জামা ধরে টানে, বলে এমন অশ্লীল নোংরামি কী করে সর্বসাধারণকে দেখানো চলে।'

কী আশ্চর্য, এই পাপের ও সুন্দরের জগত একাধারে অনন্য ও ভিন্ন। পরবর্তীদের অনেকের মধ্যে এখানে র‍্যাঁবোকে স্মরণ না করে পারি না। *যেখানে বোদলেয়ার থামলেন, নরকে, সেখান থেকে র‍্যাঁবোর যাত্রা শুরু হলো। সেই অবিশ্বাস্য বালক খৃষ্টীয় ভালোমন্দের আপাত দ্বন্দ্বকে* তুড়ি মেরে উড়িয়ে আকাশ ও নরকের মধ্যে সেতু বাঁধলেন, স্বরবর্ণকে দিলেন রং, মাতলেন শব্দের রসায়নে, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত নিসর্গশোভার ওপরে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর কর্তৃত্ব। বোদলেয়ারের কাছ থেকেই র‍্যাঁবো নিলেন তাঁর সুন্দরের দীক্ষা, প্রতিরূপের প্রতি আসক্তি এবং সকল অনুভবকে সেই দীর্ঘ, অনুচিন্তিত ও প্রবল উজানে টেনে নিয়ে যাওয়ার আবেগ। অভ্যস্ত আচারের প্রতি তাঁর বিদ্রূপ, নারীর প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণা, তাও পাওয়া বোদলেয়ার থেকেই। তাঁর একেবারে আধুনিক হয়ে যাওয়ার সংকল্প, তাতেও বোদলেয়ার।

অবাক হবার কিছু নেই যে গত শতাব্দীর সকল নতুন আলোকমুখী ফরাসী কবিতা 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'কে করল তার স্তবকবচমালা।

খৃষ্টীয় ধর্ম ও দর্শনে অন্তত বীজের আকারে এই আধ্যাত্মিক পাপ-বোধের সবই ছিল ও আছে, যে-পাপ বোদলেয়ারে নিল এক পরম পরিপক্ব রূপ এবং যাকে তিনি তাঁর সহযাত্রী কবি ও শিল্পীদের রক্তে সংক্রমিত করলেন—যে-কবি ও শিল্পীরা 'অভিশপ্ত' নামে নিজেদের চিহ্নিত করতে চাইলেন রীতিমতো একটি গোষ্ঠী হিসেবে।

খৃষ্টপূর্ব ইহুদী পুরাণে পাই মানুষ ও জগত বিষয়ে এক অন্ধ-কারাচ্ছন্ন ধারণা, তাতে কেবলই বলা হয়েছে সব কিছুর চরম পাপ ও অপকর্ষের কথা। প্লেটো বললেন ঈশ্বর নিষ্পাপ, কিন্তু সেই সঙ্গেই মেনে নিলেন পাপকে এক স্বতন্ত্র মৌলিক উপাদান হিসেবে। জরথুস্ত্রের ধর্ম দুই দেবতাকেই সমান আসন দিলেন, এক ওর্মজ্‌দ, যিনি শুভের দেবতা, অন্যজন পাপের দেবতা, অংরিমন (তুলনীয় অথর্ববেদ)।

পাপের প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় দর্শনে মানুষের আদিপতন পেয়েছে দুই তৃতীয়াংশ স্থান—আদমের পাপ, যা খৃষ্টীয় মতে সমগ্র মানবজাতির

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু মানতে যদি হয় যে এই পতন একদিন হঠাৎ ঘটেছিল, তাহলে তো এটাও ধরে নিতে হবে যে সেই ঘটনার আগে কোথাও একটা উচ্চস্থান ছিল, নিষ্কলঙ্ক নীতি ও ধর্মের এক দোতলার বারান্দা, যা থেকে সেই আদি মানুষ পড়ল, এবং যে-পতনে সে চিরকলুষিত করে দিল তার সন্ততিকে। এই যুক্তিতে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে তাই বলা যেতে পারে যে দুটো জিনিস একই সঙ্গে মানুষের মধ্যে আছে—প্রথম, এক দুষ্ট ও দূষিত হৃদয়, শয়তানে দীক্ষিত আদমের উত্তরাধিকার, যা হ'লো আদিপাপ, অন্যটি নীতি ও ধর্মের এক *সমান্তরাল ফল্গু যা ছুটেছে ঈশ্বরের স্পর্শ নিয়ে।* যদি জগত একদিন সৃষ্টি হয়ে থাকে একটা বিধি বা বিধান বা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ধরে যাতে ভালোমন্দের প্রশ্ন নেই, তবে পাপ নিয়ে তর্কই ওঠে না, সমস্যাটি এসে গেল তখন যখনই বলা হলো স্রষ্টা এক ঈশ্বর আছেন, এই সৃষ্টি তাঁর।

তবু, যে-পাপের অব্যর্থ হাত বুকে নিয়ে সমস্ত মানুষের জন্ম, অথবা যে-আদি ও অনন্ত পাপের সূচনা হ'লো আদমের পতনে, এর কোনো-টাতেই ব্যবহারিক খৃষ্টীয় বিবেক ততটা পীড়িত নয়—পাপ বলতে সে বিশেষ করে বুঝতে চেয়েছে মানুষের কার্য ও আচরণের পাপ, যা মূলত নৈতিক মাত্র, আধ্যাত্মিক নয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা উচিত হবে সেই ঐতিহাসিক বিতর্কের কথা যা জেগেছিল পাপের প্রকৃতি নিয়ে আগস্তিন ও পেলেজিয়াস-এর দুই বিপক্ষ দলের মধ্যে। প্রথম দল বললেন পাপ অনিবার্য নয়, শুধু স্বতঃপ্রবৃত্ত, তাই নৈতিক মাত্র, তা অঙ্গহানি বা আবশ্যক গুণের অভাব (*privatio boni*), অতএব নঞর্থক। শুভই সত্তা, পাপের নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই, সে জাগে শুধু সহজাত পূর্ণতার অভাবে (*spontaneus defectus a bono*)। অন্যদল পাপকে দিলেন সত্তা, তাকে বললেন এক সারবস্তু, যা থেকে নিষ্কৃতি নেই, যা ঈশ্বরকৃত *eo ipso*-র মতোই মানবস্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পাপ আধ্যাত্মিক। আগস্তিনের দল আরো বললেন, পাপের প্রকৃষ্ট রূপ অহংকারে, এবং তার প্রকাশ হয় ঈশ্বরের পথ হতে ভ্রষ্ট বাসনার মধ্য দিয়ে, এবং যেহেতু সেই ভ্রষ্টতা একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র, পাপ মাত্রেই নশ্বর।

কিন্তু পাপের এই আধ্যাত্মিকতাকে সত্য বলে মানলে ব্যবহারিক জগতে মানুষের মরীয়া না হয়ে উপায় নেই। তাই ধর্মীয় নেতারা আগস্তিন ও পেলেজিয়াসের বিতর্কের এক আংশিক আপোষ চেয়ে বললেন যে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই যদিও মানুষ পাপে আক্রান্ত ও

দূষিত, যদিও সে ঈশ্বরের শুধু চরম ক্রোধেরই অধিকারী, অধিকারী একমাত্র অনন্ত নরকবাসের, সে মুক্তি পাবে, আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, যদি সে ঈশ্বরের দয়ার ভিখারী হয়, এবং পরম পিতার পুত্র স্বয়ং এই মর জগতে এসেছেন সমস্ত মানুষের পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিতে, আত্মদানে তিনি ধৌত করে দিয়েছেন সেই অনিবার্য পাপ। অর্থাৎ খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রমতে মুক্তি পেতে হলে হতেই হবে তাঁর দয়ার ভিখারী। তাই র‍্যাঁবোর মৃত্যুশিয়রে পুরোহিতকে বলতেই হলো যে তিনি এই অভিশপ্তের মধ্যে এক আশ্চর্য বিশ্বাসের জ্যোতি দেখেছেন, এবং ইজাবেল অবশেষে মাকে লিখতে পারলেন মৃত ভাইয়ের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক ছাড়াও পাপের একটি আধিভৌতিক অবস্থাকেও স্বীকার করা হয়েছে। এই আধিভৌতিক অংশটি, বিশেষত শারীরিক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ও মৃত্যু, মহিমান্বিত হয়েছে পূর্বকৃত পাপের শাস্তি হিসেবে। জন্মে যে-পাপ, তার মোচন মৃত্যুতে।

দর্শন হিসেবে বোদলেয়ার তাই হয়তো একেবারে আনকোরা নতুন কিছু দিলেন না। তাঁর নতুনত্ব এই যে সেই পাপচেতনায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বাঁচলেন তিনি, তাতে মরলেনও, তাকে চেখে চেখে দিনে দিনে গভীর মননের সঙ্গে গড়ে তুললেন তাঁর জীবনদর্শন। যে-পাপবোধ তাঁর জীবনে, যার অপূর্ব প্রকাশ তাঁর কবিতায় ও গদ্য রচনায়, তা দিগন্তপ্রসারী হওয়ার আগে বহু কঠিন মুহূর্তের সাধনার দ্বারা অনুধ্যাত ও নির্বাচিত হয়েছিল।

একটু আগে যা বললাম, বোদলেয়ারের অভিনবত্ব শুধু তাইতেই নয়— পাপের আলোকে এক নতুন ভূমিকা দিলেন তিনি সুন্দরকে, এবং এই দানই নিঃসন্দেহে তাঁর প্রধানতম। এদিকে আমরা ভারতে দাঁড়িয়ে আছি এক অন্য সরযূর তীরে।

তফাৎ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, ভালো ও মন্দ অথবা পাপ ও অপাপের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায়, তফাৎ সৃষ্টিশীল মানুষের সুন্দরের স্বরূপ ব্যাখ্যায়। ভারতের সেই বক্তব্যটিকে বলবার চেষ্টা করছি অতি অল্প কথায়, যেভাবে তাকে জেনেছি বা অনুভব করেছি আমার সামান্য জ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষমতাতে, এবং যা এর আগে অনেকে বলেছেন আরো অনেক সুন্দর করে ও অনেক বিস্তারিতভাবে।

প্রথমেই, ভারতের বহুমুখী চিন্তায় ও অনন্ত বিপরীতের মধ্যে যে এক ও অনন্য, তাকে আমরা মেনেছি অনাদি কাল ধরে ও মানব এখানে।

মানতেই হবে যে তা মূলত বৈদান্তিক, শুধু পুঁথির বা শিক্ষালয়ের তত্ত্ব নয়; আমাদের মহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির বহমান নদী, এবং তারই আলোকে উদ্বুদ্ধ ভারতের সমস্ত অলংকারশাস্ত্র, রস ও সুন্দরের স্বরূপ, শুধু সাহিত্য বা কাব্যেই নয়, চিত্র ও ললিতকলার অন্যান্য ক্ষেত্রেও। ঈশোপনিষদ যাকে বললেন 'তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ' (সকলের অন্তরে, আবার বাইরেও), তা-ই রসের ব্যাখ্যায় সাহিত্য-দর্পণের লেখকের কাছে প্রতিভাত হ'লো 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ' (পরের, কিন্তু পরেরও নয়, আমার, কিন্তু আমারও নয়)। পশ্চিমী চিন্তার সঙ্গে আমাদের আরো একটি মূল প্রভেদ, যেমন সংগীতে, তেমনি সাহিত্যে ও অন্যান্য আর্টে, ব্যক্তির সত্তা ভারতে কখনো দাঁড়ায়নি এক ভিন্ন একক হয়ে, কিন্তু স্রোতস্বিনীর মতো বার বার সে মিলেছে এক চিরকালের সমুদ্রে, তার ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জনার নতুনত্বে, সেই অজ ও শাশ্বত একের নতুনতর প্রকাশে বা প্রকাশভঙ্গিতে। তাই ভারতীয় সংগীতে নেই বীতোফেন, ভারতীয় কাব্যে নেই বোদলেয়ার।

মাত্র নৈতিক ও এক ধরনের বাহ্যিক অর্থে পাপ ভারতেও বিদ্যমান, কিন্তু সে নয় সেই অন্তরের পাপ, এক আদি ও মৌলিক পতন, যা থেকে নিস্তার নেই। সুন্দর ও সম্পূর্ণের অনুসরণের সাধনা ধরেই নেয় যে সেই সুন্দর ও সম্পূর্ণের উল্টোটাও আছে, যাকে অতিক্রম করতে হবে। গীতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভালো ও মন্দের এক প্রাণপণ সংগ্রাম বলে, যা থেকে ভগবান মানুষকে রক্ষা করতে চান তাঁর প্রেমের বর্ষণে। অন্যত্র, দর্শনে পদার্থিক সৃষ্টির ক্রিয়ার পিছনে এক ভয়ের কথাও বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তারই ভয়ে জ্বলছে আগুন ও সূর্য, তারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু ছুটছে। কখনো ত্রস্ত মানুষের অন্তিম প্রার্থনা চেয়েছে রুদ্রের দক্ষিণ মুখের করুণা। কিন্তু সেই যে 'সে', তার স্বরূপ এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও অমৃত, তাতে পাপ ও পুণ্য, জন্ম ও মৃত্যু, ভালো ও মন্দ, ভয় ও ভয়ের অভাব—এ গুলো সবই আছে, আবার কোনোটাই নেই। কারণ তার যথার্থ রাজ্যে না জ্বলে সূর্য, না জ্বলে চন্দ্র-তারা-বিদ্যুৎ, অগ্নি তো কোন ছার—কিন্তু তারই জ্যোতিতে সবই স্বপ্রকাশ, সব আলোকিত তারই আলোয়। সে সর্বব্যাপী, শুক্র, অকায়, অব্রণ, অস্নাবির, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, এবং সে-ই কবি, সে একাধারে মনীষী, পরিভূ ও স্বয়ম্ভূ। সে সত্যের মুখ ঢেকে রেখেছে এক হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে, যার উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষে বিলীন হবে রূপের, স্পর্শের ও অনুভূতির এত আপাতভিন্নতা।

একদিকে, সবই আনন্দ, সবই তার চেতনায় চিন্ময়, সবই অমৃত ও তুচ্ছতার সংক্রামের অতীত; অন্যদিকে, একই যুক্তির পথ ধরে, সবই আপাতিক, নিজস্ব আলোকরহিত, একমাত্র তারই আলোয় এত সবের এই বিভিন্ন রূপ, সুতরাং সবই মায়া। তবু, গভীরে, কোনো নঞর্থক শূন্যের দিকে এই দর্শনের ইঙ্গিত নয়। তাতে জীবনের সকল শক্তি ও প্রকাশ একীকৃত হয়েছে এক বিরাট অরণ্যের মতো, যার সহস্র বাহুকে ঐক্যের বুক ফাটা লয়ে নটরাজ নাচাচ্ছেন সৃষ্টি ও সংহারের তুমুল তাণ্ডবে। যদিও গভীরে, দৃষ্টির অগোচরে যা লুকানো, তা অনন্ত শান্ত, তা অতল প্রশান্তির জ্যোতি। যে-সুন্দর এক ও অদ্বিতীয়, স্বেচ্ছায় সে ফুটিয়েছে এত বিপরীতের দ্বন্দ্ব, সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে আনন্দ পাবে বলে, নিজেকে অনুভব করবে বলে, নাচবে বলে, নাচাবে বলে জন্ম-মৃত্যুকে, মুক্তি-বন্ধকে, ভালোমন্দকে। সেই নটরাজের পায়ের তলায় পড়ে আছে পাপের বামনরূপী অপস্মার এবং কাঠের মধ্যে যেমন তাপ নিহিত থাকে, সকল আত্মা ও জড়কে সে জাগিয়েছে তার নৃত্যের স্পর্শে, তাদের নৃত্য করাচ্ছে খুশির তরঙ্গে।

এবং এই খুশীটাই সবচেয়ে বড়ো কথা, সৃষ্টির সব কিছুর পিছনে এই খুশিটাই কাজ করে যাচ্ছে। সৃষ্টির আদিতে যে ছিল এক, সে হ'তে চাইল বহু। কেন? কারণ তার আনন্দ পাবার বাসনা, বিচিত্রের মধ্যে নিজেকে অনুভব করার বাসনা। তবে সেই বাসনার মধ্যে নিহিত ছিল এক প্রচণ্ড বেদনাও, যা একের বুক ফাটিয়ে দিয়ে ফোটালে ফুল, গাছ, মানুষ, পশু, পাখি, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, ঘৃণা ও আরো কত কী। আদি স্রষ্টার এই একই মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে মর জগতের মানুষের সৃষ্টির ক্ষেত্রে। সকল সৃষ্টির আগে, ও পরে পাঠকের রসাস্বাদনেও, কবির বেদনামিশ্রিত আনন্দের রূপ আদি স্রষ্টার বেদনার অনুরূপ। কিন্তু এই বেদনা বা বিপ্রলম্ভ, ও বোদলেয়ারের সুন্দরের জন্য *nostalgia*, এ দুই এক বস্তু নয়, যেমন এক নয় বোদলেয়ারের সুন্দরের ধারণায় *bizarre*-এর অংশ ও ভারতীয় রসের অলৌকিক।

সুন্দরের এর চেয়ে কোনো সুন্দরতর ব্যাখ্যা আমার পরিচয়ে নেই। অন্যদিকে, ও একই সঙ্গে, অন্য কোনো জীবনদর্শনই নয় এত সম্পূর্ণ, এত বিদ্বান ও এমন চির আধুনিক। তাই চুপ করে থাকব যদি বাংলা দেশের বিশিষ্ট কেউ-কেউ বলেন যে এই অমৃতের আহ্বান তাঁদের এখন ভিজে গামছার অনুভূতি দেয়, বহু ব্যবহারে তাতে আজ লেগে আছে শুধু এক পুরানো মিষ্টি গুড়ের আস্বাদ, এবং তাকে সমৃদ্ধ করতে হ'লে এবার চাই পশ্চিমী পাপের চেতনা।

বোদলেয়ার বা তাঁর কাব্যের মাহাত্ম্য নিয়ে প্রশ্ন নয়—তাঁকে ভালো-বাসলাম, তাঁর সামনে নতজানু হলাম। আবার বলি, সেই কাব্যের অনুবাদের ফলে বাংলা সাহিত্য নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হয়েছে, ও হবে, সন্দেহ নেই। আমি শুধু দুইকে দুই হিসেবে দেখাতে চেয়েছি, প্রার্থনা করে তাদের ঐক্য। এবং, সবশেষে বলি, দ্বন্দ্বের অবকাশ কোথায় যদি ধরার মতো করে ধরতে পারা যায় অমৃতকে?

২

মায়াবী কবি র‍্যাঁবো

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে* সর্বদেশের ও সর্বকালের একজন মস্ত বড় কবি জন্ম নিয়েছিলেন ফ্রান্সে—তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব প্রথম পালিত হ'ল অক্সফোর্ডে, তারপর ফ্রান্সে, তাঁর জন্মস্থান শার্লভিল শহরে। দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে যে-কথা, সেখানে প্রাদেশিকতার প্রসঙ্গ অবান্তর, তাই এই অবসরে ফ্রান্স থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের অধিবাসী হ'য়েও আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। তাঁর কাব্যের অজস্র দিকের মাত্র একটি নিয়ে আমাদের এই আলোচনা—তাও হয়তো অসম্পূর্ণ এবং উপযুক্ত জ্ঞান ও দৃষ্টির প্রসারের অভাবে দুষ্ট।

তবু শ্রদ্ধাই হোক এই নিবন্ধের শেষ কথা।

যদি এই রকম বলি, সচেতনতম মানুষও এমন মুহূর্ত এড়িয়ে যেতে পারে না যা তাকে অনিবার্যরূপে জাদুকরের আসনে বসিয়ে দেয়, যেখানে সে মানতে পারে না, মানতে চায় না কোনো কার্যকারণ; পৃথিবীর হাতে-ছোঁওয়া চোখে-দেখা রীতি নীতির মধ্যেও অনির্দেশ্য রঙের ইন্দ্রজাল ঘনিয়ে উঠেছেই, কেন না সব সত্ত্বেও কেউ-না-কেউ কোথাও-না-কোথাও প্রতি মুহূর্তেই আশা তো করছে, করছে সন্দেহ, মনে মনে বোঝাপড়ার অন্ত নেই; যদি বলি, আচ্ছা তুমি ঠাণ্ডা মানুষ, ঠিকমত চলাফেরা করো, কাজ করো, সময়ে খাও-দাও-ঘুমোও, তবু কোনো অকারণ কারণে রক্ত কি তোমার চঞ্চল হয় না কখনো, রাত্রে ঘুমের একটু ব্যাঘাত, অন্তত কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্যে—যখন সময় মত সব ঠিক হয় না, পদে পদে ত্রুটি অনুভব করো, অন্তত তখন, যখন একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে নিজেকে প্রস্তুত করো, কপালে হাত দাও, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শব্দ-ভাণ্ডার হাতড়াও, নাম দাও ভাগ্য, নিয়তি বা ভবিষ্য? যদি বলি, এড়াতে পারবে না সেই মুহূর্ত, সুযোগ খুঁজতেই হয় জীবনে, দুলতেই হয় আশা-নিরাশায়, ঝাঁপ তো তুমি দেবেই অনিশ্চিতে—যদি দুর্দম হও, যাত্রা কর দুর্গমে, হয়তো পাবে লক্ষ্মীর করুণা; এই যে

* র‍্যাবোর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় 'কবিতা' পত্রিকায়।

রাজ্য, যা আশা দেয়, বিরক্তি আনে, যাতে ছটফট করে মরি, সে রাজ্য কি সম্পূর্ণরূপে ম্যাজিকের নয়?

এই রকম যদি বলি, তা হলে নতুন কোনো কথা আমি বলব না। কিন্তু উত্তরে যদি বলি, এ ভাবে যাব না, এই যে 'অকারণ' কারণ, শব্দের আগে যে এত 'অ' বসিয়ে দেওয়া, এই সব কি আমাদের নঙর্থক সমাজেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়, যে-সমাজে পরস্পরবিরোধী সত্যই এক-মাত্র সত্য, যেখানে নিরাপত্তা বলে কিছু নেই, সবই সুযোগের ওপর, ভাগ্য আর ভবিষ্যের উপর নির্ভর করছে, কপালে হাত দিতেই হয় যেখানে, যেখানে একটা কেরানির চাকরির জন্যে হাজার খানেক আবেদন পড়ে, তার মধ্যে পি-এইচ-ডিরাও বাদ যান না? তাহলে জানি অপর পক্ষ প্রতিবাদ করবে, বলবে, তবে তোমার ভালোবাসা, তোমার কাব্য, তোমার সংগীত, তোমার শিল্পকলা? যখন ভালোবাসো কাউকে, অনির্বচনীয় বেদনা অনুভব করো না? তোমার কাব্য, তা কি সেই 'কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে', 'লক্ষ দীপের সনে' অকারণে দীপ ভাসিয়ে দেওয়া নয়? গানে গান্ধারের পর মধ্যম কেন ওঠে, নিখাদের পর ধৈবত নেমেই বা আসে কেন—আর যখন দরবারি কানাড়ায় নিয়ম-কানুন ভেঙে কোমল 'রে' লাগিয়ে দাও, সভাসুদ্ধ 'সাধু সাধু' রব পড়ে না? শিল্পকলাতেও দেখ, ছবিকে ফোটোগ্রাফ করবে না কিছুতেই শিল্পী।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ কথা নয়। কারণ তাতে এমন উজান বাইতে হবে যে হাত ভেঙে যেতেও পারে। বহু শত শতাব্দীর অলংকার শাস্ত্রের ঐতিহ্যের বিরোধী হওয়া কম বুকের পাটা নয়। এবং শুধু সেরকম বুকের পাটা দেখিয়েই বা লাভটা কি? সেটাও একটা প্রশ্ন। আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্যে কাব্য নিয়েই পড়ি আপাতত।

এক আর একে দুই হয়, দুই আর একে তিন—তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে নয় হয়। কিন্তু এইভাবে কাব্য নিশ্চয়ই চলবে না, আবার এ-সত্যকে অস্বীকারও করবে না কাব্য। মায়া জড়িয়ে আছে কাব্যে, এ সেই ম্যাজিকের মায়া। এর সঙ্গে আদিমদের সেই 'মানা' অথবা আরুণ্টাদের 'আরুংকিলতা'-র সম্বন্ধ আকাশপাতালের নয়। মুস্কিল হচ্ছে এই যে আজ যাঁরা কাব্যের এই অনির্বচনীয়তা, এই *absolute*-টুকু নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছেন, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন এই সম্পদটাকে কাব্যের একটা শাশ্বত গুণ বলে, তাঁরা ভুলে যান যে সব কিছুরই মত কাব্যেরও একটা ইতিহাস আছে, তারও একদিন জন্ম হয়েছিল এবং

এই যে প্রতিটি পংক্তির শেষে 'যাস' 'না' ইত্যাদি শব্দের হঠাৎ থেমে যাওয়া ঢেউ কানে এসে বাজে, এর মধ্যে একটি মায়া আছে, এই সুর সাধারণ কথোপকথনের নিশ্চয়ই নয়। অনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস ইত্যাদিরও মূল একই জায়গায়—এই অসাধারণত্ব ও মনোহারিত্ব বজায় রাখবার তাগিদেই তাদের সৃষ্টি। যখন বলি,

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে
গন্ধ ছড়াল ঘুমের প্রান্তপারে—

তখন যা বলছি, তা ছাড়িয়েও আরেকটা কিছু বলছি—সেই-বলা বলা হয়ে গেলেও থেমে রইল না, বাজতে লাগল নিঃশব্দের মধ্যে। তা হলে কি বলব, এক অর্থে সমস্ত কবিই জাদুকর, সমস্ত কবিতাই ম্যাজিকের মায়ামন্ত্রে উদ্বোধিত?

কিন্তু মুস্কিল হ'ল ঐখানেই। একবার যখন অসাধারণকে মেনে নিলাম, প্রশ্রয় দিলাম, তা আমাদের মাথায় চ'ড়ে বসল। এই অসাধারণকে যদি সকলে মিলে মেনে নিতে পারতাম, যেমন মেনে নিয়েছিল আদিমরা, তা হলে সমস্যাটা হয়তো এতটা কঠিন হত না। ছড়া থেকে গাথা-কাব্য, তা থেকে রোমাণ্টিক কবিতা, তারও হরেক রকম শ্রেণী উপশ্রেণীর মধ্যে এই অসাধারণের চেতনা দিনে দিনে বেড়েই যেতে লাগল। আজ এই বিশ শতকের শেষার্ধেও উক্ত পথের পথিক সমস্ত কবিদের অবোধ্য এই যত সব অসাধারণ, তা অনেক ক্ষেত্রেই যতটা তাদের নিজের নিজের সম্পত্তি, একান্তভাবেই, হয়তো ততটা অন্য কারুর নয়।

পরিষ্কার করে বলতে গেলে, আদিমের উঁচু পর্দায় বেঁধে দেওয়া শব্দে যে মায়া ছিল বুদ্ধির অগোচর, তাকে তারা সকলে মিলে উপভোগ করত তাদের সেই রকম অবোধ্য নাচ গানের অনুষ্ঠানে, আগুনের চারপাশে দল বেঁধে সমবায়-নৃত্যে ডমরুর সংগতে। কিন্তু আজকের আধুনিক কবি যখন 'কবোষ্ণ শীত', 'অতলান্ত অবগাহন' অথবা এই ধরনের আরো অনেক 'অসাধারণ' ছায়াবাজির ভেলকি দেখায়, তাতে সে নিজেই মুগ্ধ হয়, অন্য কাউকে কাছে টানতে পারে না। বুদ্ধির উল্টো পথে এই অভিযান অব্যাহতই রয়েছে, আজ না হয় অনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাস ও নানান রকম উপমার জাঁকজমকত্বে তার মোড়টা একটু বেঁকেছে, তবু তা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে—যা ছিল সমষ্টির, তা একান্তভাবে ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও কবিরা এত বেশি আত্মানুসন্ধানী যে তাদের সমস্যা বহুলাংশে একমাত্র তাদেরই সমস্যা, তার সঙ্গে যেন বিশ্বের কোনো জনসাধারণের এতটুকু যোগ নেই।

এই যে প্রতিটি পংক্তির শেষে 'যাস' 'না' ইত্যাদি শব্দের হঠাৎ থেমে যাওয়া ঢেউ কানে এসে বাজে, এর মধ্যে একটি মায়া আছে, এই সুর সাধারণ কথোপকথনের নিশ্চয়ই নয়। অনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস ইত্যাদিরও মূল একই জায়গায়—এই অসাধারণত্ব ও মনোহারিত্ব বজায় রাখবার তাগিদেই তাদের সৃষ্টি। যখন বলি,

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে
গন্ধ ছড়াল ঘুমের প্রান্তপারে—

তখন যা বলছি, তা ছাড়িয়েও আরেকটা কিছু বলছি—সেই-বলা বলা হয়ে গেলেও থেমে রইল না, বাজতে লাগল নিঃশব্দের মধ্যে। তা হলে কি বলব, এক অর্থে সমস্ত কবিই জাদুকর, সমস্ত কবিতাই ম্যাজিকের মায়ামন্ত্রে উদ্বোধিত?

কিন্তু মুস্কিল হ'ল ঐখানেই। একবার যখন অসাধারণকে মেনে নিলাম, প্রশ্রয় দিলাম, তা আমাদের মাথায় চ'ড়ে বসল। এই অসাধারণকে যদি সকলে মিলে মেনে নিতে পারতাম, যেমন মেনে নিয়েছিল আদিমরা, তা হলে সমস্যাটা হয়তো এতটা কঠিন হত না। ছড়া থেকে গাথা-কাব্য, তা থেকে রোমাণ্টিক কবিতা, তারও হরেক রকম শ্রেণী উপশ্রেণীর মধ্যে এই অসাধারণের চেতনা দিনে দিনে বেড়েই যেতে লাগল। আজ এই বিশ শতকের শেষার্ধেও উক্ত পথের পথিক সমস্ত কবিদের অবোধ্য এই যত সব অসাধারণ, তা অনেক ক্ষেত্রেই যতটা তাদের নিজের নিজের সম্পত্তি, একান্তভাবেই, হয়তো ততটা অন্য কারুর নয়।

পরিষ্কার করে বলতে গেলে, আদিমের উঁচু পর্দায় বেঁধে দেওয়া শব্দে যে মায়া ছিল বুদ্ধির অগোচর, তাকে তারা সকলে মিলে উপভোগ করত তাদের সেই রকম অবোধ্য নাচ গানের অনুষ্ঠানে, আগুনের চারপাশে দল বেঁধে সমবায়-নৃত্যে ডমরুর সংগতে। কিন্তু আজকের আধুনিক কবি যখন 'কবোষ্ণ শীত', 'অতলান্ত অবগাহন' অথবা এই ধরনের আরো অনেক 'অসাধারণ' ছায়াবাজির ভেলকি দেখায়, তাতে সে নিজেই মুগ্ধ হয়, অন্য কাউকে কাছে টানতে পারে না। বুদ্ধির উল্টো পথে এই অভিযান অব্যাহতই রয়েছে, আজ না হয় অনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাস ও নানান রকম উপমার জাঁকজমকত্বে তার মোড়টা একটু বেঁকেছে, তবু তা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে—যা ছিল সমষ্টির, তা একান্তভাবে ব্যক্তি-গত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও কবিরা এত বেশি আত্মানুসন্ধানী যে তাদের সমস্যা বহুলাংশে একমাত্র তাদেরই সমস্যা, তার সঙ্গে যেন বিশ্বের কোনো জনসাধারণের এতটুকু যোগ নেই।

তাই আজ কেউ যদি শোনায়

শহর শহর যাস
সকল শহর যাস
রাঁচি শহর যাস নে রে ভাই না,

তা আদিম হ'লেও, অনুন্নত হলেও, তাই লোকে শুনবে কান পেতে। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

ম্যাজিকের অন্যতম দুটি প্রধান ধারা যা কাব্যের অন্তর্বস্তুতে অনুসৃত হয়েছে, তার একটি হ'ল অনির্বচনীয় পবিত্রের চেতনা, অন্যটি অপ্রকাশ্য মন্দের ধারণা। আদিমদের 'মানা' (*mana*) অথবা 'ট্যাবু' (*taboo*), এই দুয়ের পথেই *absolute* খুঁজে গিয়েছেন কবিরা। ইচ্ছা বা কল্পনার সর্বশক্তিমত্তা, অর্থাৎ আমি বলছি ব'লেই এটা সত্য, আমি হবে বলছি বলেই এটা হবে, কাব্যের এই গুণটিও একান্তভাবে জাদুকরী। যা কিছু অনির্বচনীয়, যা কিছু বুদ্ধির অগোচর, তার সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ। সার্থক সমাজব্যবস্থার কাব্যে এই মায়া কোন্ রূপে রক্ষিত হবে, তা বলা হয়তো সহজ নয়। এবং এ কথাও সত্য, তথাকথিত সার্থক সমাজ ব্যবস্থার একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়াও শক্ত, প্রায় অসম্ভব। তবে আজকের সাধারণ লোক কাব্য পড়ে না, এই যুক্তিটার মধ্যেও কিছু শাঁস আছে বলে মনে হয়। আর, কাব্য কেনই বা পড়বে? বোদলেয়ারের উক্তি মনে পড়েঃ 'অতএব এই সব কুহকিনী ছায়া, রনে, দ্যবের্মান ও হবার্থার, তোমরা ছিটকে পড়ো, শূন্যের ধোঁধায় মিশে যাক তোমাদের আলস্য ও নিঃসঙ্গতার দানবীয় সৃষ্টি সব, জেনেজারেথের হ্রদের মধ্যে শূকরদের মত তোমাদের মুগ্ধ অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় তোমরা নিজেদের বিছিয়ে দাও, যেখান থেকে বেরিয়েছে তোমাদের এই সব স্বকপোলকল্পিত অরির দল, রোমাণ্টিক চেতনায় আক্রান্ত পাল পাল ভেড়া।'

আর র‍্যাঁবো, ফরাসী সিম্বলিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি, তিনি হতে চাইলেন *voyant*, যথার্থ অর্থে দার্শনিক। অবুদ্ধির পথে আর যাবে না মন, এবার চোখ কান খুলবে, জগৎ দেখবে, শুনবে, বোঝবার চেষ্টা করবে। তবু, হায় র‍্যাঁবো!

র‍্যাঁবোর কথায় আসবার আগে আমাদের এই ভূমিকাটুকুর দরকার ছিল ম্যাজিকের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কী, সেই সম্পর্ক কতখানি বজায় রাখা চলতে পারে আগামী কালের কবিতায়, সেটুকু আলোচনা করবার জন্যে।

'ইন্দ্রধনুর দ্বারা অভিশপ্ত' র‍্যাঁবোর জীবনই হ'ল তাঁর কাব্যের ভূমিকা।

কোনটা আসল, তাঁর কাব্য না জীবন, বলা মুস্কিল। একাধিক মৃত্যু ঘটে কাপুরুষদের—কিন্তু এই দুর্জয়তম বীরেরও মৃত্যু ঘটেছিল দুবার—প্রথম মৃত্যু উনিশ বছর বয়সে। তাঁর প্রথম জীবন নিয়ে একটু আলোচনার দরকার, কারণ সেইখানেই মায়াবী কবির সমস্ত মায়ার বীজ—সার্থক আবহসংগীতের মত তাঁর সেই প্রথম জীবন মূল স্বরের সঙ্গে আশ্চর্য সংগতি রেখে গেছে।

শার্লভিল বেলজিয়ামের ধারে ফ্রান্সের প্রান্তসীমানায় ছোট্ট একটি শহর—সেইখানে জন্মালেন র‍্যাঁবো ১৮৫৪ সালের ২৯শে অক্টোবর। ছেলেবেলা থেকেই গোল্লায় যাওয়া ছেলে, সমস্ত রকম শাসন ও শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে। বাপ ছিলেন ভবঘুরে এবং অপূর্ব খরচে, সংসারী হবার জন্যে যারা জন্মায়নি, তাদের অন্যতম। মায়ের ছিল আশ্চর্য ধৈর্য, নিষ্ঠা, এবং যে পথে চলতে চান, হাজার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নিঃশব্দে নিজেকে সেই পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা। চাষীর ঘরের মেয়ে তিনি, মন ছিল ব্যবসায়ী, অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন তিনি, উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকেও ক্ষমা করেননি কখনো। ছেলের বাড়বাড়িতে মনে মনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেও মুখ ফুটে একটি কথা বলেন নি, আসলে তার সম্বন্ধে সমস্ত হালই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইজাবেল, র‍্যাঁবোর বোন, বলতে গেলে সারা জীবন যুদ্ধ করে গেছেন ভাইয়ের সর্বরকম অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তার মৃত্যু-শয্যা এনে দিল তাঁকে জয়ের সম্মান। মায়ের কাছে চিঠিতে লিখছেন (২৮-১০-১৮৯১), 'ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ। গত রবিবার এমন একটি সুখবর পেলাম যা আমি পরম আনন্দের সঙ্গে স্মরণ রাখব চিরকাল। আর আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে মরবে না একটা পথ-ভ্রষ্ট হতভাগ্য জীব—আজ সে মানুষের মত মানুষ, শহীদ, পুরুষোত্তম, যাকে তুমি নির্বাচন করেছ, ভগবান! ধন্যবাদ তোমায়, অজস্র ধন্যবাদ।'

এই আশ্চর্য অবিশ্বাসকে র‍্যাঁবো বহন করে গেছেন তাঁর জীবনে, বিশেষত তাঁর কাব্যে, এক ঋজু, দৃঢ়চেতা, নির্লজ্জ, অতুলনীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে। নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন বহু দূরে, দেখতে চেয়েছেন পরিষ্কার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে, যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ মনে। বেদনা থেকে বিরাম খুঁজেছেন এক অপূর্ব ছেলেমানুষি আনন্দে, যে-আনন্দ শুধু শিশুরাই উপভোগ করতে পারে। তাই আশ্চর্য হই না যখন এই কিশোরকে রায় দিতে দেখি উগো ও দ্য মুস্যো সম্বন্ধে—ওঁরা নাকি *colossal vulgarians*। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসকে এই গোল্লায় যাওয়া ছেলে যেন অগস্ত্যের এক গণ্ডূষ জলের মত একটি মাত্র ফুঁতে উপহাস করে উড়িয়ে

প্রকৃতির পথ দিয়ে চলে যাব দূরে, দূর হতে আরো দূরে ভবঘুরের মত দিলেন। লিখলেন ষোল বছর থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত। ব্যস, তারপর সব শেষ। 'ওসব নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না', পরে বলেছেন। আসলে লেখবার আর কিছু ছিল না, তাঁর সমাজ, তাঁর পারিপার্শ্বিক তাঁকে এমন কোনো নতুনতর মাল মশলা জোগাতে পারেনি যা নিয়ে তিনি আরো পরীক্ষা চালাতে পারতেন। নিরাসক্ত জাদুকর, কবিতা তাঁর অনেকগুলি খেয়ালের একটি মাত্র বই তো নয় (*une de mes folies*)!

ফিরে যাওয়া যাক তাঁর জীবনে, পারী কম্যুনের সেই গৌরবময় দিনগুলিতে। যখন সমস্ত ফ্রান্স বিপর্যস্ত, প্রুশীয় সেনাবাহিনী উপকণ্ঠে পেঁচেছে—তখন, বলা বাহুল্য, রাজ্যেরও আর অস্তিত্ব নেই। পারী 'কম্যুনার'দের হস্তগত। ষোল বছর বয়স তখন, কবি হেঁটে আসছেন শার্লভিল থেকে প্রায় দেড়শো মাইলের উপর, পায়ে ঘা এবং শেষের দিকে প্রায় চলৎশক্তিহীন। প্রথম বিপ্লবী শিবির যেটি পেলেন, সেখানে গিয়ে বললেন, আমাকে নাও তোমাদের সংগ্রামে। এর আগে আরো একবার এ রকম করে পারী পেঁচৈছিলেন—কিন্তু সেবার ধরা পড়ে যান, বন্দী হন এবং শেষে ফিরে আসেন বাড়িতে। এবার এক পক্ষকালের মধ্যে শুধু আন্দোলনকারীদের দলে নামই লেখালেন না, অনেক উল্লেখযোগ্য কীর্তি-স্তম্ভ জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে হাত লাগালেন তাঁদের সঙ্গে। তবু এইভাবে আর কতদিন চলতে পারে? এবারও ফিরতে হ'ল—ছিন্ন কুটিকুটি জামাকাপড়, চরম রিক্ততায়। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মা, ছেলেকে ঘরে তুললেন। ছোট্ট সেই মফস্বল শহরের নির্জনতা ও বিষণ্নতা তাঁর যেন টুঁটি চেপে ধরল। শৈশব তো কেটে গেছে এই একই ভাবে, কখনো পথে পথে, কখনো অর্বাচীন শহরের নাম-না-জানা বাগানে বাগানে। তবু এবারের এই নির্জনতা আরো ভীষণ ঠেকল তাঁর কাছে। মনে রাখতে হবে, কবির সমগ্র কাব্যের পটভূমিকা এই আশ্চর্য নির্জনতা। তাঁর ট্রাজেডিই হ'ল একেবারে একলা পথ হাঁটার।

ষোল বছরের একটি লেখা এখানে উদ্ধৃত করি:

'নিদাঘের সুনীল সন্ধ্যায় যাব আমি পায়ে-চলা পথ দিয়ে, করকরে শস্যের ওপর পা ফেলে, দ'লে যাব ছোট ছোট তৃণদল। স্বপ্নবিলাসী, পায়ে আমার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব—বাতাস যদি চায়, দিক সে ধুয়ে আমার নগ্ন মুখ।

'বলব না কথা, ভাববও না কিছু, অনন্তের প্রেমে পূর্ণ আমার হৃদয়—

—মন খুশিতে ভরপুর যেন সঙ্গিনী নিয়ে চলেছি কোনো।'

সঙ্গিনীর প্রয়োজন নেই, তাকে নিয়ে চলার অনুরূপ আনন্দ আপনার মনেই পেতে পারে এই কিশোর। এত অল্প বয়সে সঙ্গিনীর কথা কেন এবং সেই মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রশ্নই বা কেন? দ্যলায়ে বলছেন, শার্লভিলে সমবয়সী একটি প্রেমিকা ছিল র‍্যাঁবোর—সে পারী পর্যন্ত কবিকে অনুসরণ করে ও পরে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। তাই তার কথা উঠলেই কবির মেঘাচ্ছন্ন মুখ, সমস্ত সত্ত্বেও মেয়েদের প্রতি এক অদ্ভুত ভাবপ্রবণ নির্লিপ্ততা, কখনো বা ঘৃণাও।

'প্রিয় আমার প্রেমিকারা, কত যে ঘৃণা তোমাদের করি।' অথবা 'মাতাল তরণীর' সেই নির্বেদ, অথচ নির্বিকার ভাবঃ

তবু বৃথা কাঁদা। জানি মর্মান্তিক উষার কালিমা,
চন্দ্রমা অসহ চিরকাল, তিক্ত রবি রশ্মি-কণাঃ
কটুস্বাদ প্রেমে শুধু স্ফীত হবে মাতাল জড়িমা—
হায় দীর্ণ তরী, হায় নিরুদ্দেশ সমুদ্র-মন্ত্রণা!

শুধু প্রেম অথবা নারীর ব্যাপারেই নয়, ধর্মের ব্যাপারে, ঐতিহ্যের ব্যাপারে, জাগতিক সমস্ত সংস্কারের ব্যাপারে এই বালক ইতিমধ্যেই মোহমুক্ত। তাই তার বাসনা, একবার ডুব দেবে সমস্ত আবেগের মধ্যে, চেখে চেখে দেখবে রাজ্যের যত রোগ, তাকে হতেই হবে বিশ্বের সব চেয়ে দুরারোগ্য রোগী, মুক্তি পাবার অযোগ্য অপরাধী, চিরকালের অভিশপ্ত আত্মা এবং সেই সঙ্গে, প্রবীণদের মধ্যে যিনি প্রাজ্ঞতম, তাঁর চেয়েও বড় পণ্ডিত। অর্থাৎ এক কথায় আজ পর্যন্ত সভ্যজগতের যা কিছু 'ট্যাবু', তাতে তো হাত পাকাবই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রধনুর যে-স্বর্গীয় অনির্বচনীয়তা, তাকেও একবার ছোঁ মেরে কাছে টেনে আলিঙ্গন করে নেব। হেন জাদুকরের রসায়নাগারে যে বস্তু উৎপন্ন হবে, তাতে নিশ্চয়ই সাধারণ প্রেম অথবা সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা সঞ্চিত হবে না। তাই একদিকে যেমনঃ

সুখের জাদুকরী অনুধ্যানে
রাখিনি কোনো ফাঁকি কোনোইখানে—

এবং

আশার পথে কখনো নয়
উদয় পথে নয়—
সাধ্য আর সাধনা, সবই
বিড়ম্বনাময়।

আগামী চিরকালের তরে
আছে তো জানো প্রিয়ঃ
রেশমে ঢাকা আগুন সেই
তোমার বহনীয়।

অন্যদিকে তেমনিঃ

'আমাকে টানে অর্থহীন ছবি, দরজার ওপর দিকটা, অসারগর্বীর পট, বিজ্ঞাপন-ফলক, লোকশিল্পের রং-চং, সেকেলে সাহিত্য, গির্জার ভাঙা ল্যাটিন, বানান-ভুলে ভর্তি আদিরসের বই, প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী, রূপকথা, শিশুদের বই, রঙ-চ'টে যাওয়া কাব্যগীতি, সরল আস্থায়ী, অমার্জিত ছন্দ।'

এমন কিঃ

'আমার পছন্দ মরুভূমি, জ্বলে-যাওয়া ফলের বাগান, বিবর্ণ ম্লান দোকান, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পানীয়। নিজেকে টেনে নিয়ে যাব পচা দুর্গন্ধের অলিগলি দিয়ে বন্ধ আঁখির কাছে, উৎসর্গ করব সূর্যের চরণে, আগুনের যিনি দেবতা।...দংশ আসুক সরাইয়ের পেছনে প্রস্রাবখানার গন্ধে মাতাল হ'য়ে, মূত্রবৃদ্ধিকারক গুল্ম উদ্ভিদের প্রেমিক সে—একটু রশ্মি ছিটিয়ে দিয়ে যাক।'

কাব্যের জগতে যা 'ট্যাবু' বা নিষিদ্ধ ঐতিহ্য-অনুসরণকারী কবির কাছে, জাদুকরের হাতে তা অস্ত্র।

ভেরলেনের কথা খানিকটা আনতে হয় এখানে। 'নরকে এক ঋতু'র শেষে 'ঋতুর দল, বল দুর্গ দল—কোন হৃদয়ে নেই ভুলের ছল' ইত্যাদির পরে র‍্যাঁবোর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ভয়, তাঁর মতিভ্রম তাঁর মাথাটি ঘুরিয়ে দিয়েছে বড্ড। ভেরলেন তাঁকে নিয়ে পারী ছাড়তে চাইলেন— নতুন নতুন দেশ, সমুদ্র ইত্যাদির আশা দেখালেন। প্রলুব্ধ হলেন র‍্যাঁবো। উভয়ে উত্তরের দিকে পাড়ি দিলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই ভেরলেনের সঙ্গ কবির কাছে অসহ হ'য়ে উঠতে লাগল। দুজনের স্বভাবগত বৈসাদৃশ্য প্রকট হ'তে আরম্ভ করল। ভেরলেন তাঁর চাপা কপাল, গর্তে ঢোকা ছোট দুটি ধূর্ত চোখ এবং স্থূল ও ক্ষুদ্র নাসিকা নিয়ে স্বভাবতই উদ্ধত-প্রকৃতি ও উন্নতগঠন র‍্যাঁবোকে নিয়ে কী করবেন ভেবে পেলেন না। ফলে তিনি হ'য়ে দাঁড়ালেন 'নরকে এক ঋতু'র 'পাগলিনী কুমারী', নির্বোধ ও ব্যর্থ প্রেমিকা। সদা সর্বদাই আহত হন, অথচ কাছ ছাড়তে পারেন না। একমাত্র ভয় তাঁর, দয়িত যেন তাঁকে ছেড়ে না যায়।

'নরকের এক সঙ্গীর অকপট স্বগতোক্তি হ'তেঃ

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার, তোমার সেবিকাদের মধ্যে দুঃখীতমা যে, তাকে অধিকার দাও আত্মনিবেদনের—"

'আমি ওর হৃদয়ে ছিলাম এক প্রাসাদের মত যা রিক্ত হয়ে গেছে...কেন যে ওর ওপর এত নির্ভর করেছিলাম! কিন্তু আমার এই আলগা নীরস অস্তিত্ব নিয়ে কী করতে চেয়েছিল ও? ওর সংস্পর্শে তা' এতটুকু উন্নত হ'ল না—এক যদি মরতে পারি।...এই ভাবে দিনে দিনে আমার দুঃখ বেড়েই গেল, নিজেরই ভুল নিজের চোখে প্রকটতর হয়ে উঠছে...। আবার ভ্রমণে বেরোব, শিকার করব মরু-প্রদেশে, ঘুমোব নাম-না-জানা শহরের পথছায়ায় অযত্নে, অক্লেশে। জাগব যখন, কুহকিনী শক্তির দাপটে রীতিনীতি সব গেছে পালটে—পৃথিবী সেই সমতা থেকেও মুক্তি দেবে আমাকে আমার ইচ্ছায়, আমার আনন্দে, আমার অনুদ্বেগে। ওঃ, সেই দুঃসাহসী জীবন যা কেবল শিশু সিরিজের বইয়ের পাতাতেই বিরাজ করে, নিজেকে ভোলবার জন্যে, মুক্তি পাবার জন্যে যার কথা ভেবে আমি এত দুঃখ পেয়েছি, তুমি কি তা দেবে আমায়?—ও তা পারবে না। ওর আদর্শে আমি বিশ্বাস করি না। আশা রাখবার জন্যে, অনুতাপ সঞ্চয়ের জন্যে কতই না বলেছে ও—তাতে আমার কী লাভ!...এই যে ফিটফাট যুবকটিকে দেখছ, ঢুকছে নিঃশব্দে সুন্দর বাড়িটির মধ্যে, নাম এর দুভাল, দুফুক, আর্থা, মোরিস—আমি কি জানি না? এমন পাপী গর্দভটিকে একটি নারী সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিল—আজ সে মৃতা, এতদিনে স্বর্গে সে নিশ্চয়ই কোনো মুনি ঋষির আসনে অধিষ্ঠিতা। তুমিও আমায় মারবে তেমন করে যেমন এই লোকটা মেরেছে সেই নারীকে।'

র‍্যাঁবোর এই জটিল কবি-মানসের পিছনে আছে বিচিত্র ঘটনা-সমাকীর্ণ তাঁর জীবন। সমস্যাগুলি এক অর্থে নিশ্চয়ই সামাজিক। এ কথা অন্তত আংশিকভাবে সত্য যে-ফ্রান্সে, যেখানে বিশেষ করে ধনতন্ত্রী সমাজের সংস্কৃতি তার সকল দোষ গুণ নিয়ে বিকশিত হতে পেরেছিল, একমাত্র সেখানেই এই রকম কবির জন্ম সম্ভব। যে-র‍্যাঁবো *voyou*, পানোন্মত্ত ছন্নছাড়া, তিনি হতে চাইলেন *voyant*, যথার্থ অর্থে দার্শনিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের পথে না গিয়ে গেলেন ম্যাজিকের পথ ধরে আপাতসত্যের দ্বারীকে নমস্কার করতে, হলেন জাদুকর। অন্যভাবে বলতে গেলে, যে-র‍্যাঁবো *voyou* এবং যে-র‍্যাঁবো *voyant*, তাঁদের দুজনের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এ ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না—

একে কিশোর (যতই বিজ্ঞ হোন), তায় সেই সমাজ। কিন্তু সে প্রশ্নে পরে আসব।

নারী সম্বন্ধে র‍্যাঁবোর এক ভাবপ্রবণ নির্লিপ্ততার কথা বলেছি। আবার অন্যভাবে বলতে গেলে, নারী তাঁর কাব্যে এক মস্ত বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাকে তিনি দেখেছেন যথার্থ প্রকৃতির আসনে, পুরুষের থেকে পৃথক করে, এবং বলেছেন, মনুষ্যত্বের ত্রুটি এইখানেই যে সে নারীকে মুক্তি দিতে পারে নি, বন্দী করে রেখেছে। এই মুক্তির আকাশের দিকে চেয়ে থাকা বন্দিনী নারীর কথা অনেক জায়গায় তিনি বলেছেন। যেমন 'মাতাল তরণী'তে শহীদের প্রসঙ্গে নারীর কথাঃ

প্রান্তদেশে কটিবন্ধে আবদ্ধ শহীদ—নিরুপায়
নাচে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিরহ-নিশ্বাসে অনুক্ষণঃ
আঁধার পুষ্পের দ্যুতি পীত হয়ে নয়নে ঘনায়,
আর আমি বসে থাকি নতজানু নারীর মতন।...

তবে এক্ষেত্রে যা উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়ের কথা, তা হচ্ছে এই যে ভেরলেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নারীর এই রকম প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে আর নেই বললেই হয়।

র‍্যাঁবোর কাব্য প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিকাটুকু ছাড়াও আরো যা আলোচনা করার থাকে, তা হচ্ছে তখনকার কাব্যিক আন্দোলন। চরম আত্মকেন্দ্রিকতা, অকারণ মানসিক বিক্ষোভ-জনিত অনুভূতি, আবেগ ও বাসনার সংকেত, ছায়াবাজি, এসব থেকে রেহাই পাওয়ার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সিম্বলিস্টদের পাগল করে তুলেছিল। মুক্তি আনলেন বোদলেয়ার তাঁর মন্দ দিনের কুপুষ্পচয়ন দিয়ে। সেই বোদলেয়ার, র‍্যাঁবোর ভাষায় যিনি 'প্রথম দার্শনিক, কবিদের রাজা, সার্থক এক ঈশ্বর যেন।' বোদলেয়ার প্রবর্তিত 'আর্টিস্টে'র দুটি ধারা দুদিকে প্রবাহিত হ'ল—একদিকে রইলেন মালার্মে ও ভালেরি, অন্যদিকে র‍্যাঁবো ও তাঁর অনুসারী দুর্গম যাত্রীর দল। এঁরা অনুভব করলেন এমন একটি প্রয়োজন যার দ্বারা কবি তার সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারবে, একেবারে সত্তার শুদ্ধ স্বরূপে গিয়ে আঙুল ছোঁয়াবে। 'আমি' ও বিশ্বের যে-দ্বন্দ্ব, তার একটা সমন্বয় চাই। বোদলেয়ারের 'সম্বন্ধ' (*correspondances*) সনেটটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর র‍্যাঁবো সম্বন্ধে সবচেয়ে যা স্মরণীয়, তা তাঁর ১৮৭১ সালের ১৫ই মে তারিখে লেখা বিখ্যাত চিঠিটি যাতে তিনি কবির আদর্শ ব্যক্ত করেছেন, *voyant* হ'তে চেয়েছেন। তিনি বললেন, চোখ আর দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে

কাল্পনিক পর্দা আমরা টাঙিয়ে রেখেছি, তাকে তুলে দিতে হবে—যা দেখব, তা সরাসরিই দেখব, এবং সেইভাবেই তাকে ব্যক্ত করব।

মালার্মে, যদিও সমগোত্রীয় (অবশ্য একটু ভিন্ন অর্থে), র‍্যাঁবোর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই আদর্শ কতখানি অনুসৃত হয়েছে, সে-বিষয়ে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। র‍্যাঁবোকে তিনি বলেছেন *spiritually exotic*, একটা বিস্ফোরণ, যেন একটা উল্কা, কেবল আসার জন্যেই এসেছিলেন, তারপর সহসা অন্তর্হিত হলেন। র‍্যাঁবো তাঁর জবানবন্দী দিচ্ছেন, 'আমি' 'আমি' করে চেঁচাচ্ছ তোমরা, কিন্তু 'আমি' একটা অন্য জিনিস, ইন্দ্রিয়ানুভূতির চিরাচরিত জ্ঞানটাকে একটু ওলটাও পাল্টাও। বললেন, তামা থেকে যদি ভেরী তৈরী হয় এবং সেই ভেরী বেজে ওঠে, তার তো কোনো দোষ নেই—সেইটাকে বাস্তব জগতের একটা সত্য বলে মেনে নাও, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না। কিন্তু ট্রাজেডি হ'ল এই যে র‍্যাঁবো নিজেই (মালার্মে, ভালেরি, কেউ বাদ নন) কাল্পনিক দর্শনের দ্বারা আচ্ছন্ন, পানপ্রেমিক—আর মত্ততার ফলে চোখে যে রঙিন পর্দা চড়ে, সেই পর্দার আলোকে তিনি দেখেছেন নিজেকে—সে-ধিক্কার এবং চেতনাও তাঁরই বর্ণিত 'মদের শেষে ম্লান মধু অধরে ক্ষণেক' অনুতাপের হাসির মত দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। র‍্যাঁবোর অন্তরতলে যে-জাদুকরের বাস, সৃষ্টি তার মন্ত্র নয়, তার মন্ত্র ধ্বংসের, বিপ্লবের—ঘাতকদের সময় তিনি বহন ক'রে এনেছেন (*le temps des Assassins*)। 'দীপালি'র মধ্যে অন্তত এমন তিন চারটি কবিতা আছে যার মধ্যে তাঁর এই আদিম বর্বর মনের ছবি ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে।

'মাতাল পূর্বাহ্নে'র শেষের দিকে বলছেনঃ

'মাতাল জাগরণের ছোট্ট একটু ক্ষণ, তুমি তখনই পবিত্র হয়েছ যখন আমাদের পুরস্কৃত করেছ তোমার এই মুখোশটুকুর দানে। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা যাব রীতির পথে—ভুলব না, আমাদের সমবয়সী সকলকে তুমি কাল ধন্য করেছ। গরলে আমাদের বিশ্বাস আছে। প্রতিটি দিন কী করে জীবন উজাড় করে দিতে হয়, জানি আমরা।

এই তো ঘাতকের সময়।'

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কবিতাটির সঙ্গে বোদলেয়ারের *Enivrez-vous*-র ('মাতাল করো তোমাদের') তুলনা না ক'রে পারি না। র‍্যাঁবো যেন অনেক জালে জড়িয়ে পড়া। তাঁর কাব্য অতুলনীয়—কিন্তু তা ভিন্ন।

সবচেয়ে বড় কথা যা এবং যা আমাদের মুখ্য আলোচ্য, র‍্যাঁবোর দর্শন

ঐন্দ্রজালিক আলোকে ধৌত। এ শুধু একটা কথার কথাই নয়, বা যে-অর্থে সমস্ত কবিই অল্প বিস্তর জাদুকর, সে অর্থে তিনিও জাদুকর, তাও বলা নয়—আসল সত্য এই সামান্য কথার চেয়ে অনেক বেশি। নৃতত্ত্বের এলাকায় পা যদি না-ও বাড়াই, যদি না দেখাই তাঁর কোন কবিতার কোনখানে পরস্পর সংক্রামক (*contagious*) বা সহানুভূতি-সূচক (*sympathetic*) ম্যাজিকের নমুনা রয়েছে, তাতেও কিছু যায় আসে না। অনর্থক কতগুলো গূঢ় পরিভাষা ঢুকিয়ে আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করেও লাভ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা হচ্ছে এই, জাদুকরী বিদ্যার ওপর র‍্যাঁবোর একটু নেক নজর ছিল। তাঁর গদ্য ও পদ্যাংশের নানা জায়গায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই প্রবণতা কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। 'স্বরবর্ণ' সনেটটি তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কিন্তু আরো আছে। বাঁভিলকে উৎসর্গিত কবিতাটি, 'ফুলের প্রসঙ্গে কবিকে কী বললে সে', তার মধ্যে কোনো এক ফিগিয়ে-র (*Figuier*) নাম পাওয়া যায়। এই ভদ্রলোক ছিলেন একজন লেখক। তাঁর বই বার করতেন 'আশেৎ' প্রকাশকরা। ভদ্রলোক বই লিখতেন গূঢ় সমস্ত তন্ত্রের ওপর, ম্যাজিকের ওপর, *alchemy*-র ওপর। শুধু তাঁর বই-ই যে র‍্যাঁবো অল্প বিস্তর মনোনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন, তা-ই নয়, গত শতাব্দীর শেষার্ধের খ্যাততম গূঢ় তান্ত্রিক এলিফাস লেভির রচনাবলীতেও তাঁর রীতিমত জ্ঞান ছিল। এগুলি প্রমাণিত সত্য।

'আগুন চুরি করা' যাঁর খেলা, যিনি 'অধ্যাত্ম-পথে নিজেকে শিকার' করতে বেরিয়েছিলেন, *voyant* হ'তে চেয়েছিলেন, *absolute*-কে জয় করবেন বলে পণ করেছিলেন, ম্যাজিক ছাড়া তাঁর গতি কী? তাঁর ক্ষণায়ু সাহিত্যিক জীবনকে পিছনে ফেলে গেলেন অসীম জয়ের স্পর্ধায়, অভূত-পূর্ব নির্লিপ্ততায়, সেই উনিশ বছরের কিশোর। নতুনতর খামখেয়ালির হাতে আবার আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু হাজার ঝাড়-ফুঁক করেও যে রোগ সারাতে পারে নি, সেই জাদুকরেরই নিয়তি র‍্যাঁবোরও। কোনো *absolute* পাননি তিনি। শুধু আশা রেখে গেলেনঃ

'ভোর বেলা ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হ'য়ে আমরা পৌঁছব আশ্চর্য নগরীতে।'

মনে পড়ে কোনো এক রবীন্দ্র-স্মৃতিসভায় এক নাম-করা গায়ককে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি তার উত্তরে কিছু না বলে শুধু কয়েকখানি গান গেয়ে দিলেন। এর

চেয়ে ভালো উত্তর গায়ক দিতে পারতেন না। মায়াবী কবি সম্বন্ধে অনেক বললাম আমরা। বেশি বলায় আলোচনা শুধু ভারাক্রান্ত হয়। এবার কিছু উদ্ধৃতি করি তাঁর কাব্য থেকে। এক ধরনের সমালোচকদের মত, বেশি উদ্ধৃতিতে আলোচনা তরল হয়ে যায়—কিন্তু র‍্যাঁবোর লেখা এত সংহত, এত ঐশ্বর্যপূর্ণ, যে তাঁর থেকে উদ্ধৃতিতে আলোচনা তরল হয়ে যাওয়ার কোনো ভয়ই নেই কোনোখানে। তা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে যত প্রশ্ন, তার সবেরই উত্তর একমাত্র তাঁরই লেখার মধ্যে খুঁজতে হবে, আমাদের আলোচনার মধ্যে নিশ্চয়ই নয়।

উদ্ধৃতির প্রসঙ্গে আসলে তাঁর কাব্য থেকে পাতার পর পাতা তুলে দিতে ইচ্ছে করে। তবে সে লোভ সামলাতে হবে। অবকাশ কম আমাদের। আপাতত তুলে দিচ্ছি 'নরকে এক ঋতু'র মুখবন্ধটুকু—পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম এই উনিশ বছরের জাদুকরীটিকে বিচার করার দায়িত্বঃ

'আগেকার দিনগুলো, ঠিক যদি স্মরণ হয়, জীবন আমার ছিল উৎসব যেন, যেখানে নিখিল হৃদয় এসে মেলে, সমস্ত সুরার স্রোত অনুকূল হয়।

একদিন সন্ধ্যায় সুন্দরকে বসিয়েছি কোলে, দেখি সে তিক্ত হ'ল, দেখি তাকে আঘাত করেছি আমি।

ন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম মুখোমুখি।

পালালাম—হায় জাদুকরী, ভয়ংকরী, হায় রে ঘৃণা, যা কিছু সম্পদ আমার লুকানো তোমার হাতে।

মন থেকে মানুষী আশার সমস্ত মুকুল নির্মূল করে দিলাম। হিংস্র পশুর এক বীভৎস বধির বন্ধে গলা টিপে ধরলাম প্রতিটি আনন্দের।

ডাকলাম জল্লাদদের, মরবার আগে তাদের খাঁড়ার বাঁট কামড়ে ধরব ব'লে—জড়ো করলাম জাঁতার কল, তারা যেন দ'লে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে পারে আমায় বালুর সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে। দুঃখই হ'ল ভগবান। কাদার মধ্যে বিছিয়ে দিলাম নিজেকে—পাপের হাওয়ায় হাওয়ায় শুকনো হলাম, অনর্থের পাকে পাকে চরকিবাজি খেলাম চমৎকার।

আর বসন্ত এনে দিল আমায় নির্বোধের অপূর্ব এক হাসি।

অবশেষে শেষ প্রবঞ্চনার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মনে হ'ল দেখি না কেন খুঁজে আমার হারিয়ে যাওয়া উৎসবের চাবিটি, পেলেও পেতে পারি আবার স্পৃহা জীবনে।

সেই চাবিটি, দয়া তার নাম। হঠাৎ এই প্রেরণা—এ শুধু স্বপ্ন, জানি। স্বপ্নই দেখলাম। "থাক এইখানে, তরক্ষু—কোথাকার" ইত্যাদি, চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য যার দেওয়া এমন আশ্চর্য মালা পরেছি আফিম গাছের, "সঞ্চয় ক'রে চল মৃত্যু তোর স্পৃহায় স্পৃহায়, তোর মূঢ় আত্মম্ভরিতায়, তোর পাপের যত অমূল্য উপচারে।"

একটু বাড়াবাড়ি হ'ল না? হে শয়তান, বন্ধু আমার, কথা রাখো, কটাক্ষটা স্তিমিত করো—লেখকের কাছে তুমি যা চাও, বর্ণনা নয়, উপদেশ নয়, শুধু ছোট সেই সব অর্ধস্ফুট ভীরু কথা—তার বদলে আজ তোমাকে ছিঁড়ে দিই আমার অভিশপ্ত ইস্তাহারের কয়েকটি গোপন পত্রপুট।'

'নরকে এক ঋতু' সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন, এতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা—অন্তত সাময়িকভাবে নরকে কাল কাটাতেই হয় মানুষকে। আমাদের মনে হয়, এভাবে না দেখলেও চলে এবং এভাবে দেখা উচিতও নয় র‍্যাঁবোকে। এ-নরক তাঁর একান্তভাবে আপনার, এ সেই বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী সমাজ ও সভ্যতার অনিবার্য সৃষ্টি যেখানে মানুষ নিজেকে ঘৃণা করতে উদ্যত হয়, (*merde pour moi*), নিজের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের কিম্ভূতকিমাকার সব সম্বন্ধ গজিয়ে ওঠে, যেখানে সে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, ঈশ্বরকে গালাগাল দেয়, (*merde à Dieu*, *merde* মানে বিষ্ঠা)।

আমরা চলে আসছি তাঁর এক অতি বিখ্যাত কবিতায়, 'বুভুক্ষা'তে—উনিশ বছর বয়সেই লেখা। যে-র‍্যাঁবো *voyou*, পানোন্মত্ত, ছন্নছাড়া, তিনি অন্য কোনোখানেই তাঁর এই প্রবণতা এত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন নি যেমন এখানে করেছেন। এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার। প্রথমত সেই জাদুকর যে কোনো বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মত চক্রবাক হৃদয়, ফুটো হাঁড়ি ও নানান অর্বাচীন গুল্ম উদ্ভিদের শিকড় একত্র করে অদ্ভুত সাধনায় ব্রতী হয়েছে—কী সে তৈরি করতে চায়, কে জানে। অন্যদিকে এখানে লক্ষ্য করবার সেই র‍্যাঁবোকে যিনি সমাজের সমস্ত গরল পান করে নীলকণ্ঠ হতে উদ্যত।

কবিতাটি সম্পূর্ণভাবে না তুলে দিয়ে আমার উপায় নেই—এর প্রতিটি পংক্তির মধ্যে দিয়েই সেই জাদুকর ও সেই সর্বধ্বংসী র‍্যাঁবো নিজেকে ঘোষণা করেছেন যেন রক্তের অক্ষরেঃ

রুচি যদি থাকে কিছুতেই,
তবে মাটিতেই আর নুড়িতেই—

শুধু হাওয়া খেয়ে আমি ভরপুর,
খাই অঙ্গার, শিলা, লোহা-চুর!

হায় বুভুক্ষা ওল্টাও
তুমি চ'ষে বেড়াও
ভূষি, তুষ, তৃণদল,
চুম্বন করো ধুতুরার নীল উজ্জ্বল হলাহলঃ
ঝামা আর ভাঙা পোড়া ইঁট খান খান,
ভক্ষণ কর গির্জার বুড়ো পাথর বিলীনজ্যোতি,
ধূসর উপত্যকায় রোপিত যে-গম হারানো নাম,
বিস্মৃত কোন বন্যা-তাড়িত যে-নুড়ি লুপ্তগতি।

নেকড়ে যেমন চেঁচায় পাতার আড়ালে,
কুটি কুটি করে চারু সুকুমার ডানা,
মুরগির ভোজে মজায় মনটা মাতালে—
আমারও খাওয়ার ধরন তেমনিপনা।

ফল বল আর শাকসব্জীই বল,
মরসুম চেয়ে কাল তারা গুনবেই—
লতিকাবনের ঊর্ণনাভের খল,
ভায়োলেটে ছাড়া রুচি নেই তার নেই।

নির্ভাবনায় তাই ঘুম দিই, সলোমন মহারাজের
যজ্ঞবেদীতে টগবগ করে জলঃ
সে-ঝোল তরল মরচে পুড়িয়ে ছুটেছে সকল পথের
পারে যেইখানে পাতাল প্রবাহ গর্জায় কলকল।

কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে 'নরকে এক ঋতু' ও 'দীপালি'র (*Illuminations*) মধ্যে মূল তফাৎ হ'ল এই যে প্রথমটিতে অজ্ঞানতার আবহাওয়ায় আত্মানুসন্ধান, যে-অনুসন্ধানে ধ্বনিত হয়েছে কোনো রকমে অপরলোকে পেঁছে যাওয়ার এক প্রাণপণ অথচ সামঞ্জস্যহীন উদ্যম, কিন্তু অন্যটি শুধু প্রতিচ্ছবি, প্রভাব, যাতে মন যেন দর্পণে প্রতিফলিত। অনেকে আবার উল্টে বলেছেন, এ-দুয়ের মধ্যে কোনো রকম

যোগসূত্র স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক, এখানেও এমন কিছু কিছু লেখা পাওয়া যায় যা অন্ধকারময় গূঢ়তন্ত্রের আলোকে আলোকিত। দুটি মাত্র উদাহরণ দিই। 'শৈশবে'র তৃতীয় অংশটি নেওয়া যাক প্রথমেঃ

'ঐ বনে একটি পাখি আছে, তার গানে তুমি থেমে দাঁড়াবে, তা তোমায় লজ্জা দেবে। একটা ঘড়ি আছে যা বাজে না।

প্যাচপেচে ঐ কাদার মধ্যে আছে একটি নীড় যাতে থাকে সাদা সাদা সব পাখিরা। একটা গির্জা আছে অধোমুখী এবং একটি হ্রদ ওপরে উঠে গেছে।

ঝোপের মধ্যে ছোট্ট একটি গাড়ি পাবে—পরিত্যক্ত; অথবা সে রেশমি সুতোয় জড়ানো, পায়ে-চলা পথ দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে ছুটতে ছুটতে।

ছোটখাটো একটা যাত্রার দলও পাবে, তাদের বিচিত্র সাজগোজে—বনান্তের ধারের রাস্তায় তাদের দেখা মিলবে।

সব শেষে, যদি তোমার খিদে পায় কি তেষ্টা পায়, এমন কাউকে কাউকে খুঁজে পাবেই তুমি যে তোমায় পেছু তাড়া করেছে।'

বিখ্যাত গুহ্য তান্ত্রিক এলিফাস লেভির নাম আগে করেছি। তাঁর তপস্যায় র‍্যাঁবোও হলেন উদ্বুদ্ধ। 'দীপালির' 'H' কবিতাটিতে যৌন আচারকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক কথায়, কবিতাটি যেন যোনি সংক্রান্ত কোনো বীজমন্ত্র।

'যত রকম পাশবিকতা আছে, সকলকে হার মানায় অরতাঁসের (*Hortense*) উৎকট অঙ্গভঙ্গি। তার একাকীত্ব শৃঙ্গাররসের কৌশল, তার ক্লান্তিতেও প্রেম প্রাণবন্ত বহু যুগযুগান্তরে যখন সে ছিল কোনো শৈশবের অভিভাবনায়, তখনো জাতির শরীরে সেই তো বহ্নিমান অংশ। তার দ্বার মুক্ত রয়েছে, মূর্তিমান দুঃখ।'

উদ্ধৃতির এই প্রসঙ্গ শেষ করি 'স্বরবর্ণ' দিয়ে। প্রতীক বা সিম্বল এখানে কোন্ পর্যায়ে পৌঁচেছে, তা দেখবার মত বস্তু। আসলে শোনা যায়, অক্ষরগুলির সঙ্গে রঙের এই সম্বন্ধের ধারণা কিশোর কবি পেয়েছিলেন এক পুরোনো বর্ণপরিচয়ের বই থেকে। 'নরকে এক ঋতু'তে 'জাদুকরী ক্রিয়া'র মধ্যে বলছেন, 'বার করেছি স্বরবর্ণের রং—আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ই রক্ত, ও নীল, উ সবুজ—প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতি প্রকৃতি নিরূপণ করে দিয়েছি, আর সহজাত প্রেরণার ছন্দেই আজ আবার লালায়িত হয়েছি কাব্যিক এমন একটি সুগম ক্রিয়া পদ আবিষ্কার করতে যা একদিন

না একদিন প্রযোজ্য হ'তে পারবে সমস্ত অর্থে, এই অনুবাদের সর্বস্বত্ব আমি সংরক্ষিত করে রাখলাম।'

এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে—সে বলছিল, যখন সে গান শোনে, স্বর ওঠা-নামা করে, তখন সে যেন মনে মনে নানান রকম রঙের খেলা দেখতে পায়। সেখানে সংগীত ও বর্ণ, এখানে বর্ণ ও সাহিত্য।

এই সনেটটিতে আমরা দেখব, র‍্যাঁবো আরম্ভ করছেন, 'একদিন' তিনি স্বরবর্ণের পরিচয় বলবেন বলে—কিন্তু পরে হঠাৎ কোন এক মিষ্টিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলে যাচ্ছেন তাদের পরিচয় যেন তারা বাস্তবিকই সেই রকমই, যেহেতু তারা তাঁর মনে সেইভাবে স্থান পেয়েছে। এই চেতনা সম্পূর্ণভাবেই ঐন্দ্রজালিক। এখানেই প্রশ্ন ওঠে কল্পনার সর্ব-শক্তিমত্তা অথবা *omnipotence of ideas*-'এর। পাঠকরা আমাকে ক্ষমা করবেন যদি ঋগ্বেদের একটি ম্যাজিক মন্ত্রের (১০.৯৮.১-৭) প্রসঙ্গ এখানে আনি, যেখানে যজ্ঞ পুরোহিত দেবাপি প্রথমে প্রার্থনা করছেন দেবতার কাছে বৃষ্টির জন্যে, তারপর কোনো দেবতার কোনো ধার না ধেরেই নিজেই বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন এক আশ্চর্য ক্ষমতায়।

প্রথমে সনেটটি তুলে দিই। তারপর তার প্রত্যেকটি স্বরবর্ণ নিয়ে ভিন্নভাবে আলোচনা করব।

আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ, ও নীলঃ
স্বরবর্ণ, একদিন তোমাদের গূঢ় পরিচয়
শোনাবঃ আ, কৃষ্ণ নীবিবাস, ক্রূর পূতিগন্ধময়
রোমশ মৌমাছি তারে অবিনয়ে স্ফীত করে, খিল
মহা গুহার; অ, বাষ্প অথবা শিবির ঋজুরেখ,
বল্লম হিমবাহের, শ্বেত রাজা, কম্প্র পুষ্পদল;
ই, লোহিত, রক্ত ইতস্তত, হাসি কোপন চঞ্চল
অথবা মদের শেষে ম্লান মধু অধরে ক্ষণেক;
উ, আকাশবৃত্ত, স্পন্দমান দিব্য সবুজ সাগর,
শান্তি তাপিত জীবের, যে-শান্তি নিখিল জাদুকর
আঁকে স্নিগ্ধতার রসে চিন্তাশীল কুঞ্চিত কপোলে;
ও, পরম ভেরী বাজে তীক্ষ্ণধার অপূর্ব স্বরিত,
লোক-লোকান্তরে দেবযোনি-পুরে মৌন সচকিতঃ
—ওমেগা, তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ হিল্লোলে।

'আ'—মূলে আছে A। ফরাসীরা উচ্চারণ করে আ-ই। তাই A-কে 'আ' করেছি। 'আ' কৃষ্ণ, সেই শূন্য যার থেকে সমস্ত কিছুই পূর্ণতা

প্রাপ্ত হয়—বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, তাকে তুলনা করা হয়েছে তাই সৃষ্টির আরম্ভের সঙ্গে যা বর্বরতার দুঃস্বপ্নে কুটিল। 'A'কে যদি উল্টে 'V'-র মত করে দিই, তা যোনি-চিহ্নে পরিণত হয়। 'আ' তাই সেই নীবিবাস যা ক্রূর পূতিগন্ধময় রোমশ মৌমাছিদের দ্বারা অবিনয়ে স্ফীত, খিল মহা গুহার।

'অ'—মূলে আছে E। 'E'-র ফরাসী উচ্চারণ আমাদের 'অ' আর 'ও'-র মাঝামাঝি এমন একটা ব্যাপার যা বিদেশীদের আয়ত্ত করতে রীতিমত বেগ পেতে হয়। আমি বেগতিক দেখে 'অ' বসিয়ে দিয়েছি। 'E' মূর্তিমতী স্ত্রী, সৃষ্টির নিষ্ক্রিয় উপাদান, চাঁদ, ফুল, দৃষ্টি, মিথ্যা—আলোকের পথে উঠতে গেলে এদের সাহায্য অথবা অতিক্রম অপরিহার্য। 'E'-কে শুইয়ে দিয়ে এই রকম করা যাক: ꟺ। হ'য়ে গেল ঋজুরেখ, সাদা থেকে এল হিমবাহের বল্লম ও শ্বেত রাজার প্রশ্ন। এই ভাবে E-কে শুইয়ে দিলে মনে হয়, এ যেন ভোরবেলার কোন ফ্যাক্টরির চিমনির সারি, তলার রেখাটি নেমে-আসা সরলরেখ মেঘের পুঞ্জ।

'ই'—মূলে আছে I। যদিও ইংরেজি উচ্চারণ 'আই', ফরাসীরা উচ্চারণ করে 'ই'। 'ই'ই রেখেছি। 'ই' লোহিত, রক্ত ও কামের চিহ্ন (তুলনীয়—'নরকে এক ঋতু'র 'দুষ্ট শোণিত'), সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদানের সংগম এতে। 'I'-কে যদি শুইয়ে দিই, হয় ⟝। ঠোঁটের রূপ। ঠোঁটও লাল এবং তা থেকে হাসির কল্পনা, ম্লান হাসি, মত্ততার পরে অনুতাপের।

'উ'—মূলে আছে U। ফরাসীরা উচ্চারণ করে 'য়্যু'। 'U' শান্তি, ধ্যান ও বিজ্ঞানের রূপ। ক্লান্ত চোখে সবুজ প্রান্তর শান্তির স্নিগ্ধতা আনে। 'U'-ও সবুজ। সমুদ্রের রংও সবুজ কোনো কোনো জায়গায়—তার তরঙ্গে তরঙ্গে অনেক 'U'-র সৃষ্টি হয়। সবুজের ফরাসী *'vert'*—তাই আকাশবৃত্ত ও বিশ্বজগতের (*'univers'* ফরাসীতে বিশ্ব, তাকে করে দেওয়া যাক *'uni+vert'*) প্রসন্ন দাক্ষিণ রূপের কল্পনায় সবুজ চলে এল।

অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে ফরাসী 'vert' যেমন শুনতে পাতলা পাতলা লাগে, তেমনি ফরাসী 'U'-ও ততটা জোরালো ও গম্ভীর নয় যতটা জার্মান 'ü'। জার্মান *grün*-এর (মানে ইংরেজিতে *'green'* বা সবুজ) কল্পনা তাই আপনা থেকেই আসে তাদের ü হ'তে। ডাচ *'groen'*-ও ('খ্রুন' উচ্চারণে) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাই যাঁরা মৃদু আপত্তি তুলেছেন, তাঁরা বলেন, ফরাসী 'U'-তে সবুজের কথা ততটা মনে হয় না যতটা নীল বা *blue*-র কল্পনা জাগে।

র‍্যাঁবোর কাব্যে সবুজের একটি বিশেষ আসন আছে। যেখানে

সবুজের কথা আপনা হ'তে আসে না মনে, সেখানেও তিনি সবুজ চালিয়ে দিয়েছেন—যেমন 'মাতাল তরণী'তে 'স্বপ্ন দেখি, ঝলসিত তুষারের সবুজ রজনী......'।

'ও'—মূলে আছে O। ফরাসীরা উচ্চারণও করে 'ও'। 'O' ওমেগা, প্রাণ—'O'-র মধ্যে 'ডায়েলেকটিকের' চেতনা। ওমেগা বা শেষ, দুই অর্থেই। বর্ণমালার শেষ অক্ষর, তাই একদিকে যেমন নিছক অবসানের ইঙ্গিত, অন্যদিকে শেষ লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থান। ভেরী (ভেরীরও পিছন দিকটা O-এর মতনই আকার) বাজছে অসীম নীলে—তাতে লোক-লোকান্তরে দেববোনি-পুরে মৌন সচকিত। 'O' ফিরে পাওয়া শাশ্বতীর প্রতীক।

আবার ফিরে পেয়েছি তারে।
কারে?—শাশ্বতীরে।

'রোমশ মৌমাছি' থেকে উঠলেন র‍্যাঁবো 'নীল কিরণ-হিল্লোলে'।

কাণ্ডকারখানা দেখে এলিঅট বললেনঃ *'After such knowledge, what forgiveness?'*

কিন্তু ক্ষমা চেয়েছিল কে?



তিনজন ফরাসী কবি, যাঁরা আমাদেরও

কাব্য সম্বন্ধে লেখা কাব্য হয় না, সাহিত্য সম্বন্ধে লেখা সাহিত্য হয় না, শিল্প সম্বন্ধে লেখা শিল্প হয় না—জানি। তবু মাঝে মাঝে দেখা গেছে ইতিহাসে, এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাবে, কবিরা সাহিত্যিকরা শিল্পীরা নিজেরাই লিখতে বসেছেন কাব্য বা সাহিত্য বা শিল্প সম্বন্ধে, কখনো গ'ড়ে তুলতে একটি তত্ত্ব যাকে তাঁরা নির্বিশেষ আখ্যা দিতে চান দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে, কখনো বা শুধুই আরো জোরে স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে যথার্থ কী বস্তুটি তাঁরা, সেই কবিরা বা সেই সাহিত্যিকরা বা সেই শিল্পীরা, বলতে চান, এবং যেভাবে তাঁরা সেই বস্তুটিকে বলতে পেরেছেন বা বলতে চেয়েছেন, তা এমন একটি বিশেষ দৃষ্টি, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দর্শন পর্যন্ত, ও ভঙ্গীর কাঠামোর মধ্যে পড়ে কি না যাকে বলা যেতে পারে তাঁদের ব্যক্তিগত, তাঁদেরই মৌলিক। এই দুটি অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টার মধ্যে দ্বিতীয়টির পরিব্যাপ্তি লেখার আয়তনে দীর্ঘতর ও লেখকদের অনুভবের প্রচণ্ডতায় মহত্তর, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমত বিশেষকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বিশেষই দাঁড়ায় না, বিশেষের সমষ্টিকে ধ'রেই নির্বিশেষ পেতে পারে একটি সামগ্রিক চেতনা, অন্ত না থাকলে অনন্তের অর্থ তো নেই-ই, সত্ত্বাও নেই। দ্বিতীয়ত, এবং যে কারণটি প্রধান, সকল বিজ্ঞান ও অন্তত আংশিকভাবে সকল দর্শনও যেখানে হ'তে চেয়েছে নৈর্ব্যক্তিক সত্য, কাব্য বা সাহিত্য বা শিল্প, এক কথায় সকল শিল্পসৃষ্টি, সেখানে হ'তে চেয়েছে একটি ব্যক্তি-বিশেষের অভিব্যক্তি, তার আমি-র আত্মিক চেতনা বা বেদনা বা অভিনি-বেশের প্রকাশ। বিজ্ঞানেও, এবং দর্শনে তো বটেই, আজকাল ক্রমশই দেখা যাচ্ছে যে তথাকথিত সেই নৈর্ব্যক্তিকতাটি শেষ পরীক্ষায় একটি নাম-হীন আপেক্ষিকতার নামান্তর, তাতেও প্রতিফলিত ব্যক্তিগতের চেতনা ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাতে সেই নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার প্রয়াসটি সর্বদাই বর্তমান আছে, এবং তা খোলাখুলিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা' যে সত্যটিকে ধরতে চেয়েছে তা' শুধু আমার বা তোমার হবে না, ঐ গাছের, ঐ পাখির, ঐ ধূলোর বা ঐ তারার হবে না, তা' সত্য হবে এই আমাদের, ঐ তাদের সকলের পক্ষে। কাব্য কিন্তু গলা ফাটিয়ে হ'তে চাইল নিতান্তই "আমার", ব্যক্তির—কবি বললে "আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল

সবুজ।” শিল্পীও তার গায়ের জোরে, বরং তুলির জোরে, ভাঙছে নিরন্তর চেনার পরিচিত আকার, তাকে দিতে একটি আকৃতি, ও প্রকৃতিও, যা তার একান্তভাবে নিজেরই পরিচয়ের, যা তার একান্তভাবে ব্যক্তিগত, আপনার।

অন্যদিকে, রয়েছে নির্বিশেষও—সে-ই পরম সত্য, অধিষ্ঠিত সকল শিল্পসাধনার পথের শেষের মন্দিরে। অন্ত যা বিশেষকে থাকতেই হবে সাধনার মাধ্যম ও উপকরণ হিসাবে, কিন্তু তারা কখনোই সাধনার লক্ষ্য হ'তে পারে না—এবং যদিই বা হয় তো সে সাধনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য অব্যর্থ-ভাবে। চিরকাল তাই দেখা যায় শিল্পসৃষ্টি চেয়েছে সেই নির্বিশেষকে ধরতে, বাঁধতে, প্রকাশ করতে। কবি সাহিত্যিক শিল্পীরাও যখন তাঁদের সাধনার একটি তত্ত্ব খুঁজতে চেয়েছেন বা তাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তখন বিশেষকে প্রায়ই তুলে ধ'রে দেখতে চেষ্টা করেছেন নির্বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে, দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে।

উক্ত দুটি প্রচেষ্টার প্রত্যেকটিই স্রষ্টার পক্ষে একটি বিধুর, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। সূর্যাস্তকে পাওয়া গেল না, যাবে না, সূর্যাস্তের বিশ্লেষণে। তবে কবিদের সাহিত্যিকদের শিল্পীদের এই যে সমস্ত উক্তি তাঁদের পথ বা সাধনা বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে, যাকে তাঁরা প্রায়শই তাঁদের তত্ত্ব বা দৃষ্টি বা দর্শন বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন, তা স্বয়ং কবিতা বা শিল্প বা সাহিত্যের সম্পূর্ণতা অর্জন না করতে পারলেও তার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ আছে শিল্পচেতনার সমকালীন ও ঐতিহাসিক ধারায় প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, তা' প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পীর সৃষ্টিসাধনাকে আরো একটু ভালো ক'রে বুঝতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, ও মুখ্যত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নিভৃত কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে এই সব কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছেন শুধু নতুন কিছু বলবার তাড়নাতেই, দিতে একটি নতুন ব্যাখ্যা, একটি নতুন ভঙ্গী বা একটি নতুন মর্মার্থ শিল্পসাধনার। এঁদের যে সবাই সব সময় সত্যিই তেমন একটা কিছু নতুন প্রতিপাদ্য নিয়ে পাঠকদের সামনে এসে উপস্থিত হ'তে পেরেছেন, তা' নয়। সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রতিপাদ্যের নাম করে ভূরি ভূরি বহু আবর্জনা ইতিহাস সঞ্চয় করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। প্রাসঙ্গিক যা, তা হচ্ছে সেই তাঁদের কেউ কেউ, যাঁদেরও সংখ্যা অনেক, তাঁদের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণের পথ ধরে কখনো কখনো দেবার চেষ্টা করেছেন আকস্মিক-ভাবে নতুন একটি ব্যঞ্জনা অন্তরের প্রকাশধর্মী প্রচেষ্টার। এই ধরণের

ব্যঞ্জনাতে নিশ্চয়ই প্রতিফলিত নানা অর্থে নানা জনে যাকে বলে থাকেন যুগধর্ম, যা একটি যুগের সামগ্রিক চিন্ময় সত্তা এবং যার যথার্থ অনুধাবনের প্রয়োজন আছে ঐতিহাসিকের। কিন্তু ঐতিহাসিক যদি তার মধ্যে শুধু যুগটিকে দেখেই চোখ বন্ধ করেন তো তিনি দেখলেন না তার সব, তার মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে যুগাতীতের যে গুপ্ত কথাটিও, যা চলে যুগ হ'তে যুগান্তরে, টপকে টপকে, এক যুগে বলা বা লেখা হ'য়ে গেলেও পরবর্তীর অন্য যুগ-যুগান্তরে যার ধ্বনি অনুরণিত হ'তে পারে। ফেলে আসা, ভুলে যাওয়া বহু যুগের এই ধরণের কয়েকটি "নতুন" ব্যঞ্জনার অনুরণনে আজও সমৃদ্ধ আমাদের জীবন। এরা নতুন, এরা পুরানো হয় না, কারণ কালস্রোতের সেই বহুকথিত গুণটি যা' বর্তমানকে চিরকালই আধুনিক আখ্যা দেয়, যা' চিরকালই একটা কিছু ফেলে আসছে ও অন্য আরেকটা কিছুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাও ঐ ব্যঞ্জনাগুলির মধ্যে ক্রমাগতই নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে পারে, তা' আগামীর রূপায়নে অজস্র অনুপ্রেরণা পেতে পারে এদেরই মধ্যে।

আমার বর্তমান আলোচ্য তিনটি কবি, যাঁরা ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন যুগের, ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের, ও নিশ্চয়ই ভিন্ন যুগধর্মের। পল ভেরলেন, স্তেফান মালার্মে ও আর্ত্যুর র‍্যাঁবো, এঁরা তিনজন ফরাসী কবি গত শতাব্দীর ও তাঁদের দেশের একটি বিশেষ পর্যায়ের। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে খুঁটিনাটি পার্থক্য নিশ্চয়ই অনেক আছে, প্রত্যেকেই তাঁরা এক একটি দ্বীপ, যদিও সেই পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দ্বীপগুলির তীর ধোওয়া একই সাগরের লোনা জলে। সাহিত্যের ইতিহাস এঁদের তিনজনকে মিলিয়েছে একই পরিচ্ছেদে -তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টির সমতা ও পার্থক্য, দুই-ই একত্রে মিলে তাঁদের সম্মিলিত কাব্যকে দিয়েছে একটি ঐক্যবদ্ধ দর্শন। তাঁদের এখানে একসঙ্গে আলোচনা করার পক্ষে এ যুক্তিটি তো আছেই, কিন্তু তা' প্রাথমিক। অন্য গুহ্য কারণও আছে।

সর্বপ্রধান কারণ হ'ল তাঁদের প্রচণ্ড সমসাময়িকতা, এই আজকেও, এই আমাদের বাংলা দেশেও। আজকের বাংলা কাব্যের একটি দীপ্তিমান অংশ ক্রমবর্ধমান সচেতনতায় জাগছে দেশদেশান্তরের ঐতিহ্যের প্রতি—ভেরলেন-মালার্মে-র‍্যাঁবোর নাম ও কবিতা বাঙালী কাব্যরসিকের সুপরিচিত। তা' ছাড়া, এতক্ষণ কিছুটা দীর্ঘ ভূমিকায় যা' বলবার চেষ্টা করেছি, কবিতার আত্মায় সেই নির্বিশেষ ও কবি-বিশেষে বিভিন্ন ব্যক্তিগত রূপটির ব্যাখ্যার চেষ্টা এই তিনজনেই অল্পবিস্তর করেছেন, যে ব্যাখ্যায় এমন কিছু

প্রতিভাত হয়েছে যা' তার ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনায় আজও সমানই অর্থপূর্ণ ও যা' উদ্দীপ্ত করেছে, করছে সারা জগতের বহু কবিকে। গোড়ায় যদি কাব্য (বা সাহিত্য বা শিল্প) সম্বন্ধে কবিদের নিজেদের লেখার আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি তো তার কারণ শুধু এই যে এই তিন কবিই কখনো কখনো তাঁদের নিভৃত আসন হতে বেরিয়ে এসে বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়াতে বাধ্য বোধ করেছেন নতুন কিছু ঘোষণা করার তাগিদেই, জানাতে তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা। বক্তৃতার মঞ্চ অবশ্য কথার কথা মাত্র, তার অর্থ এখানে এই যে এঁরা এঁদের বক্তব্যকে জানাতে চেয়েছেন শুধু কবি হিসেবেই নয়, শুধু কবিতার মাধ্যমেই নয়, কখনো সোজাসুজি বক্তা হিসেবেও, হয় তাঁদের চিঠিতে, নয়তো কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, নয়তো বা অন্য কোনো মাধ্যমের মারফৎ। আমার আলোচনার বিষয় তাই ততটা তাঁদের কবিতা নয়, যতটা তাঁদের কাব্যদর্শন। যদিও এই দুটির একটিকে আরেকটি হ'তে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, তাও মানি।

এই তিনজনের এখানে একত্র করার পিছনে আরো একটি কারণ আছে। যাকে আজ আমরা ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা বলে চিনতে শিখছি ও যে কবিতায় অন্যতম পথপ্রদর্শক এই তিনজন কবি, তা' মূলত বহুলাংশে ঋণী ভারতীয় দর্শন·ও দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে। ইতিহাসের এক বিচিত্র উজানস্রোতের মোহনায় ভারত ও ইউরোপ মিলল আবার অনন্তের অভিসারে। এ হচ্ছে আমাদের আগে দিয়ে পরে ফিরিয়ে নেওয়া—তবে ফিরিয়ে নেওয়া আর সেই একই জিনিস নয়। কারণ সে জিনিসের রূপ বদলেছে যখন তা' প্রথম দেশান্তর পাড়ি দেয়, অর্থাৎ সেই দেশান্তর বাসীদের কাছে, তার রূপ দ্বিতীয় বার পালটায় যখন আমরা তাকে আমদানি করে আনলাম আবার। আমাদের বেদনা বা আনন্দ হয়ে গিয়ে দাঁড়াল পাশ্চাত্ত্য নির্বেদে, এবং সেই নির্বেদকে আজ আমরা আমদানি করছি আমাদের মননশক্তির সীমা ও সমাজগত বা জাতিগত বা ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যের পরিবেশে। সুতরাং এই তিনজন কবি নানাদিক দিয়ে আমাদেরও আজ। উক্ত প্রসঙ্গগুলির প্রত্যেকটিরই আলোচনার প্রয়োজন আছে—কিন্তু আগে আরম্ভ করা যাক একটির পর একটি কবিকে নিয়ে।

ভেরলেন সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে তিনি একজন গৌণ কবি, কিন্তু সেই গৌণতা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি, বরং যতই দিন যাচ্ছে, কবি হিসাবে তাঁর সামান্যতা একদিকে যেমন বেশি করে ধরা পড়ছে, অন্যদিকে তেমনি তিনি জাগছেন যেন ক্রমশই আরো উজ্জ্বল হয়ে ফরাসী কাব্যের একটি চমকপ্রদ পর্যায়ের এক

অন্যতম মুখপাত্র হিসাবে। ফ্রান্সে যে যুগে ভেরলেন জন্মেছিলেন, তার কিছুটা আগে থেকে ও তার কিছুটা পরে ক্রমাগতই, এবং তাঁর জীবনকালেও, কবির রসায়নাগারে চলছিল এক যুগান্তকারী পরীক্ষা। কী হবে কবিতার আত্মা, এই "আমি" বস্তুটা শেষ নিরীক্ষণে আসলে কী, কবির সঙ্গে ভিড়ের সম্পর্কটা কোথায় বা কোনো বলবার মত সম্পর্ক থাকতে পারে কি না, অথবা কবিতায় যা বাহ্যিক উপাদান তা কতদূর কবিতার অন্তরাত্মাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারে ও সেই অবয়বের কোন্ বিশেষ রূপটি হবে যথার্থ, এইসব চিরাচরিত প্রশ্ন ও চিরকালের পরম সমস্যাগুলির নতুন নতুন উত্তরের প্রাণান্ত অনুসন্ধানে সেই দেশের ও সেই যুগের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ছিল। ভেরলেনের মাত্র কয়েকবছর আগে এসে গেছেন বোদলেয়ার, এক কবি সিংহ, যাঁর গর্জনের মহিমা তখনো সর্বতোভাবে উপলব্ধ হতে আরম্ভ না হলেও তরুণদের মধ্যে তার একটা অন্তত আংশিক ও অতি আন্তরিক সাড়া জেগেছে—আর এসেছে ভাগনারের অন্য লোকের সংগীতের প্রতি একটি ক্রমবর্ধমান চেতনা কয়েকটি মুষ্টিমেয় গুণীদের মধ্যে, এসেছে শিল্পের জগতে "ইম্প্রেশনিজম" বা বিম্ববাদ। সংগীত ও শিল্পের সঙ্গে কাব্যকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের যুগপৎ মিলনে যে এক সর্বাঙ্গীন শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা নেহাৎ অকল্পনীয় তো নয়ই বরং সাধনার বস্তু, এই অভিনব দৃষ্টিও ঐ একই যুগের দান। আজ যেমন করে ইওনেস্কো প্রমুখ বহু উগ্র আধুনিক নাট্যকারেরা প্রোকোফিয়েভের সংগীতে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, এক শতাব্দী আগে সেই রকম করেই ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা পেয়েছিল বিজাতীয়কে, অপ্রকাশ্যকে ভাগনারের সংগীতে, ও সেই সংগীতের দ্বারা তা প্রকাশধর্মী প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে বিম্ববাদী শিল্প আনল এক নতুন আলোকবর্ষী চেতনা তৎকালীন শিল্পদর্শনের উপর, নতুন এক আলোর খেলার প্যাঁচে ফেলে তা দ্রষ্টব্যকে দেখাতে চাইল একটি অভিনব আঙ্গিকে ও ভঙ্গীতে, আগের মত আর সরাসরি বা পরিষ্কার ক'রে নয়, কিন্তু এবার আবছায়া মোহিনী মায়ায়, ফুটিয়ে তুলতে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে ততটা আর দেহ বা কাঠামো নয় যতটা দিতে চেয়ে অনুভবের একটি সম্পূর্ণ রূপ দ্রষ্টব্য বস্তু বা বিষয় বা ব্যক্তির একেবারে আত্মাটিকে। এবং বোদলেয়ার স্বয়ং এক নতুন শিল্প-আলোচনার ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন আগেই।

তবু এ শুধু তখনকার চারিদিকে বহু জানালা খুলে যাওয়ার মাত্র দুয়েকটি দিক। এবং দিক ফলের, কারণের দিকটা নয়। কারণের দিকে

ছিল তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তায় অনেক গৃহীত সত্যের প্রায়-রাতারাতি ওলটপালট, যা' এতদিনকার নিস্তরঙ্গ হ্রদের জলে সহসা যেন এনে দিল সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। এই জাগরণের সম্পূর্ণ কোন ছবি দেওয়া অসম্ভব, এবং সেই ছবিটি জটিল, তা' বিস্তৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখায়, বিধৃত বহু ব্যক্তি, বহু সমষ্টি ও বহু খুঁটিনাটিকে আঁকড়ে। তা' ছাড়া, এর সবই ঘটেনি একই সঙ্গে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের সীমার মধ্যে, কিন্তু ঘটে গেছে ক্রমাগতই, আজো ঘটছে—এ অজস্র বক্র রেখার একটি সমষ্টি যা' বহুমুখী ও বহু বছরের সাধনায় প্রসারিত। আর, সেই ছবিটির সম্পূর্ণ আয়তন সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞানের সীমাও সংকীর্ণ, শুধু তার সামগ্রিক সত্তা যদি কিছু থেকে থাকে, অন্তত যেভাবে আমি তাকে গ্রহণ করতে পেরেছি বলে মনে করি, সেইভাবে সেই সত্তাটিকে সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে। আমাদের অল্প-পরিচিত নাম ও ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনায় পাছে বক্তব্য অযথা ভারাক্রান্ত হয়, যে-নাম বা যে-ঘটনাটি না উল্লেখ করলেই নয়, শুধু সেই সারটির কথা এখানে আলোচনা করছি।

ভেরলেন, ও একই অর্থে মালার্মে এবং তাঁদেরও আগে বোদলেয়ার ও বোদলেয়ারেরও আগে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকরা, প্রধানত যার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে বাধ্য বোধ করেছিলেন তা' হচ্ছে সেই যুগের "পজিটিভিজম্" বা প্রত্যক্ষবাদের দর্শন। কী নীতির ক্ষেত্রে, কী কাব্যে বা শিল্পে, কী সমাজ-চিন্তায়, প্রত্যক্ষবাদীরা ভেবেছিলেন তাঁরা অবশেষে সমস্ত রহস্য সমাধানের শেষ চাবিটি খুঁজে পেয়েছেন, তাঁরা চেয়েছিলেন এই জগতকে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পরিষ্কার প্রাঞ্জল ভাষায়, জেনেছিলেন যে সবই নিশ্চয় ব্যক্তের সীমার মধ্যে। থাকতে পারে না আর অসীম, আর অব্যক্ত, আর রহস্য—এই ছিল তাঁদের বক্তব্য। কিন্তু ক্রমশই দেখা যেতে লাগল রহস্য সর্বত্রই রয়ে যাচ্ছে, অসীম রয়ে যাচ্ছে, অব্যক্ত রয়ে যাচ্ছে। তরুণ বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই আর সান্ত্বনা পেলেন না প্রত্যক্ষবাদে—তাঁরা মেনে নিতে চাইলেন অবোধ্যকে, অপ্রকাশ্যকে, অসীমকে। কিন্তু সেই অপ্রকাশ্যকে কী ভাবে প্রকাশ করা যাবে, অব্যক্তকে কী ভাবে ব্যক্ত করা যাবে? তবু তা-ই কি নয় শিল্পের ক্ষুরস্য ধারার সাধনা যুগযুগান্ত ধরে, চিরকালের? তাই এই নতুনরা দেখলেন এবার যে চাই এক অন্যরকমের আঙ্গিক, সাধনার এক অন্যরকমের অস্ত্র। ভেরলেন বললেন, আর রঙ নয়, শুধু আভাস লাগাও। কারণ একমাত্র আভাসেই হয়তো সম্ভব হবে সূক্ষ্মতম অনুভূতির অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা।

কাব্যকে হতেই হবে একটি সম্পূর্ণ উক্তি, পরমের বা অব্যক্তের দিগন্ত-ছোঁওয়া। তাই বোদলেয়ার চাইলেন একটি "সম্মিলন" বা "সংযোগ", যাতে বাঁধা পড়বে ঐক্যের সুরে সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনার একতান ঝংকার, যাতে সঙ্গীতের উপাদানে কাব্য হবে সমৃদ্ধ। সব ছেড়ে সঙ্গীত কেন? কারণ সঙ্গীতেরই মধ্যে সব চেয়ে বেশি করে এমন একটা কিছুর প্রকাশের চেষ্টা আছে যা' সকল ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদ মরে নি এত তাড়াতাড়ি। পরে, সময়ের স্রোতে গড়িয়ে, তা' নাম নিল "ন্যাচারালিজম্" বা প্রাকৃতবাদের—সেযুগের বহু উপন্যাস-নাটকে তার দর্শনের জয় ঘোষিত হতে থাকল। কিন্তু, একই সঙ্গে, বিরুদ্ধদলের মধ্যেও পড়েছে সাজ-সাজ রব, এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই নাম করবার মত অনেক তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের বিক্ষুব্ধ অন্তরসমুদ্রের গর্জন শোনাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে। অল্প কথায় পরিষ্কারভাবে কী করে এটিকে বলা সম্ভব হবে জানি না, তবে এই নতুনরা তাঁদের সংগ্রামে যে একটি অশ্রুতপূর্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলেন, তা' আন্তরিকতার প্রচণ্ডতায় ও অনুভবের মাহাত্ম্যে তাঁদের আজো নমস্য করে রেখেছে ইতিহাসে। সকল সাহিত্যের ইতিহাসে এ একটি অবিস্মরণীয় পর্যায়, এর বিশিষ্ট কাব্যে ও শিল্পে সেই মহান অন্তর্দ্বন্দ্বের বুক-ফাটা রক্তের স্বাদ।

এক স্বাভাবিক অসন্তোষ তো ছিলই প্রত্যক্ষবাদীদের সকল রহস্য উড়িয়ে-দেওয়া ব্যাখ্যায়, যে-ব্যাখ্যা বোঝাতে পারল না মানুষের অন্তরের অভীপ্সা ও হাতাশা-নিরাশার সবটুকুকে। কিন্তু বিজ্ঞানও হাতে হাত মেলাল এই অসন্তোষের। বৈজ্ঞানিকরাও দেখতে আরম্ভ করলেন যে রহস্যকে যতই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা যায়, সে ততই মাথা তুলে দাঁড়ায় অনন্ত আকাশে। তারপর রয়ে গেছে শুধু দৈনন্দিনের তুচ্ছ অনেক কিছু অবোধ্যই নয়, মানুষের আধ্যাত্মিক কৌতূহলও, যা' সব সময় ব্যবহারিক যুক্তির কথায় ওঠে-বসে না। আধ্যাত্মিকতা?—তা' তো বিলাস মাত্র, প্রত্যক্ষবাদীরা বললেন নাক সিঁটকে। কিন্তু তার প্রতি মানুষের কৌতূহলটিকে তাঁরা দমাবেন কী করে? ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে স্বনামধন্য দার্শনিক স্পেন্সারের একটি প্রভূতভাবে বিদিত ও আলোচিত বইএর অনুবাদ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তরুণদের দল তার মধ্যে দেখল তাদেরই ধ্যান ধারণার স্বীকৃতি। লোকে সান্ত্বনা পেল জেনে যে অজানা বলেও, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেও একটা বিরাট, প্রধান জিনিস থাকতে পারে। প্রত্যক্ষবাদীদের এক মাননীয় গুরু ছিলেন কঁত, স্পেন্সার আবার প্রথম

হতেই সেই ক'তের মহান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর অন্যতম প্রতিপাদ্য হলঃ যে শক্তি নিয়তই রূপ দিচ্ছে এই বিশ্বজগতকে, তা' আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ-ভাবে অভেদ্য, আমাদের বোধের অগম্য চিরকালের জন্যে তা'। নতুন দলের মহারথীরা বিস্ময়ে বললেন, বাঃ, কী চমৎকার, কী সত্য কথা!

ধীরে ধীরে অজ্ঞেয় হতে এল গুপ্তের, গুহ্যের চেতনা। প্রাচ্য দর্শন ও চিন্তার অধ্যয়নও তখন আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় দর্শনপ্রেমিক শোপেন-হাওয়ারের বাণী ঔৎসুক্য জাগিয়েছে, যে বাণী প্রত্যক্ষবাদীদের ভ্রূক্ষেপ না করে বলল জগতটা মায়া, তার সব কিছু রূপ পেয়েছে এক গুপ্ত, অজ্ঞেয় অপরূপ হতে। এমনি করেই আরম্ভ হল একটি নতুন আদর্শবাদের ভিত্তি স্থাপন। এ সবেরও বহু আগে থেকে ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ বেরোতে আরম্ভ হয়েছে ফরাসী ভাষায়। সেখানকার জ্ঞানী-গুণীদের অনেকেই পড়েছেন গীতা, ভাগবত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত। ১৮৪৫-এ ফ্রান্সের বিশিষ্ট ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ বুরনুফ তাঁর বুদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। বহু কবি, বোদ-লেয়ারের আগেও, ভারতীয় দর্শন হতে সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এমন কি র‍্যাঁবোর সঙ্গেও গীতা ও উপনিষদের সম্পর্ক কিছু আছে কি না, তা' নিয়েও অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি অতি বিশদ আলোচনা হ'য়ে গেছে। এই সব আলোচনায় প্রায়ই যে অত্যুক্তি থাকে নি, এমন নয়—যেমন রলাঁ দ্য রনেভিল একটি সাম্প্রতিক দীর্ঘ নিবন্ধে প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে র‍্যাঁবো ও ভারতীয় চিন্তাধারা প্রায় একেবারে একাত্ম—তবে এই ধরণের অত্যুক্তিও শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে প্রাচ্য চিন্তাধারা এবং বিশেষত ভারতীয় চিন্তাধারা অনেকাংশে ও অন্তত পরোক্ষভাবে রূপ দিয়েছিল এই নতুনদের আদর্শবাদকে, ও তাকে প্রত্যক্ষবাদের সংকীর্ণ গণ্ডী হতে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় বেদনা বা আনন্দ আর সেই যুগের (অনেকখানি আজকেরও) ফরাসী নির্বেদ এক বললে হয়তো বেশ একটু বাড়াবাড়ি করা হবে। তবে সেই নির্বেদের যে আধ্যাত্মিক রূপটি কবিরা দিতে চেয়েছিলেন, তা' কম অনুপ্রেরণা পায়নি ভারতীয় অব্যক্তের অভিব্যক্তি হতে।

এক কথায়, যখন চিন্তা ও দর্শনের জগতে এইরকম একটি বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, এক নতুন জাগরণের আবহাওয়ায় সারা দেশটা গমগম করছে, তখন এলেন ভেরলেন। পুরানো ও নতুন, এই দুয়ের দুটি বিপরীতধর্মী স্রোতের সংঘাতে পড়ে' তাঁর জীবন—ব্যক্তিগত ও কবির, দুইই—বহু ক্ষত চিহ্ন সঞ্চয় করেছে। তবু, কখনো সন্দেহে, কখনো অটুট প্রত্যয়ের

দৃঢ়তায়, তিনি শেষ পর্যন্ত দিয়ে যেতে পারেন আগামীর দিকের ইংগিত।

পল ভেরলেন বেঁচেছিলেন বাহান্ন বছর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তিনি বেঁচেছিলেন দুই যুগে, বরং দুই যুগধর্মের আলোছায়ার দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতিতে। তাঁর জীবনের গোড়ায় ফরাসী কাব্যে চলছিল পারনাসদের রাজত্ব, এবং তাদের সে আন্দোলনে তিনি নিজেও কিছু সামান্য অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে ধীরে ধীরে, তাঁর অনুবর্তী ও অন্যান্য অনেক তরুণ সমসাময়িকদের মত, তিনিও আবিষ্কার করলেন যে পারনাসদের দম্ভ মিথ্যা, তাঁদের কবিতার ঐশ্বর্যশালী ছন্দ ও তথাকথিত সার আকারের মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে অনুপস্থিত রয়ে গেছে সেই ব্রহ্মাস্ত্র যা' ফরাসী কবিতাকে একটি সম্পূর্ণতার শৃঙ্গে দাঁড় করাতে পারে। অতএব? রোম্যাণ্টিক বিপ্লব তো বহু আগেই পথ দেখিয়ে দিয়েছে; বলেছে যে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে প্রাচীন রীতি-নীতির কারাগার হতে—এগোনো যাক না তাই এখনো সে একই মুক্তিকামী ও মুক্তিদাতা পথ ধরে, ক্রমশই এক বৃহত্তর ও মহত্তর প্রাণচেতনার উদ্দেশে! এ ছাড়াও, ভেরলেনের কিছু আগেই ফরাসী কাব্যে ঘটে গেছে এক অভাবনীয়, অকল্পনীয় প্রচণ্ড বিপ্লবঃ বোদলেয়ারের আবির্ভাব। সেই বোদলেয়ার পাপের মধ্যে বেঁচেছেন সহজিয়া তান্ত্রিকদের মত, সাধকের উদ্দীপ্ত অভীপ্সায়, তিনি পাপকে ফুলে পরিণত করেছেন ও সুন্দরের মানসের মধ্যে পাপবোধকে ঢুকিয়ে তৈরী করেছেন একটি অভিনব সৌন্দর্যতত্ত্ব। শুধু তাই নয়, পরবর্তী প্রতীকবাদী কবিতার ভিত্তিস্থাপনও তিনি করে গেছেন "সংযোগ" সনেটটি লিখে। নির্বেদকেও তিনি দিয়েছেন আধ্যাত্মিক, অব্যক্তের রূপ।

তাই দেখি বাইশ বছর বয়সে প্রকাশিত ভেরলেনের প্রথম কবিতার বইটিতে এই দুটি বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ধারার ছাপঃ একটি প্রেরণা পেয়েছে বোদলেয়ার হতে, অন্যটি অনুগতের মত অনুসরণ করেছে পারনাসদের আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গী। বইটির নামকরণেই তো বোদলেয়ারের অবিসংবাদিত প্রভাব—"শনির কবিতা"। অন্যদিকে, সেই একই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতার মধ্য দিয়ে, কবি কখনো ছুটেছেন তথাকথিত "উদ্দীপ্তদের" বলি দিতে মিলো-র ভেনাসের পায়ে, ভেনাসের যে-প্রস্তর মূর্তিটি তখনকার দিনে হয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন শ্রম ও প্রতিজ্ঞার প্রতীক; কখনো বা কবি ল্যক্‌ত দ্য লিলের মত লিখতে বসেছেন একটি "হিন্দু কবিতা", ভাবটা যেন ইতিহাসের কোনো ঝকমকে পাতা হতে সদ্য তুলে আনা; কখনো বা তিনি ঘোষণা করছেন যুগের ব্যবহারিক, অনুসন্ধিৎসু চিত্ত-

ব্যক্তির প্রতি তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা। এর সব কিছুতেই প্রতিফলিত পারনাসদের বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য ও ভঙ্গী। তবে ঐ একই বই-এ আবার আরো অনেক কবিতা আছে যা' বলছে নির্বেদের কথা, কথা অন্তর্গ্লানির অথবা নামহীন বিষণ্ণতার, যাতে চিত্রিত হয়েছে পারী-র ধূসরতা কিম্বা কোনো প্রান্তরের বিধুরতা, যাতে আছে উগ্রকে, বিশ্রীকে আবাহন। ছন্দও বহুক্ষেত্রে যেন সংগীতের মৃদু মূর্ছনাকে ধরতে চায়। এই দ্বিতীয় ধরণের কবিতাগুলিতে বোদলেয়ারের প্রভাব অনস্বীকার্য, শুধু তাতে যা নেই তা' হচ্ছে বোদলেয়ারের অকৃত্রিম গাম্ভীর্য ও তাঁর গ্লানির চেতনার অতিরিক্ত তিক্ততার মাধুর্য। তুচ্ছের মধ্যে এখানে শুধু ভেরলেন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যে গ্লানি গুপ্ত, মন খারাপের—যেটি ভেরলেনের বিশিষ্ট সুর তাঁর অন্যান্য কাব্যেও। তিনি চেয়েছেন প্রকাশ করতে "কাব্যিক এক প্রেম, যে প্রেম ভাবুক, যে প্রেম আধুনিক তার অভীপ্সায় ও যার মাথায় বিষণ্ণতার মুকুট।"

এই ধারাতেই চলছিলেন ভেরলেন ও এগোচ্ছিল তাঁর কাব্য, যতদিন না তাঁর জীবনের মহত্তম ঘটনাটি দরজায় এসে ধাক্কা দিল অপ্রত্যাশিতভাবে। সেটি হচ্ছে তাঁর জীবনে কিশোর র‍্যাঁবোর আবির্ভাব, প্রথমে পাগল-করা পরম সখারূপে, পরে শত্রুর ছদ্মবেশে। এই ঘটনার কিছুকাল আগে হতেই ভেরলেন মেতেছেন মদের নেশায়, বেশ্যাবাড়ী যাওয়ায়, বহন করছেন ছন্নছাড়া জীবন। শৃংখলা নেই, ঈপ্সিত স্বাদটি অনুপস্থিত, কী যেন একটা অজানার আবেশ ও আগমনীতে ইতিমধ্যেই দুলছে মন। র‍্যাঁবো এলেন যথার্থ ডাকটি নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার। র‍্যাঁবোর এই আগমনে তাঁর জীবনটাই গেল পালটে, তা' যেন মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে গেল তার এতদিনের অতি পরিচিত, মরচে-পড়া পরিবেশের কেন্দ্র হতে। র‍্যাঁবো তা্কে করে তুলতে চাইলেন এক "নারকী প্রেমিক", তাঁকে জ্বালিয়ে দিতে চাইলেন এক অভাবনীয় আদর্শের বহ্নিতে, চাইলেন তাঁর কল্পনায় এক নতুন দৃশ্যের জগতকে সৃষ্টি করতে। তাঁকে র‍্যাঁবো করতে চাইলেন সর্ব অর্থে এক অতিমানব, তাঁর মননশক্তি ও চেতনার গণ্ডীটিকে নিজের শক্তিতে মুছে দিয়ে, তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর অতীত ও বর্তমান হতে।

পাগল হওয়া সোজা, কিন্তু ভেরলেন পারলেন না র‍্যাঁবোর ঐ আদর্শে উঠতে, এবং অচিরেই একদিন ব্রাসেলসে তাঁদের পরস্পরের হতাশা ও অন্তর্বিক্ষোভ এমন চরম মনোমালিন্যের রূপ ধরল যে "নারকী প্রেমিক" তাঁর দয়িতকে রিভলভারের গুলীতে আহত করলেন। আহত, ক্ষুব্ধ ও অন্তর্গ্লানিতে জর্জর র‍্যাঁবো চিরকালের জন্যে ছাড়লেন ভেরলেনকে, এবং

অল্পকাল পরে কাব্যজগতকেও বিদায় জানিয়ে দেশান্তরী হলেন সম্পূর্ণ এক নতুন জীবন আরম্ভ করতে চেয়ে।

এর পর ভেরলেনের জীবনটা পড়ে রইল, যে কটি বছর তিনি আরো বেঁচেছিলেন, এক ঝলসে-যাওয়া স্বপ্নের মত। র‍্যাঁবোর প্রভাব তাঁর কাব্য ও কাব্যদর্শনের উপর রয়ে গেল প্রচণ্ডই, তবু তাঁর ছিল না র‍্যাঁবোর মত আশ্চর্য ছবি সৃষ্টি করার ক্ষমতা। শুধু তাঁর কাব্যে ফুটল আরো তীব্র হয়ে আগের সেই বিচিত্র ধূসরতার আবেশ, এক নিরন্তর সঙ্গীতের মূর্ছনা ও বিষণ্ণতা, পাপের চেতনা, ও এক নামহীন বেদনা অব্যক্তের। তাঁর মত এমন করে বোধ হয় আর কোনো জীবনই কখনো চেষ্টা করে নি পরস্পর-বিরোধী বহু স্রোতকে মরিয়া হয়ে একাভিমুখী করতে। তাঁর শেষের দিকের কাব্য ক্রমশই হচ্ছিল, আত্মায় ও আকারে, প্রতীকবাদী কবিতার পূর্বসূরী, যদিও র‍্যাঁবোর প্রতিভার অতি বিলম্বিত খ্যাতি ছড়ানোর পর তিনি অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে যান।

ঐ পরস্পরবিরোধী স্রোতের প্রসঙ্গে আর ছিল তাঁর মাঝে-মাঝের চরম ক্যাথলিকতা, যা' যখন জেগেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বা কাব্যে, বৃথাই যুদ্ধ করতে চেয়েছে তাঁর স্বভাবগত দুর্নীতিপরায়ণতার সঙ্গে। বার বার এই যুদ্ধে জয় হয়েছে তাঁর মদের নেশার, উচ্ছৃংখলতার প্রতি তাঁর উৎকট প্রেমের। অবশ্য এক অর্থে সেই দুর্নীতিপরায়ণতাও কথার কথা মাত্র ও আপেক্ষিক। সাধারণ অর্থে আমরা যাকে পাপ বলি, তা' সাধনার অঙ্গীভূত হলে কতখানি আর পাপ থাকে জানি না।

কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, যা এখানে আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয়, ভেরলেন বিচ্ছিন্নভাবে অনেক বললেও তাঁর বিখ্যাত "কাব্যপ্রকাশ" বা *Art Poetique* গ্রন্থেই সেই ভাবগুলিকে তিনি প্রথম গুছিয়ে একত্র করলেন। প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল হলেও গ্রন্থটি লেখা হয় বহু আগে, প্রায় একই সময়ে যখন র‍্যাঁবো লিখেছিলেন তাঁর "দ্রষ্টার" চিঠি। র‍্যাঁবোর প্রতিভা ছিল অনেক বিরাটতর, তাই তিনি দেখেছিলেন ও দেখাতে চেয়েছিলেনও যে-আলো অতলান্ত গভীরের, এবং যে গভীরে ভেরলেন নিশ্চয়ই পারেন নি প্রবেশ করতে। তবু ভেরলেন উক্ত বইটিতে কিছু সার তত্ত্ব খাড়া করেছেন, যা' তার নিজের অধিকারে স্থান পেয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসে ও যাতে নিঃসংশয়ে ধ্বনিত আগামীর প্রতীকবাদীদের বহু বিশেষ প্রতিপাদ্য। কবিতা, ভেরলেন বললেন, শুধু এক চমৎকার কারুশিল্পই নয়, তা' শুধু আঙ্গিক শৃংখলা রক্ষা করে মুখর হওয়ার ক্ষমতারই প্রকাশ নয়, তা' যেন ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হয় তাকেও যা' কেবল আভাসের ও সূক্ষ্ম চেতনার,

যা' গুপ্ত। তা' যেন মানুষের অনিবার্য আন্তর গ্লানিকে, অশান্তিকে, দুরন্ত স্বপ্নকে ধরতে পারে। তা' যেন পাঠকের চিত্তে জাগাতে পারে সেই মধুর রিক্ততার অনুভবটি যা' আগে ছিল কবিরই ব্যক্তিগত সম্পদ। ভেরলেনের মাহাত্ম্য যদি কিছু থাকে তো তা' এইখানেইঃ তিনি নতুন পথের সাধনাকে নমস্কার করে গেলেন, তার কয়েকটি অতি আবশ্যক অঙ্গের সুস্পষ্ট ইংগিতও রেখে গেলেন।

স্তেফান মালার্মে বেঁচেছিলেন ১৮৪২ হতে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত। তিনি তাই ভেরলেনের সম্পূর্ণ সমসাময়িক—তবু চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যে কী বিরাট পার্থক্য তাঁদের দুজনের! কবি হিসেবেও মালার্মে এক সত্যকারের মহারথী, যদিও তিনি লিখেছেন খুবই সামান্য, তাঁর সব কটি উল্লেখযোগ্য কবিতাই ছোট আকারের, সংখ্যায় গোটা ষাটেকের বেশি নয়, যা যথেষ্ট একটি চটি বইয়ের পক্ষে। তাই দিয়েই তিনি মৃত্যুঞ্জয় এক স্বাক্ষর আঁকলেন ইতিহাসে। তবু যা' তাঁর সবচেয়ে বড় দান, তা' তাঁর বহু কথিত কাব্যিক দর্শন, যা' তার অভিনবত্বে যেমন মৌলিক, পরবর্তীদের প্রভাব করার ক্ষমতায় তেমনি প্রচণ্ড বলে প্রমাণিত।

ভেরলেনের মত প্রথম হতেই, যখন তিনি কবিতা ছাপাতে আরম্ভ করলেন ১৮৬০ নাগাদ, মালার্মের ওপর দুটি বিশিষ্ট ধারার ছাপ, একটি পারনাসদের, অন্যটি বোদলেয়ারের। শুধু, পারনাসদের প্রভাব প্রসঙ্গে, তিমি অগ্রজ ল্যকঁত দ্য লিলের পথ ধরলেন না, লিখলেন না এপিক-ধর্মী গাথা, "হিন্দু কবিতা", চিরাচরিত বিরাট দার্শনিক প্রতিপাদ্যে ভারাক্রান্ত করলেন না তাঁর বক্তব্য। উল্টে তিনি নিলেন তেওদর দ্য বাঁভিল-এর পথ, পারনাসদের পূজ্যপাদ অন্য এক অগ্রজ কবি, যিনি মালার্মেকে উদ্বুদ্ধ করলেন স্বাস্থ্যের সুখ ও বাঁচবার আনন্দে, সৃষ্টি করতে স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ছবি খেয়াল কল্পনার, প্রকাশ করতে ইন্দ্রিয়চেতনার সহজ খুশী ভাব। ওদিকে বোদলেয়ারের প্রভাব মালার্মেকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল একই সঙ্গে অতি বিপরীত স্রোতে, তাঁর মধ্যে জাগাতে জ্বলন্ত অনুভূতি রোগের, যন্ত্রণার, দুঃখের দারুণ সৌন্দর্যের, তাঁকে জাগাতে মরিয়ার তুরীয় অবস্থায়, সকল ইন্দ্রিয়ানুভবের এমন একটি সূক্ষ্ম সামগ্রিক চেতনায় যা' যেমন জটিল ও অবোধ্য, প্রকাশ পেতে চেয়েও তেমনি নাছোড়বান্দা। অবশ্য, বোদলেয়ারের প্রভাবটিই এখানে একেবারে গোড়া হতে গভীরতর—মালার্মের প্রথম দিকের কবিতাতেও বিষয় বহু ক্ষেত্রে সেই একইঃ উঠবার চেষ্টা একটি অসম্ভব আদর্শের উদ্দেশে; বেশ্যা, যে

দুঃখের কন্যা, আনন্দের নয়, পার্থিব পাপের বোঝা যার ঘাড়ে; যে ঘন চুলের কালো গন্ধে মত্ততা জাগে; যার আবাহন শয়তানের। লেখার বাহ্যিক ধরণেও, যেমন কখনো কখনো গদ্য কবিতায়, বোদলেয়ারের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

তবু বোদলেয়ার হতে তাঁর পার্থক্যও অতি পরিষ্কার, এবং তাও একেবারে গোড়া হতেই। মালার্মের প্রকাশ যেন আরো অনেক বেশি পূত, অনেক বেশি আদর্শবাদী, বিদ্ধ অনেক তীক্ষ্ণতর বুদ্ধির দীপ্তিতে। বোদলেয়ারের "পাপের ফুলে" তিনি বিশেষ করে যা দেখলেন ও যাতে অনুপ্রেরণা পেলেন তা' হচ্ছে এক নতুন ছবির জগত ও আভাসের এক বিচিত্র, গুপ্ত আবেশ। কিন্তু ছবির সৃষ্টিতে তিনি গেলেন না একেবারেই বোদলেয়ারের মত। তিনি তাঁর ছবিদের শাসন করলেন না, তাদের বাঁধতে চাইলেন না কোনো দৃঢ় শৃংখলায়, একই কবিতায় এক ছবি হতে আরেক ছবিতে যেন যথেচ্ছ লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আসলে ছবির প্রতি প্রেম ছিল তাঁর এত প্রচণ্ড যে সেই ছবির সৃজনে কোনো পরম্পরা রক্ষা করার বাধ্যবাধকতাতে তিনি নিজেকে বাঁধতে চান নি। কারণ ছবি যে প্রতীক মাত্র, সে শুধু নানারঙের জামাকাপড় পরে প্রতিনিধিত্ব করে বেড়ায় এক অন্য কিছুর। এবং সেই অন্য কিছুটি হচ্ছে "ভাব" বা "আইডিয়া", যে একমেবাদ্বিতীয় ও যে-ই একমাত্র পরম লক্ষ্য। ছবির কাজ তাই প্রতীকের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটিকে প্রকাশ করা তার চরম নগ্নতায়। ছবি যেন তার নিজের অন্তহীন মিছিলের মধ্য দিয়ে সেই তাকে দেখাতে পারে যা' গোপনে ব'সে আছে ও যা' সকল ছবির অতীত। এবং এই যাদু ঘটাতে পারে একমাত্র কবি তার যাদুকরী প্রতিভার শক্তিতে, যেন নিমেষের একটি সোনার কাঠির ছোঁওয়ায়, ও তার এক অন্যতর নির্মম নির্ভুল শৃংখলার অভিনিবেশে। কবি তাই ধরতে পারে যে কোনো ছবি যে কোনো প্রতীক; এমন কি দৈনন্দিনের যে কোনো তুচ্ছ ঘটনাও—যেমন, এক মেলাতে একটু বেড়িয়ে আসা, বা একটি অপ্রত্যাশিত দেখার আলোকে উদ্ভাসিত কোনো অপরিচিত নারীর মুখ, যাত্রার অন্তরালে দুয়েকটি দণ্ড কাটানো কোনো পান্থশালায় বা রেলস্টেশনে, অথবা কোনো নর্তকীর একটি মুহূর্তের উদ্ধত উরু, কিম্বা শূন্য কোনো ফুলদানি বা একটি হাত-পাখা, অথবা আগে-শোনা কোনো এক দুর্বোধ্য বাক্য যা' মাথায় কেবলি ঘুরে ঘুরে মরছে, ইত্যাদি ইত্যাদি—সকলই সার্থক বিষয় হতে পারে কবিতার, কিন্তু তা' হবে না কবিতার যথার্থ প্রতিপাদ্য।

মালার্মের এই ভাবধারণার সঙ্গে পরবর্তী প্রতীকবাদের সম্পর্কটি যে কত অন্তরঙ্গ, তা' বলাই বাহুল্য। এবং এর সঙ্গে ভারতীয় অলংকার

শাস্ত্রেরও একটি সদৃশ মিল যেন আছে কোথায়। হেগেলের দর্শনের সঙ্গে বিশেষ করে এর মিল আছে, যার দার্শনিক তত্ত্বকে ফ্রান্স তখন সবে গভীরভাবে জানতে আরম্ভ করেছে। হেগেলের প্রতিপাদ্য ছিল যে সত্তা বা "রিয়্যাল" ও কারণ বা "লজিকের" দুটি আপাত ভিন্ন স্তর এক হয়ে মেলে এক উন্নততর স্তরে যার নাম ভাব বা "আইডিয়া" এবং যা-ই একমাত্র সত্য। মালার্মেরও তপস্যা ছিল সেই শেষ ও পরম ভাবটিকে ধরার, তাকে প্রকাশ করার, নিজের মধ্যে জগতকে নতুন করে তৈরী করার ও তার যথার্থ সত্য রূপটিকে দেখানো প্রতীকের আলোছায়ার ঢাকনাটির স্তরটিকে ভেদ করে। অনেকটা যেন ঈশোপনিষদের হিরণ্ময় পাত্র ও তার দ্বারা আবৃত ও তাতে নিহিত সত্যের প্রসঙ্গ এইখানেও। লেখা মানেই, মালার্মে বললেন, জাগা—"সাদার ওপর সারি সারি কালো অক্ষর যেন কোন তমসাঙ্কিত ফিতায় গভীরের ভাঁজ, যা' ধরে রাখে অনন্তকে।" লেখা তাই এমন একটি প্রচেষ্টা যা' যে রহস্য আমাদের সকলকে ঢেকে রেখেছে, তাকে সে উত্তোলিত করে। মহাজীবনের অধিকারী যে মানুষ, যে মানুষ মহানগরীর, তার প্রয়োজন আছে এই প্রয়াসের।

বোদলেয়ারের মত মালার্মেও এক "সংযোগ" চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সংযোগের চেতনাটিকে তিনি ঠেলে নিয়ে গেছেন আরো ঊর্ধ্বে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তরাই প্রদেশ হতে শুদ্ধ বুদ্ধির তুঙ্গ শৃঙ্গে। কবিতার বাহ্যিক অবয়ব বা ভারতীয় আলংকারিক অর্থে যাকে রীতি বলা চলে, সেই বিষয়েও তাঁর অবদান সামান্য নয়, এবং তার রূপটিরও নির্দেশ তিনি দিয়েছেন অতি মুখর ও প্রাঞ্জল ইঙ্গিতে, কখনো তাঁর নিজের কবিতার মধ্য দিয়ে সরাসরি, কখনো বা বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে, কখনো আবার কাব্য সম্বন্ধে তাঁর লেখায়। তবে যেহেতু দেশভেদে রীতিভেদ হয়ে থাকে, তাঁর কবিতার আত্মাটিই বা সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যই বিদেশীদের পক্ষে আলোচ্য বিশেষ করে। কবিতার এই আত্মার দিকটারও বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে, বিশেষ করে তাঁর *Prose à des Esseintes* নামক বিখ্যাত নিবন্ধে। এ সবের অনেকখানিই বেশ দুর্বোধ্য, প্রায় অবোধ্যও, যেমন বহুলাংশে তাঁর সমস্ত কবিতাও। তবু চেষ্টা করলে সর্বত্রই একটি প্রধান সরল রেখার অগ্রগতি ধরতে পারা যাবেই।

শেষ পর্যন্ত, মালার্মে নিজেকে ততটা কবি বলে মেনে নিতে চাননি, যতটা তিনি হতে চেয়েছিলেন কাব্য-দার্শনিক। সংগীতের প্রতি, বিশেষ করে ভাগনারের সংগীতের প্রতি, তাঁর প্রীতি ছিল প্রচণ্ড। শেষ জীবনে তো লেখা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে সংগীত রচনাতেই মন দেবেন স্থির করে-

ছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন যে অক্ষর বা অক্ষরে বিধৃত ছবির যে প্রতীক তা' নিম্নস্তরের, তাই চেয়েছিলেন সংগীতের নগ্নতর, শুদ্ধতর প্রতীকের ব্যঞ্জনায় "ভাবটির" আরো কাছে এগিয়ে যেতে। সারাজীবন ক্ষুরধার বুদ্ধির এই সাধনায় তাঁর কবিতাকে হতে হয়েছে অনিবার্যভাবে দুর্বোধ্য, তা প্রাণপণ প্রয়াস ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই পারেনি সেই এক ও গুপ্তের অদ্বিতীয়কে, শুধু তার মুখে অজস্র চিহ্ন অমানুষিক এক আকাঙ্ক্ষার, অলৌকিক এক হতাশার। ব্যক্তিগত জীবনেও মালার্মে যেন পাগল হতে চলেছিলেন ধীরে ধীরে।

এই শুদ্ধ বুদ্ধির সাধনায়, সেই অলৌকিক, ঐশ ভাবটিকে ধরতে চেয়ে, মালার্মে একটি শৃংখলার তত্ত্বকেও খাড়া করেছিলেন যা' আর মানতে চাইল না তথাকথিত অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্যকে। অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের অনুপ্রেরণায় নয়, "তা" মিলবেই মিলবে নিশ্চল নির্ভুল সাধনায়। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তিঃ "যে মানুষ চিন্তাশীল সাধক, সে নির্বাসিত কখনো নয় সে অসম্ভব সুযোগের সম্ভাবনা হতে।" মালার্মের আগেও, কবিতায় অনুপ্রেরণার মূল্যটি কতটুকু বা কতখানি বা তার কোনো মূল্য একেবারেই আছে কিনা, তাই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। অনেকেই হতে চেয়েছেন সাধক, অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্যের ভিখারী নয়। এমন কি বোদলেয়ারকেও বলতে শোনা গেছেঃ "পারা কি যায় না যে কোনো মানুষকে দিয়ে লেখাতে, মাত্র বিশটি সন্ধ্যার শিক্ষায়, একটি নাটক যা' অন্য কোনো নাটক হ'তে কোনোদিক দিয়ে বেশি হাস্যকর হবে না, অথবা তাকে দিয়ে লেখাতে যে কোনো দৈর্ঘ্যের একটি কবিতা যা' কিছু কম স্বাদহীন হবে না অন্য যে কোনো আজো অপঠিত এপিকের চেয়ে? বিশেষ ক'রে সেই শিক্ষায় যদি তাকে আমি দিতে পারি আমার তত্ত্ব-দৃষ্টি ও বিজ্ঞান?"

মালার্মের সেই শুদ্ধ বুদ্ধির সাধনার ধারাটি আজো নেমে এসেছে কাব্যে ও শিল্পে। অনেকগুলির মধ্য হতে আমি বেছে নিলাম আজো জীবিত* ও ফ্রান্সের এক অতি মাননীয় শিল্পী ব্রাকের এই উক্তিটিঃ "চিত্রের বিষয় কখনোই তা' নয় যা' আপাতভাবে তা' দেখাতে চাইছে— তার প্রকৃত বক্তব্য একটি নতুন ঐক্য, একটি গীতিমুখর গতির বিকশিত চেতনা, যা' সম্ভব হয় একমাত্র শৃংখলার সাধনার দ্বারা। আমি তাই যা' চাই তা' নিয়ম ও শৃংখলা, যা' আবেগকে ধরে রাখে ও তাকে বাঁধে।"

* এই প্রবন্ধ যখন প্রথম প্রকাশ হয়, তখন ব্রাক জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৬৩ সালে।

ভেরলেন ও মালার্মে দুজনেই বিদ্রোহ করেছিলেন তৎকালীন চিরা-চরিতের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত দুটি বিভিন্ন পথে। র‍্যাঁবোর বিদ্রোহ আবার ধরল আরো একটি পথ, সে বিদ্রোহ এমন একটি রূপের ও এত প্রচন্ড একটি আন্তরিকতার যে তার তুলনা কোনো সাহিত্যে নেই। কবি হিসেবে ভেরলেন ছিলেন গৌণ, আমি তো বলব নিতান্তই গৌণ, ও মালার্মের কবিতা অতি উচ্চ স্তরের হলেও তিনি মূলত হতে চেয়ে-ছিলেন কাব্য-দার্শনিক। র‍্যাঁবো জগতের এক মহত্তম কবি, এবং তা-ই তাঁর প্রধান পরিচয়। এবং তাঁর জীবনেরও আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য দিকটা আছে, যা' তাঁর কাব্যকে আরো মহিমামন্ডিত করেছে। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন তৎকালীন সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও চিন্তাধারায় সকল গৃহীত সত্যের বিরুদ্ধে, তাঁর দুয়েকজন স্বনামধন্য পূর্বসূরীর মতই প্রাণপণে তৈরী করতে চেয়ে একটি নতুন জগত, নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে। প্রথম হতেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন জীবনে সেই বস্তুটাই অনুপস্থিত রয়ে গেছে যা' অর্থ দেয়, সঙ্গতি ও সুষমা দেয় জীবনকে। বুঝেছিলেন "আমাতে" "আমি" নেই, "আমি" একটা স্বতন্ত্র জিনিস যাকে কবিরা চিনে উঠতে পারেনি—চেয়েছিলেন "দ্রষ্টা" হতে, দৃষ্টি দিতে। মালার্মের মত তিনিও জাগতে চেয়েছিলেন যাদুকরী শক্তির চেতনায়, কিন্তু বেশ একটু অন্যভাবে। মালার্মের "ভাব" ও শব্দ বুদ্ধি হতে র‍্যাঁবোর সাধনার পার্থক্য অনেক। তাঁর আসা ও চ'লে যাওয়া ফরাসী কাব্যে ঘটল যেন উল্কার মত—একথা মালার্মেই বলেছিলেন। এ ছাড়া, অন্য অনেকে র‍্যাঁবোকে আখ্যা দিতে চেয়েছেন দানবের, বা দেবদূতের, বা মাত্র মর-জগতের একজন মানুষের। কেউ কেউ এই তিনটি আখ্যা একেবারে একই সঙ্গে দিয়েছেন, যা' প্রমাণ করে র‍্যাঁবো সম্বন্ধে প্রহেলিকার প্রচন্ডতা।

র‍্যাঁবোকে নিয়ে বাংলাদেশে বহু বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে, আমি নিজেও দুয়েকবার তাঁর সম্বন্ধে বলবার চেষ্টা করেছি। এখানে তাই মাত্র একটি-দুটি প্রয়োজনীয় কথা তাঁর সম্বন্ধে বলছি ভেরলেন ও মালার্মের আলোচনার সূত্র ধরে, কারণ ভেরলেন-মালার্মে-র‍্যাঁবো, এ'রা তিনজন ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতার ত্রিমূর্ত্তি বলে পূজিত।

বয়সে মালার্মে হতে বারো বছরের এবং ভেরলেন হতে দশ বছরের ছোট ছিলেন র‍্যাঁবো, ও তিনি মারা যান এই দুই অগ্রজ হতেই বেশ কিছু আগে। তা ছাড়া, যা' লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সীমা মাত্র প্রথম কুড়ি-একুশ বছরের মধ্যে বিধৃত। এরি মধ্যেই জ্বালিয়ে যেতে পারলেন এমন একটি আগুন যার নতুন নতুন বহ্নিশিখা আজো জাগছে

দেশ-দেশান্তরে। এ ছিল তাঁর অন্তর্জাত বোধির আগুন, মালার্মের ক্ষুরধার শুদ্ধ বুদ্ধির আগুন নয়। তাঁর অসন্তোষ ও ঘৃণা, প্রথমে নিজের পরিবেশের প্রতি, পরে তৎকালীন কাব্যের প্রতি, ও আরো পরে সকল সাহিত্যের ও এমন কি নিজেরও প্রতি, ক্রমবর্ধমান আয়তনে অচিরেই এমন পৈশাচিক আকার নিল যে ঠিক যে সময়টিতে মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো পেতে চলেছিলেন সেই পরম দরজার সত্য চাবিটি, তিনি ছিটকে বেরিয়ে গেলেন কাব্য-সাধনার অন্তর হতে, আত্ম-বিলুপ্তির শেষ মন্ত্রটি পূজারীর সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করে দেশান্তরী হলেন এক সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবন যাপন করতে। কিন্তু তার একটু আগেই, পরবর্তীর সমস্ত রসপিপাসুদের কথা স্মরণ করে' যেন, হাত দিয়েছিলেন একটি নতুন পরীক্ষায়। র‍্যাঁবো সেই পরীক্ষায় যেন ধরতে চেয়েছিলেন অব্যক্তকে হাতের মুঠোয়, তাকে নিজের যাদুকরী শক্তিতে প্রকাশ করতে প্রলুব্ধ হয়েছিছেন। তাই তিনি চাইলেন একটি নতুন শব্দের রসায়ন, সৃষ্টি করতে নতুন ভাষা, পেতে নতুন করে দেখার ক্ষমতা। তাঁর "দ্রষ্টার" চিঠিতে বললেন, "কবিকে এবার 'দ্রষ্টা' হতে হবে, ও সে তা হতে পারবে একমাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির এক দীর্ঘ, প্রচণ্ড ও বুদ্ধির বিপরীত উজানযাত্রায়।" তিনি ভাবলেন, জীবনকে একেবারে উল্টে দেবার রহস্যটিকে যেন তিনি ধরতে পেরেছেন।

জন্ম মফস্বল সহরে—প্রথম হতেই কৃতী ছাত্র ও কবিতা রচনায় অসম্ভব প্রতিভাশালী। ছোট সহরের তুচ্ছতা, অর্থহীনতা, মর্মন্তুদ নির্বেদ ও বিষণ্ণতাকে যেন তীরবিদ্ধ মৃত শিকারের মত ফেলে দিয়ে ছুটলেন তিনি পারীতে সেই "নতুন জীবনের" অনুসন্ধানে। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চুল, সহজিয়া এক ভবঘুরের ভাব, চোখ দিয়ে যেন আগুনের জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। এই রূপেই ভেরলেন র‍্যাঁবোকে প্রথম দেখেন, পারী-কম্যুনের যুগে।

কিন্তু র‍্যাঁবোর সেই আগুন হাজার সাধনা করেও পেল না শান্তি, জমা করল শুধু মরিয়া এক নৈরাশ্য। সেই নৈরাশ্যের মধুর ও বহিশ্চেতনার স্বাক্ষর তাঁর সমস্ত কাব্যে—কী "মাতাল তরণীতে", কী অনবদ্য "স্বরবর্ণ" সনেটটিতে, কী "নরকে এক ঋতুতে", কী "দীপাবলীতে।" আশ্চর্য ছবির জগত এই, ও এ এক আশ্চর্য সাধনার জবানবন্দী।

এক জায়গায় লিখছেন র‍্যাঁবো "নরকে এক ঋতু"তেঃ "আবার আমি। আমার মূর্খতার আরো একটি কাহিনী। বহুদিনের গর্ব আমার, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত নিসর্গ শোভার ওপরই আছে আমার দখল—আধুনিক কাব্য ও চিত্রকলার গগনস্পর্শী খ্যাতির আড়ালে জেনেছি তার চূড়ান্ত

অসারতা।...বার করেছি স্বরবর্ণের রঙ—আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ই রক্ত, ও নীল, উ সবুজ—নিরূপণ করেছি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতি-প্রকৃতি। আর সহজাত প্রেরণার ছন্দেই আজ আবার লালায়িত হয়েছি কাব্যিক এমন একটি সুগম শব্দ আবিষ্কার করতে যা' একদিন না একদিন প্রযোজ্য হতে পারবে সমস্ত অর্থে। এই আমি অনুবাদের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করে রাখলাম। প্রথমে সে ছিল শুধু সমীক্ষণ। রূপ দিয়েছি মৌনকে, বাণী দিয়েছি রাত্রিকে, লিখে গেছি অনির্বচনীয়কে—স্থৈর্যে বেঁধেছি চিরচঞ্চল ঘূর্ণিকে।...আমার শব্দের এই রসায়নে কাব্যের যত পুরানো ভাঙগাচোরা জিনিসের ভূমিকা। নিজেকে সইয়ে নিয়েছি সরল মতিভ্রমে—সত্যি, দেখেছি আমি কারখানার জায়গায় মসজিদ, দেবদূতের পরিচালনায় যন্ত্র-সংগীতের বিদ্যালয়, আকাশপথে শকটের মিছিল, হ্রদের গভীরে বৈঠকখানা; কত যে দৈত্য, কত রহস্য। কী এক প্রহসনের নাম চোখে আমার বিভীষিকা ঘনিয়ে তুলেছে। এ ছাড়া শব্দের ছায়াবাজিতে বুঝিয়েছি কুহকের যত কূটতর্ক। অবশেষে আমার চেতনায় এই বিশৃংখলার মধ্যে খুঁজে পেলাম পবিত্রকে। তৃষ্ণায় ছটফট করেছি, আক্রান্ত হয়েছি প্রবল জ্বরে—ঈর্ষা করেছি পশুর সুখ, শুঁয়োপোকার নিরপরাধ বিস্মৃতি লোক, গন্ধমূষিকের কৌমার্যময় তন্দ্রা। তিক্ততায় ছেয়ে গেল আমার চরিত্র—কয়েকটা গাথার মত কবিতায় পৃথিবীকে বিদায় জানালাম।...অপূর্ব এক আজগুবি গীতিনাট্য হয়ে বসেছি।"

এ শুধু ছবির জগতই নয়, অপ্রকাশ্য এক নৈরাশ্যের মর্মবাণীই নয়, এ এক আলাদা অনুভবের জগত যা' র‍্যাঁবো তৎকালীন ও পরবর্তী কবিতায় সঞ্চারিত করলেন। "নরকে এক ঋতু" শুধু কবিতাই নয়, একদিক দিয়ে কবির জীবন-বাণীও। এ ছাড়াও, কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সরাসরি তিনি বলেছেন "দ্রষ্টার" চিঠিতে ১৮৭১ সালে, যে চিঠির আলোচনায় আগামীর কবিতা কম প্রেরণা পায় নি।

"আজ জানি কী করে সুন্দরকে নমস্কার করতে হয়"—একথা বললেও র‍্যাঁবো জানতেন তাঁর দম্ভ মিথ্যা; তিনি জানতেনঃ পাওয়া গেল না। তাই, শুধু এই আশা রেখেই তিনি চিরবিদায় নিলেন কবিতা হতেঃ "ভোরবেলা ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে আমরা পেঁছোব আশ্চর্য নগরীতে।"

এই আশা, এক অর্থে, চিরকালের কবিতার, যে কবিতা আজকেরও, আমাদেরও। গত শতাব্দীর শেষার্ধের এই তিনজন কবি নানাভাবে পাথেয় যুগিয়েছেন পরবর্তী কবিতার যাত্রায়। তাঁদের বার বার আলোচনার

তাই একটি বিশেষ সংগতি আছে আজকের কাব্যিক পরিস্থিতিতে, ও বাংলাদেশেও। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাঁদের সব কথা আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি নি—শুধু যা' দেখাতে চেয়েছি, তা' তাঁদের সাধনার কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ। তাঁদের কবিতা বা ছবির জগতের চেতনায় আমরা বৃথাই উদ্বুদ্ধ হতে চেষ্টা করব আজ, যদি না একই সঙ্গে বুঝতে চাই পিছনের সেই আজীবন সাধনাটিকে, যদি না নমস্কার করতে পারি তাকে।

৪

স্তেফান মালার্মে ঃ ভালেরির ও আমাদের চোখে

স্তেফান মালার্মে-র আজীবন সাধনার মধ্যে দেখি এমন এক বিরুদ্ধ আহ্বান, এমন একটি উজান স্রোতের গগনস্পর্শী ধ্বনি, একটি আবাহন বিপরীত যাত্রার, যে তাঁর কাব্যের ও বিশেষ ক'রে তাঁর কাব্যদর্শনের সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শ আসে যেন সংঘাতের মত। সেই সংঘাতে যে চেতনা সর্ব-প্রধান ও জাগে নির্বিশেষে রসিক পাঠকের হৃদয়ে, তা' এক নামহীন সংজ্ঞাহীন অভিভূতির। অবশ্যই, একটি ইংগিত প্রচ্ছন্ন এই উক্তিটিতেঃ কবির কবিতা ও কাব্যদর্শন অন্তত এক্ষেত্রে একাত্ম। ও তা' কিছু কম প্রচণ্ড প্রতিপাদ্য নয়। সেই প্রতিপাদ্যের প্রমাণ অথবা খণ্ডনে গত অর্ধ শতাব্দী ধ'রে যে বিতর্ক চলেছে তা' আজো অমীমাংসিত, ও তাতে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন একদিকে মালার্মে-প্রেমিকরা, অন্যদিকে তাঁর নিন্দুকরা, ও মধ্যিখানে 'নিরপেক্ষ' সত্যানুসন্ধিৎসু সমালোচকের দল। কিন্তু কবিতার উদ্দেশ্য যেহেতু নয় কোন যুক্তি বা তথ্যের প্রমাণ অথবা খণ্ডন, যেহেতু সে তার স্বভাবজাত আলোকবর্ষী চেতনার রূপায়ণে স্বপ্রকাশ, তা' সকল প্রশংসা-নিন্দার গণ্ডীর বাইরে। তাই একদিকে চিরকালের কবিতার আত্মা এক পারমার্থিক অর্থে যেমন হয়েছে মুক্তিকামী, অন্যদিকে এক ব্যবহারিক অর্থে তেমনি সে তার কবির কাছে নিরন্তর জেগেছে মুক্তি-দাতা হ'য়ে—বহির্জগতের প্রতি যে সহজাত ঔদাসীন্যে সে বৈরাগী, তা তার কবিকেও করেছে উদাস। মালার্মেও তাই ভুলতে পারেন—এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তা' শুধু তিনি ভোলেনই নি, তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করেন নি—তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কী বলল তাঁর নিন্দুকরা বা প্রেমিকরা। আর সেই পরবর্তী কাল মৃত্যুর পরের, তার অন্তহীন কথা ও বাগবিতণ্ডা—কী দরকার তা' নিয়ে মাথা ঘামানোর?

কিন্তু ঐ বাইরের জগতটাও আছে। ফুলের সার্থকতা দর্শকের চোখে। এবং যদিও সেই পাঠকদের মতামতের জগতটা আপেক্ষিক, তাও বিরাজ-মান। কবির ক্ষমতা নেই তাকে অস্বীকার করার। কারণ সমস্ত শিল্প-সাধনার একটি অন্যতম গোপন লক্ষ্যই এইঃ যা' আমার, তাকে তোমার ক'রে তোলা। একদিকে নির্মমভাবে স্বাক্ষরিত হয়েও অন্যদিকে শেষ পরীক্ষায় তাই সমস্ত আর্ট, সমস্ত কবিতা অসহায় ভাবে সর্বজনীন। এবং এ বিষয়ের মাহাত্ম্যটি ঠিক এইখানেই।

তাই মালার্মের প্রসঙ্গে বলছিলাম এই আমাদের কথা, তাঁর পাঠকদের কথা, যুগের ও যুগান্তরের, গতকালের ও আজকের। মালার্মের কবিতার যে সংস্পর্শটি আসে সহৃদয় পাঠকদের চিত্তে সংঘাতের মত, তার স্বরূপটির যে বৈশিষ্ট্য, তা সীমাবদ্ধ নয় আমাদের মত পরদেশীদের কাছেই শুধু—বিশেষ ক'রে আমরা যারা ভারতে প্রবুদ্ধ হয়েছি এক ভিন্নতর ও অতীব সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ অলংকারশাস্ত্রদর্শনের দ্বারা—মালার্মের বক্তব্যের সেই নিহিতার্থটি তাঁর দেশের ঐতিহ্যের উজানেও গিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্যটির আলোচনায় বার বার আসতে হবে তাঁর সেই কাব্য-দর্শনের প্রসঙ্গে, ও ততটা হয়তো তাঁর কবিতায় নয়। এবং তাঁর কবিতা ও কাব্যদর্শনের একাত্মতা নিয়ে যে বিতর্কটি, যা' যদিও বিরাট, ও যদিও যার আলোচনার বহুল সার্থকতা আছে—তার প্রসঙ্গ এখানে হবে অবান্তর।

পল ভালেরি, যিনি মালার্মের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও নিজগুণে ফরাসী কাব্য জগতের এক অন্যতম ভাস্বর সূর্য, তাঁকে আমার প্রসঙ্গে আনছি এই বিশ্বাসে যে মালার্মের বৈশিষ্ট্যের ভালোর দিকটি ভালেরি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন শ্রদ্ধার অন্তর্ভেদী রশ্মিতে, এবং মালার্মেকে ভালেরির চোখে দেখা যতটা শ্রেয় ও সার্থক, ততটা বাঞ্ছিত হয়তো নয় তাঁকে তাঁর নিন্দুকদের চোখে দেখা। কারণ ভালেরি শুধু মালার্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর অভিজ্ঞ বিশ্লেষণ শক্তিতে সেই শ্রদ্ধার কারণটি তিনি অনুসন্ধান করেছেন। এক ঝকঝকে মন, যেমন মালার্মের, তেমনি শিষ্য ভালেরির, তা' শুদ্ধ, বুদ্ধির তীব্র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, প্রবুদ্ধ মরিয়া এক শৃংখলার অনুশীলনে। তবু, ভালেরি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বার বার, সেই মনের যে স্বচ্ছতা তা' কাঁচের স্বচ্ছতা নয়, বোধগম্য বা অব্যর্থভাবে ভেদ্য যে কোনো দর্শকের চোখেই নয়—বরং তা' সম্পূর্ণভাবে অভেদ্য তার কাছে যে সেই প্রাণপণ শৃংখলার সাধনার ইংগিতটি তার মধ্যে ধরতে পারে নি বা তাকে যে ধরতে চাইল না, হয় তার সহজাত আলস্যের কারুণ্যে, নয়তো সেই অতি খ্যাত ঐতিহ্যের শরণাগত হ'য়ে, যে ঐতিহ্য এতদিন জোর গলায় জানিয়ে এসেছে কবিতাকে খেয়াল খুশী অথবা অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্যের স্বর্গীয় সন্তান বলে। দুরূহ কবি বলে মালার্মের যে ঐতিহাসিক খ্যাতি বা কুখ্যাতি, তার কারণ অনেকটা এই।

এই রকম শৃংখলার প্রাণান্ত সাধনায় মালার্মে-প্রমুখ যে সব লেখকরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বা হতে পারবেন ভবিষ্যতে, তাঁদের সম্বন্ধে লিখতে

গিয়ে ভালেরি বলছেন এক জায়গায়ঃ 'লোকে পড়লও না, বুঝলও না? কী ভুলের শপথ পাঠকরা নিলেন সেই মহাত্মাদের প্রতি।' আসলে এই-মাত্র যে ঝকঝকে মনের কথা বললাম, তার স্বচ্ছতা কাঁচের মত না হলেও সে ঘষা কাঁচ নয়। সে বোধ্য, ও ভেদ্যও। তবে তার জন্যে দরকার সাধনার, অনুশীলনের। এই কবিদের এই দাবী তাঁদের পাঠকদের কাছে। সেই স্বচ্ছতা এক মানস সরোবরের, যা অবস্থিত হিমালয়ের তুঙ্গ সমতলে, ও যাতে পোঁছোতে গেলে পেরোতে হবে আগে অনেক দুর্গম পথ— চিত্তকে হ'তে হবে ঊর্ধ্বপথে ধাবমান, তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে বহু আরোহণের ক্লান্তি। কবিতাকে এই রকম চরমভাবে মাত্র কবিরই আরব্ধ এক জয় ক'রে মালার্মে কাব্যসাধনাকে মণ্ডিত করলেন এক এতদিনের অভাবনীয় ঐতিহাসিক মর্যাদায় ও এই জয়ের মধ্যে ঘোষিত হ'ল এক নতুন ধরনের মানবতাও। কারণ মানুষ বা কবি, তার সৃষ্টিতে এই প্রথম এমন একটি কূল ছাপানো প্রাধান্য পেল যা আগের ঐতিহ্য-দর্শন তাকে দিতে চায় নি। মালার্মের প্রসঙ্গে ভালেরির প্রধান বক্তব্যটি হ'ল এই।

শুধু মালার্মের লেখার মধ্য দিয়েই নয়, ভালেরি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর সাহচর্য, সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব। এ গৌরবটিকে তিনি হৃদয়ে এত যত্নে পোষণ করেছিলেন সারা জীবন যে মালার্মের মৃত্যুর বহু পরেও ভালেরির স্মৃতিকথায় বারবার এর উচ্ছ্বসিত উল্লেখ পাওয়া যায়। নির্জন আকাশবিহারী এক চিত্ত ছিল মালার্মের, মুখ তিনি সহজে খুলতেন না—বিশেষ ক'রে তাঁর কাব্য নিয়ে তৎকালীন ফ্রান্সে যে ঝড় বয়েছিল, তা তাঁকে নিজের গণ্ডী ও নীরবতার মধ্যে যেন আরো জোর ক'রে গুটিয়ে বসতে বাধ্য করে। তা' যেন তাঁকে করে তোলে ক্রমশই আরো নির্বিকার, আরো নিশ্চল, আরো অটুট আপন নির্দিষ্ট যাত্রার প্রতিজ্ঞায়। তা সত্ত্বেও, তাঁর জীবনকালেই ধীরে ধীরে বেশ একটি ভক্ত গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁর—শোনা যায় তাঁর বাড়ীতে সেই ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নিয়মিত আলাপে তিনি প্রায়ই নিজেকে মুক্ত করতেন, তাঁর লেখা বা বক্তব্য সম্বন্ধে স্বেচ্ছাকৃত দুঃসহ নীরবতা হ'তে এই ধরনের কথোপ-কথন বা আলাপে তিনি নাকি মুখরও হতেন। এত পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল ও যথাযথ ঠেকত তাঁর বক্তব্য যে অনেকে মনে করেছেন পরে, এই কথোপ-কথনের মধ্যে ধৃত ও প্রকাশিত যে প্রাঞ্জলতা তাঁর, তা' দুর্লভ হয়তো তাঁর লেখাতে।

যেমনি খানিকটা আজো, মালার্মের সেই ভক্তবৃন্দের সংখ্যা তখন ছিল মুষ্টিমেয়। কিন্তু তাঁদের সকলের মধ্য থেকেও আবার ভালেরিকে তিনি

বেছে নিয়েছিলেন যেন বিশেষ করে, ও তাঁদের পরিচয়ের একেবারে প্রায় গোড়া হ'তেই। ভালেরি যেমন ক'রে পেয়েছিলেন মালার্মের নির্জন বহুমূল্য মুহূর্তের সান্নিধ্য, তা' মালার্মের অন্য কোনো ভক্তের ভাগ্যে ঘটেনি। এই ধরনের একক ও একাকী আলাপে প্রায়ই শিষ্য গুরুকে বলেছেন মর্মাহত হ'য়ে : 'একদল আপনার নিন্দা করে, অন্যেরা বিদ্রূপে মাতে আপনাকে নিয়ে। আপনি তাদের বিচলিত করেন, কখনো করুণা হয় আপনার কথা ভেবে তাই। আর সাংবাদিকরা যখন আপনার দৌলতে মজায় মাতে, আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, কী-ই বা করতে পারেন আপনার বন্ধুবান্ধবেরা? তাঁরা বড় জোর দুঃখে ও সহানুভূতিতে মাথা নাড়ান। কিন্তু আপনি কখনো কি জেনেছেন এই কথাটি, কখনো কি এই সত্যটি অনুভব করেছেন : ফ্রান্সের প্রতিটি সহরে অন্তত একটি করে যুবক গোপনে জাগছে যে আপনার কারণে ও আপনার কবিতার কারণে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, প্রস্তুত ছুরিকাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে মরতেও? আপনাকে সে জেনেছে তার গৌরব বলে, তার রহস্য বলে, তার পাপ বলে। সে নিজেকে গুটিয়ে বসেছে সব কিছু হ'তে আপনার রচনার প্রতি এক নীরন্ধ্র পূর্ণ প্রেমে, একটি দৃঢ় প্রত্যয়ে—সেই যে রচনা আপনার এত দুর্লভ যার কথা প্রায় শোনাই যায় না ও যার পক্ষ নেওয়া কিছু কম শক্ত ব্যাপার নয়...।'

বলা বাহুল্য, এই গোপনে-জাগা যুবকদের অন্যতম ছিলেন ভালেরি নিজেই। সাক্ষাতে তিনি এই ধরনের অনেক কথাই মালার্মেকে বলেছিলেন। উৎসাহ দেওয়ার এই রকমের যে প্রচ্ছন্ন আভাস এই উক্তিগুলির মধ্যে, তার পিছনে ছিল ভালেরির একটি নিতান্ত স্বাভাবিক মানুষিক দুর্বলতা : যাঁকে তিনি এত শ্রদ্ধা করেন, যাঁর মধ্যে তিনি এত পেয়েছেন ব'লে মনে করেন, তাঁকে সমকালীন মূঢ়তা আবিষ্কার করতে পারল না, ও সেই কারণে ভালেরির দুঃসহ দুঃখ ও গ্লানি। বিশেষ করে ভালেরির ক্ষেত্রে এই শ্রদ্ধা নিয়েছিল এমন এক সর্বব্যাপী আত্মব্যাপী রূপ যে নিজের গোপন কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন মালার্মের কথা, মালার্মে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মেতেছেন আত্মানুশীলনের বিশ্লেষণে। যেন দুটি বস্তু ভিন্ন নয়, নয় দুজন কবি, যেন এই দুটি একেবারে এক। তাঁর হৃদয়ে মালার্মেকে তিনি দেখেছেন সর্বশক্তিমান, তাঁর চিন্তায় সর্বদা বর্তমান।

অবশ্য এই ধরনের উৎসাহ পাওয়ার জন্যে কতখানি মালার্মে লালায়িত ছিলেন, তা' বলা মুস্কিল। ভালেরি বলেছেন অন্যত্র, একবার তিনি

মালার্মেকে জানান যে মালার্মেকে তাঁর মনে হয় মহান মনীষীর মত—কিন্তু এ জানানোর পর যা তিনি নিজে জানেননি বা বুঝতে পারেন নি বলে পরে স্বীকার করেছেন, তা হচ্ছে: এই উক্তিটির মধ্যে মালার্মে কোনো প্রশংসাসূচক ধ্বনির ইংগিত পেয়েছিলেন কি না, ও তা যদিই বা তিনি পেয়ে থাকেন তো তাকে তাঁর মনোমত বা রুচির অনুযায়ী ঠেকেছিল কিনা। এবং যেহেতু মালার্মে চুপ করেই থাকতেন এই উক্তির বা এই ধরনের অন্যান্য উক্তির পরে সব সময়ই, ভালেরি ধরে নিয়েছিলেন যে এ এক বিশেষ মন-মক্ষিকা, এই মালার্মের, এ যে মধু খুঁজে মরছে, তা' নিজেরি অন্তরের।

এই গদগদ শ্রদ্ধার খানিকটা চিরাচরিত প্রশস্তিতে যা' হারিয়ে যাওয়ার আশংকা আছে, তা হচ্ছে এই যে এখানে কল্পিত নয় কোনো উদ্বেলিত আবেগের অর্ঘ্য একটি চিত্তের উদ্দেশে আরেকটির। তাঁর নিজের জীবনে, লেখায় ও আচরণে, আবেগ থেকে মুক্তি পাওয়ার দুর্দম আহ্বানে শুধু সাড়াই দেন নি ভালেরি, তিনি সকল আবেগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপকে নিজের অধিকারে এনে তাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন, আবেগের তথাকথিত পূজারী ও দাসদের নেহাত্ই 'লৌকিক' আখ্যা দিয়ে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের রাজ্য হ'তে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের সৃষ্টি সাধনার প্রতিটি প্রয়াসে ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হয়েছে এক সম্পূর্ণ স্বকরতলগত ক্ষুরধার বুদ্ধির চেতনা। তাই এখানে প্রশ্ন করা হয়তো সমীচীন হবে: একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ হেন ব্যক্তির রীতির এই প্রস্ফুট ব্যতিক্রম কেন?

আমার মনে হয়, এক্ষেত্রেও ঐ এক মানুষিক দুর্বলতা ভালেরির, ও যা স্বাভাবিক। তবে এখানের এই বিশেষ দুর্বলতা স্বাভাবিক ও মানুষিক বেশ একটু ভিন্ন অর্থে। ভালেরির কিছু আগে হ'তে ফ্রান্সের সাহিত্যক্ষেত্রে এত রকমের পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল—এত রকমের প্রাণান্ত ও আন্তরিক উদ্যম যে যার নিজের কথাটি অন্যের কানে কোনোক্রমে পেঁৗছে দিতে চেয়ে—যে সাহিত্য ও বিশেষত কাব্য সম্বন্ধে 'সাধনা' কথাটার ক্রমাগত উল্লেখ যেন মূল্যহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধীরে ধীরে। সবাই সাধক, সবাই চলেছে সম্পূর্ণতার মন্দিরে, এবং সকলেরি পথ হাতড়ানো একই অন্ধকারে, রাত্রির জঙ্গলে। তবু প্রতিটি যাত্রীরই এই দৃঢ় প্রত্যয় যে তার পথটাই মন্দিরের পথ, তার হাতড়ানোটাই হবে শেষ নিরীক্ষণে জয়যুক্ত। কিন্তু এর, তার বা অন্যের, জয় কারুরই আসে না. সার হয় শুধু পথ হাতড়ে মরা আর অজস্র ক্ষত চিহ্ন সঞ্চয় করা দুর্গম

যাত্রায়। অবশেষে অনিবার্য খেদ, গ্লানি, অপূর্ণতার আবেশে ক্রমাগতই তিমিরাচ্ছন্ন মন—ও এই সাধনার মৃত্যু, ঐ সাধনার আরম্ভ।

এইভাবেই চলছিল—এক অবিচ্ছিন্ন শেষ আরম্ভের সুর—যখন ভালেরি প্রথম পদার্পণ করলেন সাহিত্য জগতে। তখনো মালার্মে একটি অশ্রুত নাম তাঁর কাছে, ও তাঁর অভীপ্সা তৎকালীন প্রচলিত 'সাধনাগুলির' মনোমত একটি উন্মাদনায় নিজেকে দীক্ষিত করা। মিললেও মিলতে পারে সম্পূর্ণ সেই নির্বাচিত পথে, ধারণা এই। অবশ্য এই উন্মাদনা কথাটাও এখানে অলংকার মাত্র, তাকে বুঝতে হবে না তার আক্ষরিক অর্থে। আসলে এ উন্মাদনা শৃংখলার প্রেমের, ও এই শৃংখলাটিও এমন যে তা হবে না শৃংখল, কিন্তু তাতে বাজবে স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির একতারা। আবেগে মাতাল যে মন অবশ, যে বশীভূত নয় নিজের স্বাধীন ইচ্ছার, যে ভর করে থাকে বহির্জগতের করুণার উপর, যাতে যে দ্বন্দ্ব আলো-ছায়ার, তা' সৃষ্টি বহু করুণাময় বাহ্যিক উপাদানের ও যা' প্রতিভাত তার আন্তর দর্পণে, যে মন প্রত্যাশায় চেয়ে ব'সে আছে কখন আসবে প্রেরণার মুহূর্তটি সূর্যাস্তের রশ্মি লাগা—সে মনের উন্মাদনা আর এই উন্মাদনায় তফাৎ আকাশ পাতাল। এ এক বিপরীতধর্মী উন্মাদনা যা' নিয়ন্ত্রণ করতে চায় লৌকিক অর্থের উন্মাদনাকে। এ জন্ম দিতে পারে সেই প্রত্যাশার মুহূর্তকে, অপ্রত্যাশিতভাবে নয়, আপন ইচ্ছায়, যখন তখন। পরমকে, সম্পূর্ণকে এ নাচাতে চায় আপন হাতের মুদ্রায় সময় ও খুশী-মত। তবু সে সময়টা এর নিজের সময়, তার নাগালের বাইরে কোনো বহিরাগত সুযোগের সময় নয়। এক কথায় তাই, মনটাকে যেন বজ্র করে তোলা, যে বজ্র কঠিন ও যে বজ্র অস্ত্র ও যার ব্যবহারের সকল সম্ভাবনা আয়ত্ত একমাত্র ঐ মনেরই। ও সেই অস্ত্র দিয়ে ইচ্ছামত শিকার পরমকে, তাকে যে শেষ সুন্দর, যে শেষ সম্পূর্ণ। তবু এ শিকার লৌকিক জগতের রাজার মৃগয়া নয়, এখানে হরিণ মরবে না, কারণ এ হরিণ অমৃত-রূপ, তাই অমর, এর বিভূতি অবিনাশ। উদ্দেশ্য শুধু, সেই হরিণের ক্ষণিক গতিটিকে চিরকালের মত ধরে রাখা সৃষ্টি সাধনার একটি বিশেষ ফলের মধ্যে। এবং যে মুহূর্তে মানুষিক কোনো প্রয়াস জাগতে পারে এমন একটি অলৌকিক, অমানুষিক অভীপ্সায়, প্রয়াসী নিজের মধ্যে অনুভব না করে পারে না এক ভিন্নতর, নামহীন ও সংজ্ঞাহীন উন্মাদনার তাণ্ডব। তাই বলছিলাম, ভালেরি-র বিশেষ ক্ষেত্রে উন্মাদনার কথা।

কিন্তু এর সবই ছিল অর্ধ জাগ্রত, অপরিস্ফুট, এক দূরাগত সংগীতের তানের মত, যখন যুবক ভালেরি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম পা দিলেন।

যথার্থ কী চান, সেই অতি নির্দিষ্ট বস্তুটি অর্জনের ও অনুশীলনের, এক কথায় 'সাধনার', তা যেন তখনো দরজায় মাত্র ঘা মেরেছে শুধু, ভিতরে ঢোকে নি। তবে নিজের বাঞ্ছিত পথটি না পাওয়া পর্যন্ত চলব না বা রাস্তায় বেরোব না, যখন জানি চলতেই হবে, বেরোতেই হবে, যাত্রার আহ্বান শুনেছি নাড়ীতে-শিরায় আর যখন পথ পেতে গেলেই আগে বেরোতে হবে—তখন একগুঁয়েমি করে নিজের কোণটি আঁকড়ে ধরে থাকলে হয়তো শেষ পর্যন্ত পা দুটোয় পক্ষাঘাতের অভিশাপই নামবে। অতএব ভালেরি চললেন। কিন্তু যতই চলতে লাগলেন, ততই যেন তাঁর কাছে পরিষ্কার হতে আরম্ভ হ'ল তৎকালীন সমস্ত কাব্যিক প্রয়াস ও সাধনার এক অনিবার্য অন্তর্নিহিত নিঃসারতা। ও সেই নিঃসারতা এত নির্মম, এত আত্মম্ভরি, এত তার অপরিমেয় গ্লানি, যে তার আস্ফালন শুধু কালি ছড়াল আকাশে, সেই কালিমা ভেদ করে সে পোঁছোতে তো পারলই না কোনো নীলিমায়, বরং নিরন্তর কেবলি বন্দী করল নিজেকে নিজেরি কালিমায়। এত প্রয়াস নাম নিল পথের, কোনো একটা নাম নেওয়ার খাতিরেই, তারা সকলেই অবশেষে ও অচিরেই মাথা খুঁড়ে মরতে উদ্যত হ'ল এক পথ-আটকে-রাখা অনিবার্য অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের গায়। সার হ'ল তাই অজস্র অবিমিশ্র সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ানো, যারা যতই চেঁচাক না কেন নিজের-নিজের সার্থকতার দাবী নিয়ে, আসলে প্রত্যেকেই তারা ক্ষীণায়ু, ও তাদের উদ্যোগী উচ্ছ্বসিত সদস্যরাও না জেনে নাম লিখিয়েছে বিস্মরণের খাতায়। তাই ক্রমাগতই এক সম্প্রদায়ের পতন, অন্য সম্প্রদায়ের উত্থান। এক সম্প্রদায়ের সদস্যরা ক্রমাগতই হচ্ছে ক্ষীণ, খেদ ও গ্লানিতে জর্জর, অন্য সম্প্রদায়ের বাড়ছে আস্ফালন। নতুন হাওয়া যখন প্রথমে চালালেন পারনাসরা, তখন থেকে এই পরীক্ষার-নিরীক্ষার যেন অন্ত নেই। তবু সেই সমস্ত প্রয়াসই বহন করছে এক মহান অনুপস্থিতের বিদ্রুপের গুরুভার। অবশ্য ইতিমধ্যেই, আঙ্গিকে ও খানিকটা বক্তব্যেও, নিশ্চয়ই এসেছে সমৃদ্ধি—কিন্তু তার সবই যেন নিছক অলংকার, সে খুঁজে মরছে দেহকে যে এত অলংকার পরবে, ও একমাত্র যার সমৃদ্ধিতেই সিদ্ধি এই অলংকারের। অথচ দেহ নেই, আজো নেই। প্রয়াস তাই যেন ফাঁকা কথা মাত্র, অর্থহীন, ব্যর্থ।

মালার্মের কবিতার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে এই সত্যকে যে ততটা উপলব্ধি করেছিলেন ভালেরি, তা' নয়। তবে আবছা অনুভূতির জগতে যেন তার ক্ষীণ রণরণি ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই। কিসের যেন অভাব, যা কেবলই রয়ে যাচ্ছে যেমন নিজের তেমনই পারিপার্শ্বিকের

প্রয়াসে। এমন সময় হঠাৎ আবিষ্কার পরম ধনের, মালার্মের কবিতার—সেই ঈপ্সিত অভিনিবেশটি শৃংখলার, সেই কবির সর্বশক্তিমত্তার চেতনার, যাকে ভালেরি রূপায়িত, প্রকাশিত দেখলেন মালার্মের সৃষ্টির মধ্যে। অতএব, এখন বোঝা যাবে, কেন ভালেরি-র এত উচ্ছ্বাস এত বিহ্বলতা মালার্মের নামের প্রসঙ্গে। মালার্মেকে আবিষ্কার এক অর্থে এল যেন ভালেরির নিজেকেই আবিষ্কার করার মত।

এই আবিষ্কারে অবশ্য সকল শিল্প সাধনার শেষ কথাটি নিহিত ছিল না। তা যদি পৌঁছে দিত বা দিতে পারত যাত্রাশেষের মন্দিরে, যা' একমাত্র গন্তব্য, তো ভালেরির এই এতকাল পরেও আজ এত বহুতর সৃষ্টিমুখী প্রয়াসের কোন প্রয়োজনই থাকত না। আসল কথাটা এক্ষেত্রে তাই এবং যে কথাটি এক অর্থে সকল শিল্প সাধনার পক্ষে পরম সুখের কথা, তা হচ্ছে এই যে এ যাত্রার শেষ নেই। অনুপস্থিতির চেতনা নিয়েই এতকাল বেঁচেছে সাহিত্য, বাঁচবে ভবিষ্যতেও। এ-ব্যাপারের শেষ কথা যদি থাকেই কোনো তো তা' 'পাওয়া গেল না, যাচ্ছে না।' তবু মন্দির সেই একটি লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে, রইবে নিশ্চয়ই—নইলে যাওয়া কোথায়? মাধুর্যটি ঠিক এইখানেই ও তাই সাধনা। যে ভাবে ভালেরি একদিন অগ্রগামীদের জেনেছেন ব্যর্থ হিসেবে, সেই একই ব্যর্থতা তাঁর পরবর্তীকাল তাঁর মধ্যে (ও তাঁই মালার্মের মধ্যেও) পেয়ে গৌরব বোধ করেছে। গৌরব, কারণ ব্যর্থতার চেতনাই চালায়, অভাবের অনুভবই শেখায় চাইতে।

আসলে হয়তো ততটা অবান্তর নয় এ প্রশ্ন এখানে—যেহেতু এই প্রসঙ্গ মালার্মে তথা ভালেরির সাধনাকে সমগ্র শিল্প সাধনার ইতিহাসের একটি ছাঁচের মধ্যে ফেলে তার স্বরূপকে আরো ভাল করে দেখতে সহায়তা করে। মালার্মের কবিতার প্রথম সংস্পর্শে যে বিহ্বলতা এল ভালেরির, তাতে বিশেষ করে ছিল তাঁর এক অপ্রকাশ্য বিস্ময় আত্মাবিষ্কারের। মালার্মেতে অতি বিশেষ করে যে জিনিসটি তিনি অনুভব করলেন, তা একটি আবাহন বিপরীত যাত্রার। এবং এই বৈপরীত্যটি আমাদের পক্ষে, ভারতীয় আলংকারিক ঐতিহ্যের পক্ষে, আরো প্রকট—সে আলোচনায় পরে আসছি। এখন দেখা যাক, মালার্মের এই বৈপরীত্যের আত্মাটিকে ভালেরি কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কথা অবশ্যই আসবে মালার্মের কবিতার সংস্পর্শজনিত সেই বিচিত্র সংঘাতের অনুভবের, ও কেমন করে সেই সংঘাতটির কথা ভালেরি বর্ণনা করেছেন, সেই প্রসঙ্গও।

আমার মনে পড়ছে এখানে মালার্মের বিষয়ে লেখা ভালেরির একটি বিশিষ্ট চিঠির কথা। লেখাটি মালার্মের মৃত্যুর বহু বৎসর পরের—

যখন ভালেরি স্বয়ং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত, তাঁর রচনাও ততদিনে মণ্ডিত প্রৌঢ়তার পরিপক্ক জ্যোতিতে। মালার্মে সম্বন্ধে একজন শেষ করেছেন একটি বই, তার ভূমিকা হিসেবে তিনি ভালেরিকে অনুরোধ করেছেন দুয়েকটি কথা লিখতে। সেই অনুরোধের উত্তর দিচ্ছেন ভালেরি তাঁর চিঠিতে।

তাঁর প্রথম প্রশ্ন : কী লিখবেন তিনি? কী তিনি লিখতে পারেন যা' বহুবার আগেই তিনি বলে ফেলেন নি, বা যা অন্যান্য অনেকেই বলেন নি মালার্মের বিষয়ে? এবং এই ভয়টিও জাগছে তাঁর, কেমন করে অতি সাধারণভাবে মালার্মে সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে সেই কবির অতি অসাধারণ দর্শনের খুঁটিনাটি আলোচনার মধ্যে না গিয়ে? আর খুঁটি-নাটিতে ঢুকলেই তা' কি হবে না অবোধ্য ও অপাঠ্য সাধারণ পাঠকের কাছে? আরো একটি প্রশ্ন, যেটি বিরাট : কী করে মালার্মে সম্বন্ধে ও শুধু মালার্মে সম্বন্ধেই তিনি কিছু বলবেন, যদি না সেই সঙ্গে বলতে হয় অনেকখানি তাঁর নিজের কথাও? প্রথম দর্শন হতেই মালার্মের কবিতা তাঁর কাছে ঠেকেছে আশ্চর্য, তাতে তিনি দেখেছেন সহস্র প্রশ্নের গুপ্ত উত্তর। তা' নয় ঠিক সমাধান কোনো সমস্যার, তা যেন চরম অর্থ-পূর্ণ উচ্চারণের দ্যোতনায় নন্দিত। তাই ভালেরির ক্রমশই বেশি করে মনে হয়েছে এই কথা : মালার্মে তাঁর অন্তর বিকাশে নিজের অজ্ঞাতে একটি প্রচণ্ড অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর কবিতায় ভালেরি শুধু ঈপ্সিত পথের সন্ধানই পান নি, সেই কা... তাঁকে বার বার জানিয়েছে কোনটা করার ও কোনটা না করার, কোথায় প্রয়োজন আত্মত্যাগের, প্রয়োজন সস্তা প্রলোভন বর্জনের। ভালেরির ক্ষেত্রে এই প্রভা... এমন প্রচণ্ড সর্বব্যাপী এক রূপ নিয়েছে যে অবশেষে তাঁর পক্ষে বোঝা মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা তিনি হয়েছেন, তা কতখানি ঠিক তাঁর নিজের ও তার কতখানি মালার্মের দান।

এ কি এক নিছক প্রভাব? হয়তো। কিন্তু এ বিষয়েও ভালেরির একটি নিজস্ব বক্তব্য আছে। ঐ একই চিঠিতে বলেছেন : "'প্রভাব' বোধ হয় সেই একটিমাত্র কথা যা' সবচেয়ে সহজে সমালোচকের কলমে আসে। যদিও সৌন্দর্যতত্ত্বের মায়াময় জগত যত নাম রূপের প্রয়োগে নিজেকে দাঁড় করায়, তাদের কোনোটিই এই 'প্রভাব' কথাটির মত এত গোলমেলে নয়। কথাটির অর্থ পরিষ্কার নয়। অথচ, অন্যদিকে, একটি চিত্তের যে আশ্চর্য ক্রমবিকাশ ঘটে অন্যের সৃষ্টি সাধনার সংস্পর্শে এসে, যাকে প্রথা প্রভাব বলে জানতে শিখেছে, তার আলোচনার চেয়ে বেশি করে অন্য

কিছুরই ক্ষমতা নেই বুদ্ধিদীপ্ত কোনো বিশ্লেষণকে উজ্জীবিত করার। এবং সেই আলোচনার প্রয়োজন আছে, এক রকম দার্শনিকভাবে।”

এই প্রভাব অবশ্যই অনুকরণ নয়। ভালেরি মালার্মেকে অনুকরণ করেন নি। তবে মালার্মের আলোক তাঁকে দীপ্ত করেছে। সম্ভব নয় কি, প্রশ্ন করছেন ভালেরি, যে একজন লেখকের সৃষ্টি অন্য একটি লেখকের চিত্তে ফেলতে পারে এমন একটি গাঢ় অর্থপূর্ণ আমেজের আবেশ, সেই চিত্তকে নাড়া দিতে পারে তার এমন অভাবনীয় প্রতিক্রিয়ায় যে সেও জাগতে পারে এক নতুন ধরনের সৃষ্টি সাধনার অভূতপূর্ব উত্তেজনায়? এবং এই প্রভাব ঘটে না শুধু আর্টের বা কবিতার ক্ষেত্রেই, এ সত্য ঘোষিত মানুষের অন্য সব রকমের প্রয়াসে—কী শিল্পে, কী সাহিত্যে, কী বিজ্ঞানে। ক্রমবর্ধমান ফলের জগতের দিকে চেয়ে ভালেরি জানালেন: যা' ঘটছে, হয় তা' যা' ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি, নয় তার খণ্ডন। যেখানে বর্তমান অতীতের পুনরাবৃত্তি, সেখানে সেই পুনরাবৃত্তি রূপ নিচ্ছে নতুন নামে বা নতুন কোনো ভঙ্গীতে, সারটিকে এক রেখে। কখনো সেই পুনরাবৃত্তি একই জিনিসকে বাড়িয়ে বলে, বা তাকে কমিয়ে বলে, বা তাকে আরো সরল করে বলে, কখনো বা সে তাতে যোগ করে নতুন অলংকার, দেয় তাকে নতুন কোনো পোষাক, এক নতুন আবরণ। আর যখন বর্তমানে খণ্ডন অতীতের, তখন যা ঘটছে, তা যা ঘটে গেছে তাকে উল্টে ফেলে দেয় চলতি পথের পাশের ঝোপে, তাকে অস্বীকার করে, তার মূলে শাণিত ছুরিকা চালায়। কিন্তু সেই খণ্ডনের বেলায়ও যে খণ্ডিত হ'ল, তার একটি বিশেষ সত্তা আছে। যে-নতুন এল যে-পুরাতনকে উল্টে ফেলে, সে-পুরাতন সে-নতুনের কাছে ছিল অপরিহার্য।

তাঁর উপর মালার্মের প্রভাব সম্পর্কে এ শুধু ভালেরির কোনো সাফাই গাওয়া নয়, এক তুচ্ছ কৈফিয়ৎই নয়, এ ভালেরির জবানবন্দী এক হিসেবে তাঁর স্বীয় বৈশিষ্ট্যেরই। মালার্মের প্রভাব ভালেরিকে কোনো অংশে ছোট করে নি, তাঁকে করে তোলে নি মালার্মেরই এক দ্বিতীয় সত্তা মাত্র, বরং সেই প্রভাবকে আত্মস্থ করে তিনি যে তাঁর কাব্যকেই শুধু সমৃদ্ধ ও মৌলিক করেছেন তাই নয়, একটি নতুন কাব্যদর্শনের ভিত্তি স্থাপনও তিনি করে গেছেন। এ ক্ষেত্রেও যা' ঘটে গেছে মালার্মেতে এবং যা ঘটল ভালেরিতে, এই দুয়ের সম্পর্ক যদিও অবিচ্ছেদ্য, নূতন এখানে পুরাতনকে দিল এক অভিনব ব্যাখ্যা, তাকে বাড়িয়ে আরো বিশদ করে আরো প্রাঞ্জল করে, ও তাকে আরো দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে। কারণ, মূলত মালার্মের দর্শনকেই ভিত্তি করে ভালেরি পৌঁচেছেন মালার্মে হ'তেও দূরে, দিতে

পেরেছেন একটি সৌন্দর্যতত্ত্ব, যাকে ইতিহাস তাঁরই মৌলিক বলে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু কী করে একটি লেখককে মৌলিক বলা চলে? মৌলিক কথাটার অর্থ কী? ভালেরি বলছেন, সাধারণত আমরা একটি লেখককে মৌলিক আখ্যা দিই, যখন আমাদের বিশ্লেষণ শক্তির অভাব সেই লেখকের মধ্যে দেখতে পায় না সেই সমস্ত গুপ্ত উপাদান যা তাঁকে শুধু পরিবর্তিতই করেনি, তাঁকে দিয়েছে একটি রূপান্তর। বিশ্লেষণশীল পাঠক সেই লেখকের মৌলিকতার প্রসঙ্গে বলবে : তিনি এখন যা করছেন বা লিখছেন এবং তিনি আগে যা ছিলেন, এই দুয়ের সম্পর্ক অতি জটিল ও তাদের পরস্পরের মধ্যে আছে একটি বৈসাদৃশ্য। আবার সেই 'প্রভাবেরই' প্রশ্ন। তবে সে প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসতে পারে নিজের অন্তর হতেও। কোনো লেখক তাঁর নিজের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হতে পারেন ভবিষ্যতে। তবে সে প্রশ্ন আলাদা ও এখানে অবান্তর।

যখন কোনো বিশেষ রচনা, বা কোনো লেখকের সমগ্র রচনাবলী, অন্য আরেকটি চিত্তকে নাড়া দেয়, নয় তার সমস্ত গুণ বা দোষ দিয়ে, কিন্তু সেই গুণ বা দোষের বিশিষ্ট একটি বা কয়েকটি দিয়ে, তখনই এক চিত্তের উপর আরেক চিত্তের প্রভাব সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়। যখন একটি চিত্ত প্রাণপণ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয় আরেকজনের একটি বিশেষ গুণের দ্বারা, তখন সেই চিত্তের সৃষ্টিমুখী প্রয়াসে প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত থাকে চরম মৌলিকতার সম্ভাবনা।

প্রভাব ও মৌলিকতার এই বিস্তারিত আলোচনায় ভালেরি যা বলতে চেয়েছেন, তা তাঁর নিজের কথাই নয়, অনেকখানি মালার্মের কথাও। যেভাবে তিনি নিজে মালার্মের প্রভাবে পড়েছেন, মালার্মেকেও উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত করার মত বহু উপাদান প্রাক-মালার্মে কাব্যে উপস্থিত ছিল। তবে ক্ষেত্রভেদে প্রভাবের তীব্রতারও উনিশবিশ ঘটে থাকে। মালার্মের ক্ষেত্রে যে-প্রভাব ঘটেছিল তাঁর উপর ও তাকে তিনি যে-উপায়ে তাঁর আত্মানুগ করে তুলেছিলেন—তা' আবার অন্য ইতিহাস। ভালেরির ভাগ্য যে তিনি মালার্মের প্রচারকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তাঁর সাধ্যবস্তু যেন পেয়ে যান পুরোপুরিভাবে একটি লোকেরই মধ্যে। মালার্মের কাজ তত সহজ ঠেকেনি। মালার্মেকে গড়ে তুলতে হয় বহু পরিশ্রমে ও সাধনায় এমন একটি বস্তু, যার অনেক উপাদান যদিও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল হাতের কাছে, তার একটি সামগ্রিক রূপ ও সত্তা দেওয়া হয়ে ওঠে সম্পূর্ণভাবে মালার্মেরই কাজ। এবং এই কারণেই ফরাসী

কবিতার ইতিহাসে মালার্মে হয়তো আরো একটি বড় নাম ভালেরির চেয়ে। মালার্মে কবিতাকে দিলেন একটি বিশেষ দিগদর্শন, যা তার ছিল না আগে।

দেখা যাক এবার পূর্বসূরিদের কী সেই সমস্ত উপাদান যাতে মালার্মে প্রবুদ্ধ হলেন। কিন্তু এর কোনো পুংখানুপুংখ বিবরণ স্বভাবতই সম্ভব নয়, কারণ এই সব উপাদান কাব্যের জগতের, উপাদান ভাবের ও ভঙ্গিমার—তারা নয় পদার্থিক বা রাসায়নিক, নয় হাতে ছোঁওয়ার, ধরার, তারা অনেক সময় নামের ও সংজ্ঞার অতীত। তবু অতি সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, মালার্মের উপর প্রথম এক অপরিমেয় প্রভাব ছিল নিশ্চয়ই বোদলেয়ারের—সেই সর্ব অর্থে প্রথম 'আধুনিক' কবি জগতের, যাঁর লেখায় যা' নিতান্ত ব্যক্তির ও নিতান্ত ব্যক্তিগত, তা' পেল একটি অভূতপূর্ব সুন্দরের রূপ। এক মিশ্র চেতনা পাপের, গ্লানির, বেদনার, ও তার মধ্যে দিয়ে সোপান ডিঙিয়ে সুন্দরের মন্দিরে পেঁাছানোর সাধনা। মূলত কবিতায় এই অভাবনীয়কে আনলেন বোদলেয়ার। ও বোদলেয়ার ছাড়াও মালার্মের উপর প্রভাবের প্রসঙ্গে ছিলেন আরো কয়েকজন রোমাণ্টিক কবি। এঁদের মধ্যে মালার্মে খুঁজলেন সেই বিশেষ বস্তুটি বা গুণটি যা গুপ্ত, অথচ যা গভীর গহ্বরে লুকিয়ে-থাকা মাণিক্যের মত ছটা ফেলেছে তাঁদের কাব্যে, ও যা'-ই তাঁদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অবদান, যা পাওয়া যায় নি আগেকার কবিতায়, যা বিরল ও পৃথক নির্মমভাবে চিরা-চরিত হতে। সেই বিশেষ বস্তুটি বা গুণটি যেমন একক, তেমনি একাকী—কারণ তার মধ্যে যেন একটি বেকুব আর্তি নির্জনতার, নিঃসঙ্গ-তার। তার ভিন্নতা, কাব্যের আগের চেনা বস্তু বা গুণ হতে, তাকে করেছে একলা চলার পথিক। তবু যত না আর্ত সে, তত গর্বও তার, কারণ সে হতে পেরেছে একক।

তবু এই একক হতে পারার ঘটনাটাকে যেন সে তখনো সত্য বলে জানতে শেখেনি পরিষ্কার করে—অন্তত এই পূর্বসূরিদের রচনা সম্বন্ধে মালার্মের ধারণা তাই। এবং যে বিশেষ বস্তুটি বা গুণটি এই এককতার জনক তাঁদের লেখায়, তা ছড়ানো এখানে ওখানে বিশৃংখলায়, ধূলোর মধ্যে মুক্তার মত। তা সর্বব্যাপী হয়ে জেগে ওঠেনি এই কবিদের রচনার সত্তায়। বলছি 'বস্তুটি' বা 'গুণটি', যদিও তা সংখ্যায় অনেক। এই কবিদের একজনের বিশেষ 'গুণটি' হয়তো অন্য আরেকজনের বিশেষ 'গুণ' নয়। তাই মালার্মে প্রথমে যা করলেন, তা হচ্ছে এই বিরল গুণগুলিকে সযত্নে একত্র করে তাদের একটি শৃংখলার গাঁথুনিতে বাঁধা। শুধু কোনো-

রকমের একটি এবড়ো-খেবড়ো রূপ দেওয়াই নয়, নয় শুধু বিভিন্ন আকারের ও রঙের মণি মুক্তা জড়ো করে একটি কণ্ঠহার তৈরি করাই, কিন্তু একটি সত্তাও দেওয়া। এবং যে মুহূর্তে এল সত্তা দেওয়ার প্রশ্ন, এল প্রশ্ন বাছাই-এর, তাদের পরস্পরের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত একতার—নইলে নেহাৎ রূপের দিক থেকেও তারা মিলবে না, তৈরি হতে পারবে না কণ্ঠহার। এই বাছাই-এর প্রসঙ্গে কোনটি মালার্মের পছন্দ, মনোমত, কোনটি তাঁর অপছন্দ, কোনটি মেলে তাঁর মনের সুরে, তাঁর একতার ধারণায়, ও কোনটি মেলে না—এল সে প্রশ্নও। ও মালার্মের এই প্রাথমিক সাধনায়, অন্যান্য সকল কবি হ'তে, বোদলেয়ার রইলেন সবচেয়ে বেশি করে জাগ্রত হ'য়ে তাঁর মনে।

এই পরিশ্রমের ফল যা' মিলল তা গোড়া হ'তেই চমকপ্রদ। মালার্মে পেলেন একটি ভঙ্গী, যা এত নতুন, এত অকল্পনীয় তৎকালীন সাহিত্য জগতে, যে তা যেন মালার্মের কবিতাকে একেবারে প্রথম হতেই সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল তাঁর সমস্ত সমসাময়িক ও পূর্বসূরিদের রচনা হতে। তিনি দেখলেন, একটি নতুন তত্ত্ব তিনি গড়ে তুলতে চাইছেন, একটি অভিনব বন্ধনে তিনি বাঁধছেন নিজেকে, জাগছেন নতুন সমস্যা ও নতুন পথ চলার সংকল্পে। ভালেরির মতে, সেই অভিনব বন্ধনটি ছিল মালার্মের শৃংখলা ও তার প্রতি তাঁর সর্বগ্রাসী প্রেম। ঐতিহ্য, যা বোধির কারুণ্যকে এতদিন নমস্কার করে এসেছে, আর তা নয়। আর নয় কবিতায় মাত্র তুচ্ছ, লৌকিক চিরাচরিত অভীপ্সার অঙ্গীকার। এবার কবিতা যেন নতজানু হয় একমাত্র কবিরই কারুণ্যের কাছে। যা কবিকে দিতে পারবে তার ঈপ্সিত ধন, তা তার শৃংখলা।

তাই আশ্চর্য নয় যে মালার্মের যুগান্তকারী প্রয়াসের মধ্যে ভালেরি দেখতে পেয়েছিলেন একটি বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারা। প্রাধান্য রীতির, গঠনের—প্রচেষ্টা ধরতে যথাযথকে ঠিক যথার্থ কথায়। এক কথায়, ক্ষমতা, নিজের ও নিজের কাব্যের উপরে নিজের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের, এক দুঃসহ সাহস ও যোগ্যতা জন্ম দেওয়ার, ঠিক যার যেটুকুকে জন্ম দিতে চাই। বৈজ্ঞানিক, নিশ্চয়ই—তবু এ ক্ষমতা অনেকখানি ঐন্দ্রজালিকেরও। মিলন কবি ও বৈজ্ঞানিকের একটি চিত্তে, তাই ইন্দ্রজালেরও প্রশ্ন। তবে কতখানি মালার্মের কবিতা এই সত্যের সাক্ষী হ'তে পেরেছে, তা অন্য কথা। কিন্তু সেই একমুখী প্রয়াসটি সর্বদাই বর্তমান ছিল তাঁতে। অন্য কিছুর জন্যে না হলেও, অন্তত তাঁর এই প্রয়াস ও এই দর্শনের জন্যে মালার্মে নমস্য হয়ে রয়েছেন পরবর্তীদের।

সত্য, মালার্মে পেলেন একটি নতুন ভঙ্গী, সৃষ্টি করলেন একটি নতুন আংগিক। যে-দৃশ্য ফলটি প্রথম জাগল তাঁর পাঠকদের কাছে, তা এক ধরনের অবোধ্যতা তাঁর কাব্যের। সেই কবিতার সঙ্গে যেন আগেকার সমস্ত কবিতার ঐতিহ্যের নাড়ীর বিচ্ছেদ। এ রকম ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে মালার্মেতেই প্রথম ঘটেনি। যুগে যুগে যত কবি এসেছেন নতুন বক্তব্য নিয়ে, তাঁদের অনেকেই সমসাময়িকদের কাছে দুর্বোধ্য আখ্যা পেয়েছেন। পরে হয়তো ইতিহাস তাঁদের সকলকেই মেনে নিয়েছে, যথাযথ সম্মানও করেছে। কিন্তু মালার্মের যে দুর্বোধ্যতা, যা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অবোধ্যতা, তার স্বরূপটি বেশ একটু ভিন্ন ধরনের। ভালেরি সেই দুর্বোধ্যতা বা অবোধ্যতার পক্ষ নিয়েছেন এই বলে যে যেহেতু মালার্মের রচনায় লৌকিক ঐতিহ্যের ভাবাকুলতার গৌরবময় ইতি, তুচ্ছের, সহজের জয়ী অবসান, যেহেতু তা কবির সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ও আয়ত্তাধীন, তাতে অবশ্যই পড়বে কবির দুরূহ সাধনার ছায়া ও যে ছায়া তাকেও দুরূহ করবে। কিন্তু একবার যদি কেউ কষ্ট করতে প্রস্তুত হয়, রাজী থাকে এগোতে মালার্মের চিন্তার সিঁড়ি ধরে, সে পাঠক পাবে তার শ্রমের পুরস্কার, সে দেখবে এমন একটি প্রকাশ মালার্মের কবিতায় যা তার কল্পনাতীত।

মালার্মের উচ্ছ্বসিত স্তুতিতে ভালেরি আরো এগিয়ে গেলেন ও বললেন : একবার যে এই বিজাতীয় কবিতার স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হয়েছে, তার কাছে অন্য সকল কবির লেখা ঠেকবে যেমন তুচ্ছ তেমনি বিস্বাদ, ক্ষীণবল। আর তা হবে নাই বা কেন—? প্রশ্ন করলেন ভালেরি। মালার্মের প্রতিটি কবিতা যে এক নিখুঁত সম্পূর্ণতার জগত, যা লিপিবদ্ধ হবার আগে বেঁচেছে কবির মনে বহু দুঃসহ মুহূর্তের চিন্তায়, নিবিড় নীরব অনুশীলনে, তার কোনোটিতেই যে একটি কথা বাড়তি-কমতি নেই, তাতে চিন্তার ও প্রকাশের এক আশ্চর্য সংযোগ। অর্থাৎ, এ কবিতা লেখার আগেই তৈরি হয়ে আছে মনে তার আদি অন্তে, বক্তব্যে ও ভঙ্গীতে, তার ছন্দ-কথা-যতির খুঁটিনাটিতে।

কিন্তু কোনো কাব্যসৃষ্টির এতখানি চিন্তিত হওয়া কি সম্ভব? শুধু চিন্তিতই নয়, আগে থেকে আগাগোড়া পরিকল্পিত এমন একটি সৃষ্টি? ভালেরি এখানে একটি খাসা প্রশ্নের উত্থাপনা করেছেন, কিন্তু তার বিস্তারিত আলোচনায় মাততে চান নি—হয়তো তিনি সন্দেহ করেছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর নেই। প্রশ্নটি এই। কী করে কবিতার বাহ্যিক জন্ম ঘটতে পারে এমন একটি ঘন গহন মনের গহ্বর হতে যে মনের কোন এক

চিন্তানিবিড় কোণে তা আগে থেকেই সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে? মন থেকে যখন তাকে বেরোতে হয় কাগজের সাদা পৃষ্ঠায় আকার পেতে, তা কি বেরোয় না যেন ছিটকে, যেন ঝাঁকানি লাগিয়ে অকস্মাৎ? তার প্রকাশ বোধ হয় একটি দুর্ঘটনার মত, পড়া অদৃশ্য শূন্য হতে হঠাৎ কালের চাক্ষুষ তরঙ্গিত প্রবাহিণীতে।

এই স্বীয় ইচ্ছার সর্বশক্তিমত্তা, এই অমানুষিক শৃংখলার সাধনা মালার্মেকে দীক্ষিত ভালেরির চোখে করেছিল কবিতার ক্ষেত্রে মুক্তিদাতা ঋষি। অন্যত্র ভালেরি বলেছেন, ভালো লেখার, ভালো লেখকের সৃষ্টি সাধনার একটি অন্যতম লক্ষণই হ'ল এই যে কতখানি ত্যাগের নেশায়, কতখানি সস্তা প্রলোভন বর্জনের মত্ততায় তা প্রাণ পেতে চেয়েছে। কতটা ছাড়তে, কতটা পরিবর্জন বা পরিমার্জনার তাড়নায় সে স্বেচ্ছায় অস্থির হয়েছে। যা হারাতে বা সংশোধন করতে কোনো চিন্তাশীল বিবেকী লেখক প্রস্তুত, তার সম্যক আয়তনের যদি কোনো বিশ্লেষণ সম্ভব হয় তো দেখা যাবে, শুধু সেই লেখকের অনস্বীকার্য মাহাত্ম্যটিই নয়, তাঁর সীমা ও শক্তির পরিমাণও। তাঁর গৌরব, তাঁর গর্ব, তাঁর অভীপ্সা, তাঁর আশংকা ও সন্দেহ সমকালের প্রতি, তাঁর বিবেক ও বিবেচনা শক্তির বিস্তার—সকলি পরিষ্কার হবে। তাই, ভালেরি বললেন, নীতির একটি অপরিমেয় মর্যাদা সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে। কারণ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ও সাহিত্যিককে ভুগতেই হয় এই অনিবার্য অন্তর্দ্বন্দ্বে। কতটা তাঁর বিবেক তাঁকে যেতে দেয়, ও কতটা তাঁর মালমশলা ও সমসাময়িক সমাজ তাঁকে বাঁধে। দ্বন্দ্ব তাঁর প্রয়াসের সঙ্গে তাঁর পারিপার্শ্বিকের, প্রাকৃত জগতের।

তবু এ দ্বন্দ্বে ঐ লেখকের বিবেকটাকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে হবে। নইলে সাহিত্যের নামে করা হবে ভণ্ডামি-বাটপাড়ি। এ এক অলৌকিক, উচ্চতর নীতি, যার মর্যাদা উচ্চ সাহিত্য দিতে জানবেই। মালার্মের ক্ষেত্রে, ও ভালেরির ক্ষেত্রেও তাই, এই বিবেক নিয়েছে তাঁদের মনগড়া সেই শৃংখলার রূপ। এক জায়গায় বলেছেন ভালেরি : 'আমি বারবার বলেছি নিজেকে সে রচনা নয় শুধু লেখাই, নয় তার রূপ বা ফল বা কী সে বলতে চায়, যা আমাদের এই পৃথিবীতে স্থান দিতে পারবে, বা সমৃদ্ধ করবে, বা গৌরব দেবে। কিন্তু কী ভাবে বা কী ভংগীতে আমরা সেই বলবার জিনিসটি বলতে পেরেছি বা চেয়েছি, একমাত্র তাই বিবেচ্য।' এবং এই উক্তি-টির সঙ্গে একটি হৃদয়ের সম্পর্ক এই আরেকটি উক্তির, ভালেরিরই : 'যদি লিখতেই হয় আমায়, আমি বরং লিখব সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও নিজের পরিষ্কার দৃষ্টিতে, প্রাঞ্জলতায়—হোক না সে লেখা দুর্বল, তুচ্ছ। কিন্তু

সে লেখা অনন্তগুণে শ্রেয় হবে তার থেকে, যদি আমাকে জন্ম দিতে হয়, মোহবলে ও নিজের অজ্ঞানে, অতি বৃহৎ ও পরম সুন্দর কোনো রচনা।'

বলা বাহুল্য, এই দুটি উক্তিতেই, বিশেষত দ্বিতীয়টিতে, ধ্বনি মালার্মের আজীবন সাধনার। সেই শৃংখলার দ্যোতনার। লেখার আর্টকে মালার্মে দিলেন একটি নতুন অর্থ, একটি বিচিত্র বিশ্বের স্পন্দনে সে প্রাণ পেতে উদ্যত হ'ল। লেখা মানেই জাগা, ও মানুষী সাধনার শেষ সিদ্ধি লেখাতেই—মালার্মের বক্তব্য এই। তাই তাঁর মনে হয়েছে, যেমন করে খাল বিল নদীর জল শুনেছে বহুদূর সমুদ্রের আহ্বান, তেমনি মানুষের সমস্ত প্রয়াস পেতে চায় তার শেষ ও পরম প্রকাশ একটি 'বই-এ'। সারাজীবন তিনি পূজারী ছিলেন এই 'বই-এর' কল্পনার।

'বই' কথাটাও আলংকারিক, বিশেষ করে যদি তাকে ব্যবহৃত হতে হয় মানুষের জগত জুড়ে বিভিন্ন ও বহুমুখী প্রয়াসের ক্ষেত্রে। মানি, তা' অবশ্যই প্রযোজ্য মালার্মের ক্ষেত্রে এক আক্ষরিক অর্থে—কারণ তিনি সাধনা করেছেন কবি হিসেবে, দীপ্ত হয়েছেন লেখার অভিনিবেশে। সকল মানুষের হয়ে কথা বলতে যখন তিনি চেয়েছেন, তখন হয়তো তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে প্রয়াস যেন শৃংখলার রূপ নেয়, তার অর্জিত সমস্ত ফলে যে-বাহ্যিক আকার সে পেতে পারে তা যেন হয় প্রয়াসীর সম্পূর্ণ মনোমত। এই রকম তত্ত্বে উদ্বোধিত যে কবি, তার শৃংখলার সাধনার বাহ্যিক স্বীকৃতির একমাত্র সম্ভাবনা তার কবিতাতেই। ও কবিতা তৈরি শব্দের। তাই মালার্মে বারবার জানিয়েছেন যে একমাত্র যথার্থ শব্দেরই সুচিন্তিত প্রয়োগ হতে পারবে ব্রহ্মাস্ত্র কবির হাতে, তা-ই তাকে তার হাতের মুঠোয় এনে দিতে পারবে পরমকে।

এখানে আমার মনে পড়ছে একটি ছোট্ট ঘটনা—একটি কথোপকথন মালার্মের সঙ্গে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী দ্যগা-র। দ্যগা বলছেন, তাঁর ভাব ও আইডিয়া অনন্ত ও কবিতা লেখার বাসনাও তাঁর দুর্দম। তবু তিনি কিছুই তৃপ্তির সঙ্গে লিখে উঠতে পারছেন না। তাই তাঁর প্রশ্ন মালার্মেকে : কেন এমন হয়, কেন তিনি পারছেন না? মালার্মের উত্তরও এল সঙ্গে সঙ্গে : কবিতা লেখা হয় কথা বা শব্দ দিয়ে, ভাব বা আইডিয়া দিয়ে নয়। কবিতার আত্মা একমাত্র অনিবার্যভাবে ভাষাতেই ধরা পড়তে পারে বলে তার যা জয়, তা শেষ পরীক্ষায় মূলত অনেকখানি ভাষারই জয়। ভাষা ব্যাপারটা নিশ্চয়ই প্রতীকমাত্র, কিন্তু তা প্রতীক একমাত্র সেই চির-ঈপ্সিত, চির-অনুসৃত রিয়্যালের, বা ভাবের, বা আইডিয়ার।

আমরা অবশ্য আজ জানি, এ-ই ছিল প্রতীকবাদীদের অন্যতম প্রতি-

পাদ্যগুলির একটি। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক কবিতার অনেক খানিতে যে দুটি বিশিষ্ট ভাবধারা কাজ করে এসেছে, আজো করছে পৃথিবীর সর্বত্র, ও যাদের চেতনায় ধীরে ধীরে জাগছে আজকের বাংলা কবিতারও একটি মুখর পরিস্ফুট অংশ, সে-দুটি ভাবধারার একটি মালার্মের ঐ মর্মবাণীতে বিধৃত। মালার্মের সেই বক্তব্যটি অবশ্য একই পথের পরবর্তী কবিদের হাতে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে, হয়েছে আরো স্পষ্ট, কখনো তা নিয়েছে একটি রূপান্তরের বিস্তার—কিন্তু উৎস তার মালার্মেতেই। অন্য যে-ধারাটি নেমে এসেছে আধুনিক কবিতায়, তা তত মাথা ঘামায় নি ভাব বা আইডিয়া ও তাই শব্দের অন্তর্নিহিত রহস্য এবং প্রাধান্য নিয়ে, যতটা সে উদ্বুদ্ধ হয়েছে জগৎকে দেখতে ও প্রকাশ করতে সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে। এতে ভাবের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে জিনিস ও তার বর্ণনা। তবু এ ধারাতেও কাব্য হয়েছে বহু ক্ষেত্রে গভীর, তা হয়নি নেহাৎ বহিরাকারের বিবরণবিলাসী, তাতে ছায়া ফেলেছে অনেক আলোছায়ার দ্বন্দ্ব, অনেক মহান ভাব মানুষের ও তাই তাতেও প্রতিফলিত একটু অন্য ধরনের, হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য, এক মানবতা। কিন্তু যে অন্তর্মুখিতা, যে ডুবুরীর মত মনের গহনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রাণান্ত প্রয়াস চিহ্নিত করতে চেয়েছে প্রথম ধারাটির কবিদের সাধনাকে, তা এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ও তার প্রয়োজনও এই দ্বিতীয় ধারা অনুভব করেনি—কারণ তার উদ্দেশ্য আলাদা। প্রথম ধারাটির যে মরিয়া অন্তর্মুখিতা, তাতে বহুক্ষেত্রেই ছাপ পড়েছে একটি নামহীন পবিত্রতার, তা তার কবিতাকে যেন করেছে এক ধরনের ধার্মিক।

ভালেরি বিহ্বল হয়েছেন, যখনি তিনি ভাবতে বসেছেন কী করে মালার্মের মাথায় প্রথম আসতে পেরেছিল শৃংখলার এই অমানুষিক সাধনায় যাত্রা করার কথা। মালার্মের সাধনা এত বিজ্ঞানমুখী যে তার সঙ্গে তুলনা করা চলে যে কোনো বৈজ্ঞানিকের শৃংখলার সঙ্গে। অথচ তিনি আর্টেরই চর্চা করেছেন সারা জীবন, তাঁর শিক্ষায় অথবা কর্মজীবনের অধ্যাপনায় (তিনি ইংরাজীর শিক্ষকতা করেছেন) কোথায় সেই ভিত্তি বৈজ্ঞানিক চিন্তার? তার শৃংখলা যেন এক গাণিতিকের, সংখ্যার, যথার্থতার, সীমার—আর সেই সাধনায় এমন করে নিবিষ্ট হলেন তিনি যে ভ্রূক্ষেপ না করতে এতটুকু দ্বিধা তাঁর রইল না কোথায় রয়েছে বহির্জগত, কী বলছে অন্যেরা, তাঁর বা অন্য কারুর সম্বন্ধে, তিনি ডুব দিলেন নিজেরি অতল গহনে, যাপন করে গেলেন নির্জন একাকীর জীবন। এই প্রয়াসের মধ্যে ভালেরি দেখলেন শুধু মালার্মের এক অতি দুর্জয় সাহসই

নয়, তাঁর চিত্তের অতলান্ত গভীরতাও, ও অন্য সকল সমসাময়িকদের তুলনায় তাঁর অনস্বীকার্য অপরিসীম মাহাত্ম্য। যদি একটু রাশ আলগা করতে রাজী থাকতেন তিনি, যদি একটু নেমে এসে চেষ্টা করতেন তৎকালীন পাঠক জগতের বাঞ্ছিত তুষ্টি জোগাতে, তবে তাঁর জীবন-কালেই অতি সহজে তিনি স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন তাঁর সময়ের মহত্তম কবি বলে। অথচ তা' না করেও, এবং যেহেতু তা করেন নি তিনি, তিনি ছিলেন সেই মহত্তম কবি, অদ্বিতীয় ও ভাস্বর আপন বিশিষ্ট জ্যোতিতে—ভালেরি বলতে চেয়েছেন এই কথা। যদি সমসময় তাঁকে একলার জীবন বেছে নিতে বাধ্যই করেছিল, তো সেই সমসময়েরও অন্য উপায় ছিল না। কারণ তা মেতে থাকতে শিখেছিল অন্য উন্মাদনায়।

তাই বোঝা যায় কত বড় সংঘাতের মত ঠেকেছিল ভালেরির কাছে মালার্মের কবিতার সেই প্রথম সংস্পর্শ। ভালেরি তখনো কিশোর, বয়স কুড়ি বছরের বেশী নয়, এবং ইতিমধ্যেই কবিতা লেখায় হাত দিয়েছেন তিনি। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রেমের ও বাসনার উপজীব্য ছিল তা-ই যা ১৮৮৯ সাল নাগাদের ফ্রান্স চাইতে বা ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ পরিচয় ঘটল মালার্মের রচনার সঙ্গে। নিমেষে যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ হ'ল চলতি স্বপ্ন—ভালেরি দেখলেন ব্যর্থতা একই পথে চলার। একটি অনুভব অভিভূতির, শিহরণের, বিস্ময়ের, একটি আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অথচ অব্যক্ত গ্লানির, একটি এতদিনের অপরিচিত উন্মাদনার—তা-ই পেলেন ভালেরি মালার্মের কবিতায়।

যে-সুন্দরের প্রকাশের চেষ্টা মালার্মেতে, ভালেরি দেখলেন সে-সুন্দর তাঁর এতদিনের সুন্দর নয়। পরে এ-সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ভালেরি প্রশ্ন করছেন : 'সুন্দরের সংজ্ঞা? তা' তো সহজ। সুন্দর তা-ই যা মরিয়া করে তোলে। কিন্তু সেই ধরনের মরিয়া ভাবকে কে আশীর্বাদ না করে পারবে যে তোমার চোখ খুলে দেয়, তোমার ভুল ভেঙে দেয়, তোমাকে আলোকিত করে তোলে?' সেই আলোক, তা যেন এসে পড়ল তাঁর ভাঙা ভুলের সৌধ মুখর নগরীতে নতুন চলার প্রতিজ্ঞা তাঁতে জাগিয়ে, যখন ভালেরি প্রথম পড়লেন মালার্মের কবিতা।

মালার্মের একাকী জীবনের কথা বলেছি, বলেছি তাঁর বহির্জগতের সঙ্গে সংস্পর্শশূন্যতার কথা। কথাটা সত্য সাধারণভাবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো দুটি কথা বলার আছে। প্রথমত, তাঁর জীবনকালেই তাঁকে ঘিরে জুটেছিল বেশ একটি ভক্ত গোষ্ঠী, যাদের প্রত্যেকে হয়তো তাঁকে চোখে দেখে নি বা তাঁর বাড়ীতে নিয়মিত সাহিত্যিক আলাপে

যোগ দেওয়ার সুযোগ পায় নি। কিন্তু তারা সবাই যে যার নির্জন কোণে, গ্রামে বা সহরে ধীরে ধীরে জাগছিল এই বিজাতীয় রচনায়—তারা নিজেদের সকলকে না জানতে পেরেও যেন একটি গুপ্ত সম্প্রদায়ের সভ্য হচ্ছিল সবাই। যে অদৃশ্য বন্ধনে তারা সবাই সানন্দে ধরা পড়ছিল ও যা তাদেরই অজ্ঞাতে তাদের নিজেদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিল একটি মৈত্রী ও একতার চেতনা, তা সেই মালার্মের কবিতাই। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও মালার্মে এক অর্থে সমানই একাকী ছিলেন, কারণ তাঁর রচনার এমন প্রসারিত প্রভাব যে ঘটছে অন্য বহু হৃদয়ের মধ্যে, এ সম্বন্ধে তিনি সব সময় হয়তো ততটা অবগত ছিলেন না। এবং যে যে ক্ষেত্রে অবগত ছিলেন, যাদের কয়েকজনকে চিনেছিলেন তাঁর অনুরাগী বলে, তাদের তাঁর প্রতি এক আন্তরিক নৈকট্যেও বড় একটা বিচলিত তিনি কখনো বোধ করেন নি। অর্থাৎ তাঁর নির্বিকারের ভাবটা বজায় ছিল অক্ষুণ্ণভাবে।

তাঁর নির্জনতার প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথাটি তাঁর নিন্দুকদের সম্পর্কে। সেই নিন্দুকদের মধ্যে শুধু তারাই ছিল না যারা কাব্যকে আয়াসের বস্তু বলে জেনে এসেছে, তার মধ্যে চিরকাল সহজকে, তুচ্ছকে খুঁজে বেড়িয়েছে। এই নিন্দুকদের শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন সেকালের অনেক জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবিও, যাঁরা মালার্মের কবিতার দুর্বোধ্যতা সহ্য করতে পারেন নি। যেমন বলছেন ভালেরি, এমন মানুষ কদাচিতই মেলে যে বুঝতে না পারায় অপমানিত বোধ না করে, দুঃখ না পায়। বীজগণিত বুঝলাম না বা কোনো বিদেশী ভাষা শুনে বুঝলাম না, তা আলাদা কথা—কিন্তু আমার নিজের ভাষায় লেখা সাহিত্য পড়ে বুঝতে পারলাম না, এমন একটা অবস্থা সহ্য করা যায়? তাই এই নিন্দুকরা তা সহ্য করেন নি। তাঁদের অনেকেই মালার্মেকে কবি হিসেবে স্বীকার করতেও প্রস্তুত ছিলেন না। একদিক থেকে বলা যেতে পারে তাই, এদেরও অস্তিত্ব মালার্মের নির্জনতার চেতনায় উপস্থিত ছিল—যেহেতু সব লেখকই লেখেন যেমন নিজের জন্যে, তেমনি পঠিত হবার জন্যেও। যেহেতু লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তবু এখানেও, মালার্মের নির্বিকার ভাব বজায় ছিল।

শেষ ও সর্বপ্রধান কথা মালার্মে সম্বন্ধে এই: তিনিই বিশেষ করে প্রথম সৃষ্টি করলেন ফ্রান্সে দুরূহ কবি ও কবিতার একটি ঐতিহ্য। দুর্বোধ্যতা, আগেই বলেছি, কবিতার ইতিহাসে মালার্মেতেই আসেনি প্রথম—তবে যে-দুর্বোধ্যতার ঐতিহ্যের উৎস মালার্মের রচনায়, তা একটু বিশিষ্ট ধরনের। সেই ঐতিহ্য নেমে এসেছে গতকাল ও আজকের প্রবাহ ধরে

দেশদেশান্তরের কবিতায়, ও খানিকটা সেই ঐতিহ্যের ধ্বনিতে সমৃদ্ধ হতে চেয়েছে সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যেরও একটি দিক। দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই বিশেষ দুর্বোধ্যতার আলোচনা তাই সার্থক, ও সেই আলোচনার প্রয়োজনও তর্কাতীত।

যে-বিশ্লেষণশীল মন এমন মরিয়া হয়ে তার সকল প্রয়াসে শৃংখলার সন্ধানে ছুটেছে, তার সৃষ্টি সাধনার ফল স্বভাবতই শুধু দুর্বোধ্যই হবে না, সে-সাধনা অনেকাংশে প্রায় বন্ধ্যাও হতে বাধ্য। মালার্মেও বন্ধ্যের কুখ্যাতি অর্জন করেছেন, কারণ তিনি লিখেছেন সামান্যই। ভালেরির মতে, তাতে পৃথিবীর কোনো সর্বনাশই হয় নি, বরং এক দিক থেকে পরম লাভই হয়েছে। এত যা-তা' এত লোকে লিখেছে ও লিখতে থাকবে যে সেই তুচ্ছতার স্তূপের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী? থাক না মালার্মের মত দুটি একটি লোকের কবিতা নিয়ে ইতিহাস সন্তুষ্ট, যাঁরা অত্যন্ত কম লিখে গেলেন, কিন্তু যা লিখলেন তা তুচ্ছ নয়। লক্ষ লক্ষ কাঁচের মধ্যে জ্বলুক না দুটি একটি হীরকের অবিনশ্বর জ্যোতি। তাই ভালেরি বলেছেন : মালার্মেকে ওরা বললে বন্ধ্য, বললে দুর্বোধ্য, কিন্তু মালার্মে যে মহা মূল্যবান, তিনি যে সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্দোষ, তিনিই যে পেয়েছেন সকলের চেয়ে বেশী করে-সম্পূর্ণতার আস্বাদ, সবাই-এর থেকে বড় জ্ঞানী কবি তিনি, তিনিই লিখতে পেরেছেন তাঁর বিবেককে সর্বদা জাগ্রত করে, ত্যাগ করে সমস্ত সস্তা মোহ—এমন লেখক আর কে কোথায় আছেন যিনি মালার্মের মত কঠিন ও-নিষ্ঠুর হতে পেরেছেন, শুধু তাঁর পাঠকদের প্রতিই নয়, নিজের প্রতিও? আর ঐ দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধেও ভালেরি-র প্রশ্ন : কী করে মালার্মের মত লেখক সহ্য করবেন সহজে বোধ্য বা গৃহীত হতে? তাতে কি তাঁর মহান দম্ভ ব্যথিত হবে না? তাঁকে যে চাইতেই হবে তাঁর পাঠকের কাছে সেই দুঃসহ মানসিক পরিশ্রম ও সেই ক্ষুরস্য ধারার সাধনার অন্তত একটি অতি সামান্য অংশও, যে-পরিশ্রম ও যে-সাধনা তিনি নিয়ত করেছেন তাঁর লেখায়। যে-কাব্য চেয়েছে সৎকে, সেই সত্তাকে, ও যে কাব্য করেছে শুধু সৎ-এর ভান, এই দুয়ের ঐতিহাসিক বিচার পাঠককে করতেই হবে একদিন।

এই কথা, এই স্তুতি, ভালেরির, এবং এর অনেকখানি আমাদেরও। মালার্মের কোনো বিশেষ কবিতা বা গ্রন্থের আলোচনা এখানে করলাম না—শুধু যে-শৃংখলা তাঁর সর্ব রচনায় ব্যাপ্ত, তারই কথা বললাম। মালার্মে সম্বন্ধে এত বলেও ও এত মেনেও আমাদের প্রশ্ন রয়ে গেছে এই : যেমন আমাদের ভারতীয় দর্শনে, তেমনি অন্যত্রের চিন্তাধারায়,

সাহিত্য কথাটার সংজ্ঞাই হ'ল যে সে সঙ্গ দেয়, এককে নিকটে আনে অন্যের, একটি হৃদয়ের সঙ্গে আরেকটি হৃদয়ের, পাঠকের সঙ্গে লেখকের সে একটি অলৌকিক যোগ স্থাপন করে। রসকে আমাদের আলংকারিকরা বলেছেন সহৃদয় হৃদয়সংবাদী। ভারতীয় আলংকারিক দর্শনের সঙ্গে এক অন্য ধরনের ভাবে মালার্মের দর্শনের বহু সাদৃশ্য থাকলেও মালার্মের যাত্রা এক বিশিষ্ট বিপরীত দিকে এই অর্থে যে তাঁর মধ্যে সর্বদাই রয়েছে যেন এক সচেষ্ট প্রয়াস সেই সহৃদয় হৃদয়সংবাদের ব্যাপারটিকে যথা সম্ভব দুর্লভ করে তোলার—যেন পাঠককে কাছে টেনে না এনে দূরে সরিয়ে দেওয়ারই একটা দুর্দম আবেগ।

মালার্মে প্রধানত হতে চেয়েছিলেন কাব্যদার্শনিক, ও খানিকটা সেই দর্শন প্রমাণ করার জন্যই যেন তিনি কবিতাও লিখেছেন। এই সত্যটি মনে রাখলে তাঁর মাহাত্ম্য ও ত্রুটী, দুটিরই কোনো যথাযথ পরিমাপ হয়তো সম্ভব হবে। এক উজান স্রোতের যোগী মালার্মে, ও তা-ই তাঁর শেষ পরিচয়।

তাঁর রচনার আকাশ যেন এক সোনালি সুষমার দিগন্ত, ও তা দুর্বোধ্য হয়েও সুন্দর। তবু ততটা হয়তো সে-অর্থে নয় যে-অর্থে সব সুন্দরই বুদ্ধির অগম্য।

৫

জাগ্রতের যে-স্বপ্ন পল ভালেরির

একটি জায়গায়ঃ 'হে অনুরূপ আমার, তবু কী পূর্ণতর এই আমার চেয়েও।' অন্যত্রঃ 'শুধু যেন এইমাত্র চাওয়ার থাকে দেবতার কাছ হ'তে, যা উপযুক্ত মর-হৃদয়ের। তাঁদের চরণের দিকে চেয়ে জানতে হবে ঠিক কোনটি নিয়তি আমাদের। মন আমার, হোস্‌নে হোস্‌নে শাশ্বত জীবনে অভিলাষী, শুধু নিঃশেষে শেষ ক'রে কাজে লাগা সম্ভবের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে।'

প্রথমটি পল ভালেরির নিজেরই উক্তি, দ্বিতীয়টি উদ্ধৃতি একটি স্বনাম-ধন্য গ্রীক লেখকের রচনা হতে। তাঁর একটি ফোটোগ্রাফের নীচে প্রথম উক্তিটিকে ছেপে ভালেরির এক প্রকাশক বেশ একটি কৌতুকোজ্জ্বল ও দ্যোতনাময় আবেগের সৃষ্টি করেছেন। উক্তিটি যেন সেই তাঁর নিজের ছবিটিরই একটি সার্থক শিরোনামা। ছবি তাঁর, তাই নিশ্চয়ই সেটি তাঁর অন্তত অনুরূপ, তবু ছবিটির বিষয় যে-ব্যক্তিটি, সে পূর্ণতর তার নিজের থেকেও—যেন বক্তব্যটি এই। এ-কথা সত্য ও প্রযোজ্য হতে পারে নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে এক সাধারণ ভাবে, হয়তো একটু আধ্যাত্মিক অর্থে। প্রত্যেকেই তার যে যার চেষ্টা সাধনা আলস্য অর্থ-হীনতার মধ্য দিয়ে সারা জীবন হয়তো বহন করতে পারে অন্তরে অন্তরে ও তার নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞানে যা এই সব চেষ্টা সাধনা ইত্যাদির অব্যর্থ-ভাবে অতীত—অন্তর্লোকের কোন এক উদ্ভাসিত গূঢ় কোণে যে-পরি-পূর্ণতার আসনে সে জন্ম হতেই আসীন, কিন্তু যেখানে ব্যক্তিগত জীবনে সে তার সাধনার অবিমিশ্র অভাবে পোঁছাতে পারল না ও সেই পোঁছাতে না পারার সত্য গ্লানিটিকে না অনুভব ক'রেই জীবনের শেষ সূর্যাস্তটিকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হল একদিন।

এ-কথা তাই প্রযোজ্য হতে নিশ্চয়ই পারে ভালেরিরও ক্ষেত্রে—যেমন আমার ক্ষেত্রে, তোমার ক্ষেত্রে, যাকে আজো চিনি না তার ক্ষেত্রে, যাকে কোনো দিন চিনব না তারও ক্ষেত্রে। এ-কথা প্রযোজ্য ভালেরির ক্ষেত্রে আরো একটু বিশদ ও বিশেষভাবে। প্রথমেই বলা ভালো, গন্তব্যে পোঁছোতে না পারার সেই আশীর্বাদী অজ্ঞানতায় একদিন জীবনের শেষ সূর্যাস্তকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হওয়ার যে-প্রশ্নটি, তা ভালেরির বিশেষ ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না। উঠতে পারলে অভাবের অনুভব জনিত

এমন একটি উক্তি তিনি করতেই পারতেন না। এই সঙ্গে ভালেরির সম্বন্ধে কথা তাই, একেবারে গোড়াতেই, পেঁাছোতে পারার সাধনার, ও পেঁাছোতে না পারার অনির্বাণ চেতনার। কথা তাই, যেমন সাধনার, তেমনি অভাবের চেতনার, কথা জ্ঞানের ও জাগরণের, ও এক জাগ্রত অভিনিবেশের।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তা আবার এমন নতুন কি? যুগে যুগে কি এই-ভাবে অনেকেই জাগেন নি না-পাওয়ার চেতনায় ও তাই পাওয়ার সাধনায়? ভালেরির নিজেরই দেশে তাঁর মাত্র কিছু আগেই আসেন নি কি বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো—যে-বোদলেয়ারকে র‍্যাঁবো কবিদের মধ্যে প্রথম 'দ্রষ্টা' ব'লে নমস্কার জানিয়েছেন, যে-র‍্যাঁবো যেমন নিজেকে তেমনি পরবর্তী কবিদের করতে চেয়েছেন 'দ্রষ্টা', চেয়েছেন কবিতাকে কবির সজাগ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করতে, ও বলেছেন কবির এই নতুন পাওয়া সজাগ দৃষ্টিশক্তির কল্যাণেই সম্ভাবনার সূচনা আছে বিশ্বকবিতার আগামী অধ্যায়ের?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—যুগে যুগে জাগরণের চেতনা বহু মনীষীরা এনেছেন, ভালেরির মাত্র কিছু আগেই তাঁর নিজেরই দেশে এসেছেন বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো। তবে জাগ্রতের যে-স্বপ্ন ভালেরি দেখেছেন, তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র—এমন কি বোদলেয়ার-র‍্যাঁবোরও যে-ঈপ্সিত সত্য, তা হতেও ভালেরির প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট সন্দেহাতীতভাবে। এই দুই ধরনের সম-দেশিক ও প্রায় সমকালীন প্রচারিত সত্যের মধ্যে মূল বা সত্তাগত তেমন কোনো বিভেদ হয়তো ততটা নেই, বরং পরবর্তীটি অনিবার্যভাবে এসেছে পূর্বেরই সূত্র ধ'রে, কিন্তু বিভেদটি যেখানে প্রকটভাবে বর্তমান, তা এই দুই বিভিন্ন পক্ষের দুটি সাধনার আংগিকের মধ্যে।

'হে অনুরূপ আমার, তবু কী পূর্ণতর এই আমার চেয়েও'—এই প্রথম উক্তিটির আলোচনায় একটু পরেই আবার আসছি। দ্বিতীয়টি, যেটি উদ্ধৃত গ্রীক লেখকের রচনা হতে, পাওয়া যায় ভালেরির নিজের হাতে লেখা গ্রীক অক্ষরে, তাঁরই কৃত একটি চিত্রাঙ্কনের উপর। চিত্রটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন একটি উদাহরণ হিসেবে তাঁর প্রখ্যাত কবিতার—'সমাধিভূমি সিন্ধু তীরে।' তবে কবিতাটির নামের এই বাংলা অনুবাদ আমার খুব মনঃপূত নয়। মূল ফরাসীতে যে-ভাবে তা ব্যক্ত, তাতে এক অর্থে সমাধিভূমি যেমন সিন্ধুতীরে হতে পারে, তেমনি অন্য এক গভীর অর্থে সেটিকে বোঝানো যেতে পারে সৈন্ধবও ব'লে। এবং এটি, ভালেরিকে নিয়ে যত প্রশ্ন বা সমস্যা উঠতে পারে, তার মাত্র একটি। ভাষাগত কাঠামোটি ভালেরিতে এত মৌলিক যে তিনি অনুবাদে প্রায় ধরাই পড়েন

না। তাই দেখতে পাই, বিদেশী ভাষায় এই মহাকবির অনুবাদ এত সামান্য হয়েছে, এবং—যা নিয়ে টি, এস, এলিয়টও খেদ করেছেন—তিনি এমন অন্যায় ও এত সামান্যভাবে বিদিত জগতের কাছে। অযোগ্যতা নয় তাঁর প্রতি বৃহৎ জগতের এই আংশিক অবহেলার কারণ। কিন্তু এ আবার আর এক প্রশ্ন, ও যার আলোচনা এখানে হবে অবান্তর।

ফিরে আসা যাক ঐ দুটি উক্তি উদ্ধৃতিতে। এ-দুটিকে এই নিবন্ধের গোড়াতেই রেখে আমার যাত্রা সুরু করার কারণ এই যে উক্ত উদ্ধৃতি দুটির মধ্যে বিধৃত রয়েছে ভালেরির সাধনার শেষ বক্তব্যটি, যেমন ক'রে বীজের মধ্যে বিধৃত থাকে গাছ, বিন্দুর মধ্যে সমুদ্র। যদি বললাম বীজের মধ্যে গাছ বা বিন্দুর মধ্যে সমুদ্র তো বলা বাহুল্য তা আয়তনের প্রসঙ্গে নয়, তাদের আত্মার একতার প্রসঙ্গে। সেই অর্থে, গোড়ার ঐ উক্তি উদ্ধৃতি দুটিতে ভালেরির সাধনার আত্মাটি ধরা আছে। প্রথমটি যদি মন্দির হয়, দ্বিতীয়টি মন্দিরে পৌঁছানোর পথ।

কেন? কী ক'রে? সেই প্রশ্নেই আসছি। কিন্তু তার আগে ভালেরির নাম করা মাত্রই এটুকুও মনে না ক'রে পারছি না, যেমন এক বিচিত্র নৈকট্য তাঁর সঙ্গে আজ আমাদের, অন্যদিকে তেমনি আমাদের কাল হতে এক অভাবনীয় দূরত্বজনিত আবছা দৃষ্টির আলোয় যেন মণ্ডিত তাঁর স্মৃতি ও মহিমা। ১৯৪৫-এর ২০শে জুলাই ভালেরি যখন মারা যান, তৎকালীন দ্য গোল সরকার তাঁর শবযাত্রাকে দেন জাতীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান—ঠিক তার কিছু আগেই নাৎসীদের হাত হতে পারীর পুনরুদ্ধার তিনি দেখে যেতে পারেন। আজ সেই দ্য গোল আবার ফিরে এসেছেন ফ্রান্সের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এক আত্মঘাতী ঘরোয়া যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রতি তাঁর একটি জীবনের মধ্যে ফ্রান্সের ইতিহাসকে বহু দূরে টেনে নিয়ে গেছেন। কিন্তু দ্য গোল সেই একই, ও পারীর পুনরুদ্ধার যেন মাত্র সেদিনকার ঘটনা। ভালেরি ছিলেন, এই কিছুদিন আগেও—আমাদের সঙ্গে তাঁর এই নৈকট্যটি সত্য। নৈকট্যটি শুধু ক্যালেণ্ডারের নয়, নৈকট্য কালের এক গভীরতর অর্থেরও। এবং সেই নৈকট্যটিই—যা কালধর্মের—মূল্যবান। যে-দুটি মহাযুদ্ধ এই শতাব্দীর প্রথমার্ধটিকে একটি বিশেষ নাম দিয়েছে, মানুষের চিরাচরিত চিন্তার ধারাটিকেই যেন পাল্টে দিয়েছে, যেন প্রাক যুদ্ধের মানুষ যুদ্ধোত্তরের বংশধরকে চিনতে পারছে না, যেন যুদ্ধোত্তর প্রাক যুদ্ধকে বলছে আমরা এক লোকবাসী নই—সেই দুটি মহাযুদ্ধই দেখে গেছেন পল ভালেরি। দ্বিতীয়টি যদিও জীবনের সায়ংকালে, প্রথমটিকে তিনি দেখতে

পেরেছেন মধ্যাহ্নেই। এক দিক দিয়ে, একই লোকের অধিবাসী তিনি ও আমরা।

তবু যেন কত দূরে। কাব্য তাঁকে ছেড়ে এগিয়েছে অনেক দূর—এগোনোর অর্থ এখানে আগে যাওয়া নয়, আরো দূর চ'লে যাওয়া। ভালেরির বক্তব্যের অনেক খুঁটিনাটির ধ্বনি ইতিমধ্যেই ক্ষীণ—তাঁর শিষ্য তেমন ছিল না কেউ, কারণ তাঁর ধারা যে ক্ষুরস্য, বিধুর বন্ধুর পথ একলা চলার তাঁর। তবু তাঁর কাব্য ও বক্তব্য একদিন বাইরের জগৎটাকে যেভাবে নাড়া দিতে পেরেছিল, আজ যেন আর পারে না সেভাবে। আজ যেন অন্যত্র রয়েছে আমন্ত্রণ নাড়া খাওয়ার বা নাড়া দেওয়ার। এবং সেটাই স্বাভাবিক—যে-খেলাঘরে ছেলেবেলায় আমি খেলেছি, আমার ছেলে হয়তো সেখানে খেলতে চাইবে না, হয়তো সে চাইবে না সেই একই পুতুল, সেই একই প্রেম।

এ ছাড়াও ভালেরির ও আমাদের মধ্যে দূরত্বটি সত্য অন্যভাবেও। আমার মনে হয়, ভালেরির কৃচ্ছ্রসাধনার বৈশিষ্ট্যটিই এমন যে তার সকল পরিচিতকে, সকল পরিচয়কে, সে ইচ্ছা ক'রে নিজ হতে বহুদূরে রাখতে চেয়েছে এক নির্মম নির্ভীক আন্তরিকতার সঙ্গে। সে ভাবে দেখলে, তাঁর দূরত্বটি শুধু আজকেরই সত্য নয় আমাদের এই প্রসঙ্গে। সে-দূরত্ব তাঁর সত্য কাল ও পাত্র নির্বিশেষে। এখানে আমার যা প্রচেষ্টা, তা তাঁর সেই কৃচ্ছ্রসাধনার স্বরূপটি দেখার। আমাদের সঙ্গে তাঁর যে-অনিবার্য দূরত্ব, যে-দূরত্ব নিশ্চয়ই শুধু কালগতই নয়, এক হিসাবে সেই দূরত্ব এখানে হয়তো আশীর্বাদ—হয়তো তা তাঁকে দেখতে সাহায্য করবে। খুব কাছে—অন্তরের কাছে বা চাক্ষুষ দৃষ্টির অতি অল্প ব্যবধানে থাকলে ভাল ক'রে দেখা যায়, না দ্রষ্টব্যের দেহ, না তার আত্মা। এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে শিষ্য না পাওয়ার যে-অযোগ্যতা তা ভালেরির, বরং সে-অযোগ্যতা তাদেরই যারা হতে পারল না শিষ্য। অবশ্য শিষ্য না হয়েও বা না হতে পেরেও নমস্কার করা চলে, ও তা-ই করছি। আর স্বরূপ দেখতে চাওয়া, তাই তো নমস্কারের রাজপথ।

প্রথমে বলেছি এক নিজেই অনুরূপ অথচ যা নিজের থেকে পূর্ণতর, তার কথা। জানি না অন্য কেউ ভালেরিকে এ-ভাবে আগে দেখতে চেয়েছেন কি না, তবে আমার মনে হয় ঐ উক্তিটির মধ্যে ভালেরির যে-প্রচ্ছন্ন বক্তব্যটি, তা হচ্ছে যে-সত্তা আমার ও যার অনুরূপ জ্যোতি আমার চোখে-মুখে-দেহে, আমার বহিরাকৃতি যার অনুরূপ, তার পূর্ণতার অভাব আমার বাঁচায়, চিন্তায়, প্রয়াসে, তাকে তার পূর্ণতায় সম্পূর্ণভাবে

আয়ত্ত করাতেই আমার সিদ্ধি, ও তা-ই আমার একমাত্র গন্তব্য। এবং যেহেতু তা আমার নিজেরই অন্তর্লীন পূর্ণতা, যদিও আমার বহিঃপ্রকাশে আজ তার অক্ষম অভাব, তা আমার সম্ভাবনার সীমার বাইরে নয়। তা-ই প্রশ্ন, সম্ভবের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে নিঃশেষে শেষ ক'রে কাজে লাগানোর। যদি না পেলাম, নাই বা পেলাম শাশ্বত জীবনে অধিকার—আসলে হয়তো শাশ্বত কোনো জীবনই নেই, যদি সে জীবনকে চাইতেই হয় অসম্ভবকে। পরম মুক্তি তাই, ভালেরির মতে, নিহিত আছে সম্ভাবনার ক্ষেত্রতেই—শুধু তাকে স্বীয় সাধনায় ও অর্জিত বিজ্ঞানে জয় ক'রে নিতে হবে। তাই অনুরূপের বিষয়ে ভালেরির নিজের যে-উক্তিটি ও গ্রীক লেখকের রচনা হ'তে তাঁর চিত্রাঙ্কনের উপর মুদ্রিত যে-উদ্ধৃতিটি, তারা পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত।

আমার মনে হয়, ঐ অনুরূপের প্রসঙ্গটিকে আমি যে-ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি, তার সাড়া মেলে ভালেরির কবিতায় ও অন্যান্য গদ্য রচনায়। একটি-দুটির সহজ বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া যাক। প্রথমেই মনে আসছে একটি বিশিষ্ট কবিতা, ভালেরির স্বাভাবিক শুদ্ধ বুদ্ধি ও শৃঙ্খলার সাধনার হীরকদ্যুতি তাতেও—কিন্তু আমি এখানে অনুবাদ করছি গদ্যাকারে, অতি সাধারণভাবে, শুধু তার অন্তর্নিহিত মূল ভাবটিকে দেখাতে চেয়ে। কবিতাটি ছোট, ও তার নাম 'পদক্ষেপ'। বলছেন ভালেরিঃ

স্থীরে, ধীরে, যে-একটির পর
একটি তোমার পা ফেলা,
তারা শিশু আমার নিঃশব্দের,
মূক, তুহিনশীতল গতি তাদের
আমার যে শয্যা সতর্ক জাগরণের,
তার দিকে।
সে-দেহ পূত, সে ছায়া ঐশী,
কী সুখস্পর্শ তাদের, ঐ
তোমার সংযমী পদক্ষেপের।
দেবি।......যত শক্তি
শুধু ছিল মাত্র কল্পনায়, অনুমানে,
ঐ নগ্ন পা দুটির ছন্দ ধ'রে
এল তারা কাছে, হ'ল
আমার।

সেই যে-অধিবাসী আমার চিন্তার,
দিতে যদি চাও তাকে
খাদ্য একটি চুম্বনের,
যদি প্রস্তুত হও, ঐ দুটি উদ্যত
ঠোঁটে তোমার, তাকে শান্ত করতে,
আদরের ঐ ক্রিয়াটুকুতে ক'রো না
ত্বরা, মধুর সে-চেতনা যা'
একই সঙ্গে হওয়ার ও না-হওয়ার,
কারণ তোমারই প্রতীক্ষা
আমায় বাঁচায়, আর কী বলো
তো সেই আমার হৃদয়
যদি সে নয় তোমারই পদক্ষেপ?

এখানে, বলা বাহুল্য, কবি ও কবিতা একাত্ম। আমার হৃদয় তোমারই পদক্ষেপ। কিন্তু কেন মূক, তুহিনশীতল গতি সেই পদক্ষেপের? কারণ এখানে একটি আবছা ইংগিত আছে রাত্রির, যখন প্রেরণা এসেছে প্রেমিকার রূপ ধ'রে লুকিয়ে লুকিয়ে। সে যেন এসে ধীরে ধীরে ধাক্কা মারছে কবির অন্তরদ্বারে। কিন্তু সংযমী কবির প্রেরণাও আসে সংযত পা ফেলে—তবু তা' সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রেরণাকে প্রস্তুত করাতে চান না তাঁকে চুম্বন করতে। তাঁর চিন্তার যে-অধিবাসী, সে তিনি নিজেই—তাঁর হতেও সেই পূর্ণতর ও যার অনুরূপ তিনি, ও যাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করাতেই তিনি অর্জন করবেন সার্থকতা। কিন্তু প্রেরণার দানকে মুহূর্তে-মুহূর্তে গ্রহণ ক'রে নিতে তিনি প্রস্তুত নন, যদিও তিনি মানেন যে যত শক্তি তিনি পেতে চেয়েছেন তা এসে তাঁর মুঠোর মধ্যে ধরা দেয় ঐ দুটি নগ্ন পায়ের ছন্দ ধ'রেই। তাই যদিও প্রেমিকা প্রেরণার একটির পর একটি পা ফেলা যেন শিশু তাঁরই নিঃশব্দের, তাঁর যে শয্যাটি, সেটি সতর্ক জাগরণের। তাই প্রেমিকার চুম্বনকে ফিরিয়ে দেওয়ায় যে না-হওয়ার স্বাদ, তার মধ্যেও রয়েছে কবির হওয়ার চেতনা। বক্তব্য যা প্রচ্ছন্ন এখানে, তা হচ্ছে শৃংখলার কথা কবিতায়, একমাত্র যে-শৃংখলার রীতিকে মেনেই কবির পক্ষে সম্পূর্ণ জাগ্রত চিত্তে লেখা চলতে পারে, প্রকাশ করতে সেই নিহিত পূর্ণতরকে যার অনুরূপ কবি নিজেই ও না চেষ্টা ক'রেই। তাই প্রশ্ন সম্ভবের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে নিঃশেষে শেষ ক'রে কাজে লাগানোর, প্রশ্ন শৃংখলার, প্রশ্ন আত্মনিয়ন্ত্রণের ও প্রয়াসের, প্রশ্ন জাগ্রত হওয়ার ও জাগরণের।

অবশ্য এখানে এও বলা উচিত, কবি তাঁর কবিতার সম্বন্ধে যা প্রতিপাদ্য ব'লে প্রমাণ করতে চান অন্যত্র, তাকে সরাসরি তাঁর কবিতার মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিভাত ব'লে দেখানোর প্রাণপণ প্রয়াসের মধ্যে একটি গূঢ় বিপদের সম্ভাবনা সবক্ষেত্রেই থাকতে পারে। মালার্মে'র, যিনি ভালেরির পূজ্যপাদ গুরুদেব, ক্ষেত্রে তো এই রকম প্রয়াস একেবারেই ফলপ্রসূ হয় নি। দর্শন ও কবিতা ঠিক এক বস্তু নয়—তাদের পরস্পরের মধ্যে অজস্র মিল হয়তো থাকতে পারে, একই কবি হতে পারেন দার্শনিকও, ও সমস্ত যথার্থ কবিই যে দার্শনিক এমন মতবাদও শোনা গেছে, এবং এই ধরনের মতবাদের মধ্যে সত্য যে নেই তাও নয়, তবু কবির ও দার্শ-নিকের প্রকাশধর্মী পথ বিভিন্ন। এখানে আমারও বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ভালেরির কবিতা ও কাব্যদর্শনকে একেবারে একাত্ম ব'লে প্রমাণ করার। তবে হয়তো একটু চেষ্টা করলে যে-স্থির সরলরেখার স্বচ্ছ গতিটি তাঁর দর্শনে উদ্ভাসিত দেখা যায়, তাকে একটু ঊনিশ-বিশ এদিক-ওদিকের এখানে-ওখানে অতি সূক্ষ্মভাবে বক্র অবস্থায় ধরা যেতে পারে তাঁর কবিতাতে। এবং উপরিউক্ত কবিতায় প্রেমিকা প্রেরণার প্রসঙ্গে এটুকুও আমার মনে হয় যে যেহেতু মালার্মে-ভালেরি প্রমুখ কবিদের চিরাচরিত প্রেরণা সম্পর্কে অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত, যখন এই সমস্ত কবি তাঁদের নিজের নিজের প্রেরণার কথা বলেছেন তাঁদের কবিতায় বা অন্যত্র, তখন সেই প্রেরণাকে বুঝতে হবে একটি অতি বিশেষ অর্থে। সে-প্রেরণাও তখন আসে কবির স্বোপার্জিত সংযমের বশবর্তী হয়ে।

এই প্রসঙ্গে মনে আসছে ভালেরির আরো একটি কবিতা, এবং এখানেও প্রশ্ন পদক্ষেপের। কবিতাটি হ'ল 'প্রভাত', ৭ তার প্রথম স্তবকটির সহজ বাংলা অনুবাদ দিচ্ছি। অনুবাদ যথাযথ, কেবল মূলের ছন্দটি, ও তা অনেকখানি ভালেরির ক্ষেত্রে, ধরার চেষ্টা এখানে নেই।

যে-বিভ্রম মূঢ় বিষণ্নতায়
আমায় জোগাত ঘুম,
ঐ পালায় যে-মুহূর্তে
গোলাপী আভার সূর্য
জাগে।
মনে মনে আমিও এগোই
বিস্তার ক'রে পাখনা প্রত্যয়েরঃ
সেই প্রথম উচ্চারণ মন্ত্রের।
বালু হতে বেরোতে না

বেরোতেই কী চমৎকার
ফেলছি আমি পা,
যে-পদক্ষেপ
আমারই জাগ্রত যুক্তির।

'পদক্ষেপ' কবিতাটিতে যে-প্রেরণা প্রেমিকা, যার মূক, তুহিনশীতল পা ফেলা রাত্রে, এখানে সে আরো স্পষ্ট ক'রে—হয়তো 'প্রভাতের' জন্যেই, হয়তো ঘুমের রাত্রির শেষে সূর্যের গোলাপী আভায় আবার জেগে ওঠারই কারণে—সোজাসুজি রূপ নিয়েছে কবির প্রত্যয়ের। এখন পা ফেলছি আমি আমার যুক্তিতেই, সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে, নিজেকে নিজের বশ ক'রে, এবং কী চমৎকার সেই পা ফেলা—এ-কথা বলতেই মুখর কবি। আমার মনে হয়, এ-দুটি কবিতার মধ্যে পার্থক্যটি শুধু আপাত, ও এখানে রাত্রি-প্রভাত জনিত দুটি বিভিন্ন মনের অবস্থার প্রসঙ্গ অবান্তর। আসলে প্রথম কবিতাটিতে যাকে কবি প্রেরণা হিসাবে দেখেছেন, দ্বিতীয়টিতে তা-ই দাঁড়িয়েছে প্রত্যয় হ'য়ে।

কিন্তু কবিতায় যে-বক্তব্য স্বচ্ছ নয়—এবং সেখানে সে স্বচ্ছ নয় ব'লেই কবিতার মাহাত্ম্য—সে-বক্তব্য অতি পরিষ্কার তাঁর গদ্যে। কাব্য প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এক প্রবন্ধে বলেছেন ভালেরিঃ 'সত্যকারের কবির যে-বৈশিষ্ট্যটি সত্যকারের, সেটি হচ্ছে যে সেই কবির ক্ষেত্রে স্বপ্নের অবস্থাটি অতি ভিন্ন। তার মধ্যে আমি যা' দেখতে পাই, তা' শুধু স্বেচ্ছাকৃত অনুশীলন, চিন্তার আশ্চর্য ক্ষমতা নমনীয় হওয়ার, চিত্তের সম্মতি অতি তীব্র ও অনবদ্য যন্ত্রণা সহ্য করার, ও আত্মত্যাগের অবিশ্রান্ত জয়। যে চায় তার স্বপ্নকে লিখতে, তাকে হতেই হবে অপরিমেয়ভাবে জাগ্রত। যদি তুমি চাও ঠিক ঠিক ভাবে অনুকরণ করতে সেই অবাস্তব অদ্ভুত অবস্থার খুঁটিনাটি, নিজের প্রতি সেই বিশ্বাসহীনতাগুলি কিছুক্ষণ আগের তোমার দুর্বল নিদ্রায়, যদি চাও তুমি তোমার গভীরতায় অনুসরণ করতে চিত্তের সেই ভাবুক পতনটি, যেন সে হারানো ঝরা পাতা ধূসর স্মৃতির অস্পষ্ট অসীমতায়, তবে ভেবো না অতি সহজেই তা' সম্ভব হবে। সেই প্রচেষ্টায় তোমার সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে তখনই যখন তোমার একাগ্রতা হবে প্রাণপণের। মহৎ সৃষ্টির যে-বিস্ময়, তা সম্ভব হেন পরিশ্রমেই। যেই বলেছ যথাযথতা, যেই বলেছ রীতি, তুমি আবাহন জানালে স্বপ্নের বিপরীতকে। যে-রচনায় পাবে সেই যথাযথতা ও রীতি, বুঝবে তার লেখককে সহ্য করতে হয়েছে কত না যন্ত্রণা, নষ্ট করতে হয়েছে কত না মুহূর্ত যাতে তার চিন্তার চিরঞ্জীব ছত্রভঙ্গতায় বিক্ষুব্ধ না হয় তার

লেখা। সব চিন্তাই, যত মনোহরই হোক না তারা বা হোক অন্য রকমের, তারা সবাই ছায়ার মত—এবং এখানে ছায়ারাই আগে আসে শরীরীদের চেয়ে। এ আগুন নিয়ে খেলা, কখনো কখনো নয়, অলসের, যে-খেলা চিত্তের স্বাভাবিক গতিশীলতা হ'তে ধ'রে রাখতে চায় ভাবের ক্ষণিকের যে-স্থিতি ও স্বচ্ছতা, যে-খেলা চায় ভাবের একটুখানি করুণাকে স্থায়ী করতে। যা কেবলি চ'লে যাচ্ছে বদলে বদলে, তাকে সে দাঁড় করিয়ে ধরতে চায়। এবং যতই পলাতক ও অস্থিরচিত্ত হবে শিকারের বস্তুটি, ততই দরকার ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার, যাতে সেই শিকারের কেবলি পলাতক ভঙ্গীটি ধরা পড়তে পারে এক চিরস্থায়ী বর্তমানে।'

একটু দীর্ঘ হ'লেও উদ্ধৃতিটি প্রাঞ্জল, ও তা দেখায় পরিষ্কার ক'রে ভালেরির মতে সম্ভবের সীমাটি বিস্তৃত হতে পারে কতদূর এবং সেই সম্ভবের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে চাষ করার প্রয়োজনীয়তা কেন ও কোথায়। এবং এও স্পষ্ট এই উদ্ধৃতিতে, ভালেরির কাছে কোনটি সেই 'পূর্ণতর', যার অপূর্ণ অনুরূপ তিনি স্বয়ং, এবং যাকে অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য তাঁর কবিতার। সম্ভবের ক্ষেত্রটির চাষ হয়ে দাঁড়ায় শেষ অর্থে নিজেরই অন্তরের অতলান্ত গভীরতার চাষ। কারণ সেই গভীরতার অন্তরেই রয়েছে পূর্ণ বুদ্ধি, চিন্তার স্থায়ী শুদ্ধ জ্যোতিতে। বহির্জগতের যত অস্থায়ী প্রলেপ পড়ছে তার ওপর ক্রমাগতই, তাদের জাগ্রত বুদ্ধির রশ্মিতে বিদ্ধ ক'রে দিতে হবে একটি স্থায়ীর চেতনা, কারণ তারা সম্পর্কযুক্ত অন্তরের পূর্ণের সঙ্গে। ভালেরির বক্তব্যের এ-ব্যাখ্যা আগে কেউ দিয়েছেন কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এমন একটি ব্যাখ্যা হবে সমীচীন।

কী অর্থ তাঁর কবিতার, এ নিয়ে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন। ভালেরি স্বয়ংও দুয়েকটি কথা বলেছেন এই সম্বন্ধে। এক জায়গায় বলেছেনঃ 'আমার কবিতার সেই অর্থ, যে-অর্থ তুমি তাকে দেবে। যে-অর্থটি আমি তাকে দিতে চাই, সেটি আমার নিজেরই, ও তার সত্যাসত্য গ্রহণ করতে আমি বাধ্য করব না কাউকে। যারা ভাবে যে প্রত্যেক কবিতারই আছে একটি মাত্র অর্থ, যে-একমাত্র অর্থটিই সত্য, যথার্থ ও যা দেওয়া তার কবির, তাদের ভুলটি সাংঘাতিক, ও কোনো কবিতা সম্বন্ধে এ-রকম ভাবতে চাওয়া সমগ্র কবিতার প্রকৃতির বিরুদ্ধেই যায়। এই রকম ভুলের একটি ফল দেখতে পাই সেই উদ্ভট অথচ পাণ্ডিত্য প্রয়াসের সূচনায় যা কবিতাকে লিখতে চায় গদ্যে। এবং এমন চাওয়ার অর্থই হ'ল এই যে কবিতার সম্বন্ধে চরম সাংঘাতিক ভুল না ক'রে পারবে না এই মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি যেন বলতে চায় যে কবিতার আত্মাকে টুকরো

টুকরো ক'রে ভাগ করা যেতে পারে, ও সেই টুকরো টুকরোর মধ্যে কবিতা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাচতে পারে। যেন গদ্যের যে-সারবস্তুটি, সেটিরই একটি অপ্রাকৃত ও আকস্মিক ফল হ'ল কবিতা—এমন বিশ্বাস করতে চায় ঐ ধরনের মনোবৃত্তি। কিন্তু কবিতা যে বেঁচে আছে শুধু তাদেরই জন্যে, যারা এমন একটি প্রয়াসকে অসম্ভব এবং গোড়া হতেই ব্যর্থ ব'লে জানে, ও এমন একটি প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হওয়া কবিতার পক্ষে হবে একটি অসাধ্যতা, তাও যারা জানে। অন্য যারা, তারা কবিতার বোদ্ধা ব'লে নিজেদের জাহির করে ও কবিতাকে দিতে চায় এমন একটি ভাষা ও প্রকাশ যা আর যাই হোক কাব্যিক নয়।'

এখানে আমার নিশ্চয়ই মনে হয় না যে যাকে আমরা এই ভারতে উপনিষদের যুগ হতে গদ্য-কবিতা ব'লে চিনতে শিখেছি ও যে-গদ্য কবিতার অতি উৎকৃষ্ট রূপ নানাভাবে নানা দেশের প্রকাশধর্মী প্রয়াসে দেখেছি যুগে যুগে ও বিশেষত সম্প্রতিকালের সাহিত্যে, ও যার মধ্যে দিয়ে অমরতা অর্জন করেছেন তাঁরই দেশের কয়েকজন স্বনামধন্য পূর্বসূরি (বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবো বিশেষ ক'রে), সেই গদ্য কবিতার প্রতি ভালেরির কোনো বলবার মত বিরুদ্ধতা কখনো ছিল। হয়তো যার বিরুদ্ধে তিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, তা' কবিতায় গদ্যময়তা। একমাত্র ছন্দ, যতি বা মিলের আলিঙ্গনেই কবিতার আত্মা ধরা পড়তে পারে, এমন প্রতিপাদ্য আমি মনে করি না তাঁর ছিল। অবশ্য সারা জীবন তিনি কবিতা লিখেছেন ছন্দে, চিরাচরিত রীতির অনুযায়ী হয়েই, চিরাচরিতকে নমস্কার করার জন্যে নয়, চিরাচরিত রীতিতে না লেখা হ'লে কবিতা হয় না, এমন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, কিন্তু অন্য একটি কারণে। এবং সেই কারণটি জড়িত তাঁর সাধনার ধারার সঙ্গে। ছন্দ কবিকে দেয় একটি বন্ধন ও তাঁকে বাঁধে একটি শৃঙ্খলায়, যে-বাহ্যিক ও নিতান্ত আকারগত শৃঙ্খলাটি গভীরের অন্য এক অন্তর্গত শৃঙ্খলাকে কবিতায় ধ'রে রাখতে সাহায্য করে।

এ-প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যটা কতকটা এই রকমের। একটি কঠিন, কঠোর ও নির্মম যে-ছন্দপ্রণালী, তার দাবী কবির উপর অনেক। প্রথমেই তো সে কবিকে এমন একটি প্রকাশ দিতে চায় যা প্রাকৃত ভাষার বিরুদ্ধে, ও যার সঙ্গে দৈনন্দিনের ও সাধারণের জগতে আমরা পরিচিত নই। যে-এমন এক ধরনের ভাষা বা প্রকাশ. যাকে সহজভাবে স্বীকার ক'রে নিতে স্বভাবতই একটু বাধ বাধ ঠেকে, তা যেন ধাক্কা দেয় অন্তরে, বলে দ্যাখো, আমি এসেছি। যে-ভাষার সঙ্গে পরিচয় হাতেনাতের ও যা

কার্যকরী মুহূর্তে মুহূর্তে, তা কখনো নিজেকে জাহির করে না ঐ ভাবে। তাকে মন গ্রহণ ও ব্যবহার করে কোনো প্রশ্ন না ক'রে। কিন্তু এই যে-ভাষা ছন্দের, এ আমাদের কাছে বিদেশী, আমাদের সাধারণ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সে কান দেয় না। এবং তার মাহাত্ম্যই এই যে তাকে মনে হয় আধপাগলার মত, কারণ যে-অর্থে বাহ্যিক জগতের অন্য সব অর্থপূর্ণ, সে-অর্থে তাকে খুবই ঠেকতে পারে অর্থহীন ব'লে। ও শুধু আধ-পাগলার মতই সে নয়, সে জাগায় আমাদের এক ধরনের বিদ্রোহের ভাবে। এই জাগরিত করার ক্ষমতাটি যদি তার না থাকত তো সে হ'ত ব্যর্থ, এমন কি উদ্ভটও। তার দুঃসহ দাবীকে একবার যদি কেউ স্বীকার ক'রে নিতে পারে, তখন সেই মানুষের বা কবির পক্ষে আর সম্ভব হবে না যা খুশী বলা বা যা খুশী করা। তখন সেই মানুষ বা কবি তার প্রকাশধর্মী অভিনিবেশে যাই বলতে চাক না কেন, তার আগে তাকে দেখতে হবে যে সেই বক্তব্যটিকে হৃদয়ে শুধু গভীরভাবে ধারণ বা অনুধাবন করলেই চলবে না, তার নেশায় শুধু মত্ত হলেই চলবে না, এক মায়াময় ও মায়াবী মুহূর্তের দান হিসাবে তাকে গ্রহণ ক'রে তার একটি এলোমেলো প্রকাশ দিয়েই চলবে না ক্ষান্ত হাওয়া। কারণ তা-ই ক'রেই যদি ক্ষান্ত হয় সেই মানুষ বা কবি, সে শুধু করল তবে দর্পণের কাজঃ যা সে পেল বাহির থেকে, তাকে আবার বাহিরেই উজাড় ক'রে দিল। তা যেন হবে বদহজম জনিত ন্যক্কার, তাতে মহিমা নেই। আর সেই মায়াময় ও মায়াবী মুহূর্তে যা সে পেল, তা তো ইতিমধ্যেই তারই অজ্ঞাতে ও তার জাগ্রত চেতনার পূর্ণ অনুপস্থিতিতে সমাপ্ত রূপে এসে ধরা দিয়েছে তার মনে। তাকে একটি উল্টো পাক দিয়ে বাইরে আবার উদ্গার করাতে নিজের সে যেটুকু দিল, যদি কিছুই দিল নিজের, তা শুধু এক নিছক শারীরিক পরিশ্রমের সস্তা কৌশলকলা। অবশ্য ভালেরি বলছেন, চিন্তা ও ক্রিয়ার যে-অনির্বচনীয় অভেদ, তা পাওয়া যায় একমাত্র ঈশ্বরের সত্তায়। অর্থাৎ সে-ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই, যা অনির্বচনীয়ভাবে চিন্তা ও ক্রিয়াকে এক স্বতস্ফূর্ত অভিন্নতায় অর্থ দিতে পারে। কিন্তু আমরা ঈশ্বর নই, আমাদের তাই পরিশ্রমের কষ্ট সহ্য করতে হবে, সে-পরিশ্রম নিছক শারীরিক নয়, কেবল মাংসপেশীরই নয়, সে-পরিশ্রম মানসিক, এমন কি আত্মিকও। আমাদের তাই প্রথমে জানতে হবে, অত্যন্ত তিক্ত এক অভিজ্ঞতার পথে, যে চিন্তা ও ক্রিয়া দুটি ভিন্ন জিনিস। আমাদের ধাওয়া করতে হবে এমন কোনো কোনো শব্দকে যা হয়তো মিলবে না অভিধানেই এবং কোথাও কোথাও আমাদের মরিয়া হয়ে খুঁজতে হবে

ভাষা ও চিন্তার কোনো নিছক কাল্পনিক সংযোগ বা সমন্বয়। আমরা নিজেদের জিইয়ে রাখব নিজেদের নিহিত ক্ষমতায়, কখনো এক ক'রে মেলাতে চেষ্টা ক'রে শব্দ ও তার অর্থ, কখনো বা ঝমঝমে সূর্যালোকের মধ্যেই আপন ইচ্ছার শক্তিতে সৃজন ক'রে দুঃস্বপ্নের করাল রূপটিই—যে-রূপ দিতে গিয়ে হিমসিম খায় স্বপ্নদর্শক, কারণ সে প্রাণপণে শুধু বৃথাই অর্থপূর্ণতায় মেলাতে চায় দুটি স্বপ্নচারীর ছায়াকেঃ একটি ছায়া নিজেরই, অন্যটি তার স্বপ্নের। ভালেরির নিজের কথায়, 'আমাদের তাই আবেগদীপ্ত হয়ে অপেক্ষা করতে হবে, যেন ক্ষমতা থাকে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করার, ঠিক সেই সহজতার সঙ্গে যেমন ক'রে মানুষ বদলাতে পারে হাতের অস্ত্র। ও, আমাদের তাই চাইতেও হবে, চাওয়া, চাওয়া, আরো চাওয়া.........। আবার অতিরিক্ত যেন না চেয়ে বসতে হয়, তাও দেখতে হবে।'

এক কথায় তাই, এ-সাধনা স্বপ্নকে জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ করার। স্বপ্নচারীর অবস্থায় নয়, খেয়াল-খুশীর দ্বন্দ্বহীন নিরর্থকতায় নয়, আপনার সৃজন-শক্তির অধিকারটি আপনার মুঠোর মধ্যে দৃঢ় ক'রে ধ'রে বিগতকে রূপ দেওয়া, আগে তার ভিতরটা দীপ্ত ক'রে শুদ্ধ বুদ্ধি ও চিন্তার তীব্র আলোকে। কথা তাই আসে শৃঙ্খলার এবং সাধনাও হয়ে দাঁড়ায় শুধু শৃঙ্খলারই, আত্মসংযমের, কারণ একমাত্র সেই শৃঙ্খলার যথার্থ সাধনাতেই পাওয়া যাবে অলৌকিক, ও তাই অপ্রাকৃত, ক্ষমতা। কী লিখছি তা আর বড় হবে না, বড় হবে কেমন ক'রে লিখছি তা। ভালেরির এই সাধনার স্বরূপটি আরো ভালো ক'রে বুঝতে গেলে জানতে হবে তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে এই সাধনার ক্রমবিকাশ ঘটে।

পল ভালেরি যখন জীবিত ও তাঁর পূর্ণ ক্ষমতায়, তাঁর প্রতিবেশীরা জানতেন তাঁর সেই স্বেচ্ছাকৃত ও সম্পূর্ণ স্বনির্দিষ্ট পরিশ্রমের ক্ষমতার কথা। কারুরই অজানা ছিল না যে কবি শয্যা ছাড়তেন ভোরেরও বহু আগে, নিজেই তৈরি করতেন তাঁর কফি, ও অবিলম্বে লিখতে বসতেন। টেবিলের আশে পাশে থাকত কয়েকটি অনিবার্য সঙ্গী, বই ও কাগজ, ও যাদের তিনি নাম দিয়েছিলেন তাঁর কবিতার কারখানা। অথচ তিনি এমন কিছু বেশি লিখে যান নি, একটি গ্রন্থেই ধরতে পারে তাঁর সমস্ত কবিতার সঞ্চয়ন, যার সবই তাঁর অনুধ্যায়ী চিন্তার পরিশ্রমের ফল। নিজের ইচ্ছায় ও নিজের ইচ্ছাশক্তিতে লিখেছেন তিনি, ও লিখেছেন স্বভাবতই কম, তাঁর সেই ক্ষুদ্র আয়তনের রচনা হয়তো হয়নি দিক দিগন্ত প্রসারী, কিন্তু তা তার অন্তর্লীন গুণের মাহাত্ম্যে ও কারুকার্যে ছুঁতে

চেয়েছে একেবারে পরম পূর্ণতাকে।

এই অতিরিক্ত ইচ্ছাশক্তির পরিশ্রমকে সফলভাবে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার জন্যেই যেন তিনি তাঁর নিজের অর্জিত গৌরবকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন স্বচ্ছ চিত্তের এই প্রাণান্ত ব্যায়ামের উদাহরণ হিসাবে। প্রেরণার দানকে দূর হতে নমস্কার ক'রে তিনি অস্বীকার করেছেন। খুশীমত, আপন ইচ্ছার সময়ে, রচনা করেছেন মহান সৃষ্টি, অনুসরণ ক'রে একটি অব্যর্থ রীতির গতিকে। প্রেরণার দাস যে-কবি ও কবিতা, ও তথাকথিত গীতি কাব্য যা', তার বিরুদ্ধে বহু অবকাশে জোর গলায় বলতে গিয়ে তাঁর মহামূল্য সময়ের অনেকখানি নষ্টও করেছেন আনন্দে। প্রেরণার দাস যেন এক ধরনের পৌত্তলিক, ও সেই পৌত্তলিকতা ভাঙার চেষ্টায় শক্তি ও সময় নষ্ট করা যেন কর্তব্যের অংগ—ভেবেছিলেন তাই। প্রেরণায় জাত যে-কবিতা উচ্ছল ও উদ্বেল, তার সম্বন্ধে তাঁর বলার ছিল না একটি প্রশংসা-সূচক বাণীও।

অবশ্য এখানে একটু ছোট কথা আছে। তিনি কি নিজেই তাঁর কাব্যিক প্রয়াসে সর্বত্র প্রেরণার হাত হতে মুক্তি পেয়েছেন, না সেই রকমের কোনো মুক্তি অন্তরে অন্তরে চেয়েছেন? পরবর্তী সমালোচকদের কেউ কেউ বলেন, কবিতা সম্ভব নয় প্রেরণার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে, এবং এ-কথা সমানই সত্য ভালেরির ক্ষেত্রেও। নইলে তিনি শুধুই হতেন এক মহান ছান্দসিক, শব্দ দিয়ে সংগীত সৃষ্টি করার এক আশ্চর্য যাদুকর, তিনি হতেন শুধু বুদ্ধিদীপ্ত ও বুদ্ধির পথের এক গবেষক মাত্র, ও বড় জোর কোনো বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তার বেশি নয়। তিনি হতেন না যথার্থ কবি, এবং তাঁর সেই স্বেচ্ছাকৃত ও স্বতস্ফূর্ত কবিতা লেখার ক্রিয়াটি তাঁর কাছে হত নিতান্তই একটি গৌণ ব্যাপার। আমার মনে হয়, প্রেরণার বিরুদ্ধে এত অজস্র সাফাই গাওয়ায় ভালেরি নিজেকে নিজেই ও তাঁর অতর্কিতে বেশ একটি মধুর ও অভিনব ছলনা ক'রে গেছেন সর্বত্র। আসলে হয়তো প্রেরণা তাঁর কবিতায় নিয়েছে এক সর্বব্যাপী রূপ, সে-ই প্রধান নটী তাঁর নাটকের। কিন্তু সে-প্রেরণাকে তিনি সাধনায় বশগত করতে পেরেছিলেন, তাকে যখন-তখন আনতে পারার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সে যেন এক সঞ্জীবনী সুরার বোতল, যাকে তিনি রাখতেন হাতের কাছে, ও তা হতে পান করতে পারতেন যখন খুশী। এ-ক্ষমতা এক অর্থে ততটা বিজ্ঞানের নয়, যতটা ইন্দ্রজালের। জ্ঞান বা বিজ্ঞান ও আর্টের দুটি বিভিন্ন স্রোতস্বিনীর মধ্যে ভালেরি হয়তো বাঁধতে পেরেছিলেন একটি সুষম ও পূর্ণ সামঞ্জস্যের সেতু। ও যেন এও বক্তব্য ছিল তাঁর যে

আর্ট যদি পেঁৗছোতে চায় সম্পূর্ণতার মন্দিরে, তাকে সহায়তা পেতেই হবে বিজ্ঞানের বিকাশদীপ্ত চেতনা হতে, এবং একই যুক্তির সূত্র ধ'রে তেমনই, জ্ঞান বা বিজ্ঞানও নিশ্চয়ই পেঁৗছোবে না তার ইষ্ট গন্তব্যে যদি সে কখনো কখনো আর্টের চিহ্নিত পথটি না নেয়। তাঁর সহজাত কবির প্রকৃতি ও পরের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের দ্বারা বৈজ্ঞানিক ও এমন কি এক ধরনের গাণিতিক নির্ভুলতার প্রতি অর্জিত প্রেম, এই দুইয়ের আশ্চর্য ও সার্থক সমন্বয়েই ভালেরির চিন্তাধারার নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেই এক বন্ধুকে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ 'দ্যাখো তো, এই ১৯১৭-তেও এখনো পর্যন্ত আমি কী জ্ঞানীর বিবেচনার সঙ্গে এগিয়েছি। ১৮৯২-তেই ঠিক ধরতে পেরেছিলাম পথ, বিশেষ ক'রে সেই পথটি যেটি হবে আমারই।'

ভালেরির জীবন বর্ণনার খানিকটা সার্থকতা এখানে থাকতে পারে ভেবে শুধু তাঁর জীবনের মূল কয়েকটি ঘটনা দিচ্ছি। সেই ঘটনাগুলির কোনো কোনোটির সঙ্গে তাঁর মানসিক ক্রমবিকাশের সম্বন্ধ অতি স্পষ্ট। জন্ম ১৮৭১-এর ৩০শে অক্টোবর ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় একটি ছোট শহরে, ও এই জন্মের সঙ্গে একদিকে যেমন তাঁর সর্ববিখ্যাত কবিতার, অন্যদিকে ১৯৪৫-এর ২০শে জুলাই তাঁর মৃত্যুর একটি গভীর সম্বন্ধ। জন্ম থেকেও জন্মস্থানেরই মাহাত্ম্য বেশী। শৈশবের এই ভূমধ্যসাগরের স্মৃতি গাঁথা ছিল তাঁর মনে মৃত্যু পর্যন্ত। জীবনকালেই তিনি এত স্বনামধন্য হয়েছিলেন যে মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ স্থান পেতে পারত পারীর পাঁতেঅঁ-তে, যেখানে ফ্রান্সের বহু মনীষী চিরনিদ্রায় সমাধিস্থ আছেন। কিন্তু ভালেরির বাসনা ছিল অন্য রকম। তিনি সমাধিস্থ হতে চান তাঁর জন্মভূমিতেই, সেই ভূমধ্যসাগরীয় তীরে, অথবা সেই সিন্ধু-তীরের সমাধিভূমিতে। তিনি সবচেয়ে পরিচিত 'সিন্ধুতীরের সমাধি-ভূমির' কবি হিসেবেই, ও সেই কবিতায় বলছেন এক জায়গায়ঃ

ঐ উচ্চে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন নিশ্চলতায়,
নিমগ্ন নিজেরি চিন্তায় নিজেই,
ও নিজেকে উপযোগী ক'রে আনে নিজের;
পূর্ণতার একটি শিরে, একটি সম্পূর্ণ
মুকুট,
আমি তোমাতে গোপন পরিবর্তন।

এমন আবেগ তাঁর সেই জন্মভূমির সমুদ্রতীর নিয়ে। কবিতাটি যখন প্রকাশ হয়, ভালেরি বল্লেনঃ 'এটি বোধ হয় আমার সেই একটিমাত্র কবিতা

যাতে আমি আমার নিজের জীবনের কিছুটা দিয়েছি।' যে-ভাবে লেখা হয় কবিতাটি, তাও আশ্চর্য। প্রথম নাকি মনে আসে শুধু নামটি। 'তারপর, সঙ্গে সঙ্গেই', বলেছেন ভালেরি, 'এল একটির পর একটি পঙ্‌ক্তি গড় গড় ক'রে, যেমন ক'রে কল খুলে দিলে জল পড়তেই থাকে, অনেকটা তেমনি। এল ধীরে ধীরে বিষয়বস্তুও। এক নিদ্রাহারা বিষণ্ণতায় জন্ম পায় প্রথম অক্ষরটি, যেটি কবিতার নাম।' জন্মভূমির সেই সমুদ্রতীরের প্রতি প্রেম ও তার স্মৃতি কী গাঢ় ছিল আজীবন, বহুর মধ্যে তার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত তাঁর এই অনবদ্য কবিতা।

শৈশব কাটিয়ে আরম্ভ হ'ল পড়াশুনা ও শেষে আইন পড়া। ইতিমধ্যে আরম্ভ কবিতা লেখারও। তবে গোড়ার দিকে সেই সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসে তৎকালীন প্রতীকবাদেরই নিঃসন্দেহ ছাপ। ছাপ পূর্বসূরি পারনাস-দেরও। মূল যাঁদের প্রভাব তখন ভালেরির উপর, তাঁরা বোদলেয়ার ও ভেরলেন। তবু তাঁর তখনকালের কবিতাতেও যেন 'একটি আগুন চিহ্নিত ও ভিন্ন।' ইতিমধ্যেই যেন প্রশ্ন আত্মবিশ্লেষণের, কথা কবির জাগ্রত বিবেকের। তাঁর তখনি জানতে চাওয়াঃ 'আমি কি আছি, না ছিলাম? আমি কি ঘুমিয়ে, না জেগে?' এই প্রাথমিক মানসিক অস্থিরতা পরে রূপ নেবে বিশিষ্ট পরিণতির, তাঁর কাব্যিক বিদগ্ধ গবেষণায়।

১৮৯০-এ পরিচয় পারীবাসী পিয়ের লুই-এর সঙ্গে, ও এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। লুই নিজেই সাহিত্যিক, ও সম্পাদক একটি পত্রিকার, যাতে তখন লিখছেন মালার্মে। মালার্মের নাম এই প্রথম শুনলেন ভালেরি, ও পরে ধীরে ধীরে লুই-এর মাধ্যমতায় মালার্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত। এই পরিচয়ে ভালেরির জীবনের স্রোতটাই যেন পালটে গেল। আরম্ভ শৃঙ্খলার সাধনার। একই সঙ্গে, মালার্মের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়ই, পরিচয় আঁদ্রে জ়িদেরও সঙ্গে, ও এই পরিচয় পরে ধীরে ধীরে পরিণত হবে আজীবন বন্ধুত্বে।

এখন, মালার্মের আশীর্বাদে, ভালেরি পেলেন নতুন জীবন। অভিনব সাধনার পথে যাত্রা সুরু, লেখা নতুন ক'রে। এই সময়ে একই সঙ্গে বেশ একটু ঝোঁক দর্শন অধ্যয়নের প্রতি। ১৮৯৫ ও ১৮৯৬-এ প্রকাশ দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধের—তাদের প্রথমটি হ'ল ইতালীয় মহর্ষি মনীষী লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চির রীতির ভূমিকা প্রসঙ্গে। দ্য ভিঞ্চির মধ্যে পেলেন ভালেরি এক যথার্থ গুরু—শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনের যে-মহান ও সার্থক সমন্বয় এই ঋষিতে, তা ভালেরিকে উদ্বুদ্ধ করে সারা জীবন ধ'রে।

১৮৯৭-এ ফরাসী সরকারের সমর বিভাগে প্রবেশার্থী হয়ে পরীক্ষা

যোগদান ও পরে আগামী তিন বছরের জন্যে সেই সরকারী চাকরীতে কালযাপন। তার পরে নিমগ্ন হওয়া গাণিতিক অধ্যয়নে—লেখা প্রায় বন্ধ, প্রকাশ বন্ধ একেবারে। ভাগ্যক্রমে আঁদ্রে জ়িদ এলেন এই সময় একটি অনুরোধ নিয়ে। তিনি প্রকাশ করার ভার নিতে চান ভালেরির যৌবনে লেখা কবিতাগুলির। কবি যেন একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিলেন। ও ভাবলেন, গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে গোটা পঞ্চাশেক পঙ্‌ক্তির একটি নতুন কবিতাও ঢুকিয়ে দেওয়া যাক। নতুন কবিতাটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রথম গ্রন্থে যায় নি, কারণ কবিতাটি মাত্র গোটা পঞ্চাশেক পঙ্‌ক্তির না হয়ে পাঁচশো পঙ্‌ক্তির হয়ে দাঁড়ায়। ও যেহেতু তা লেখার সময় ভালেরি সর্বদাই রাখেন তাঁর ততদিনে অর্জিত কঠিন শৃঙ্খলার সাধনার নজর, কবিতাটি লিখতে বহু সময় লাগে ও তা প্রকাশিত হতে পারে ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে ১৯১৭-র আগে নয়। শোনা যায়, লেখার সময় কবি নাকি অভিধানের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, একটি যথার্থ শব্দের সন্ধানে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। কবিতাটি গ্রীক পুরাণে তিনটি নিয়তি দেবীর কনিষ্ঠাটিকে নিয়ে। গ্রীকের প্রতি কবির প্রেমের পিছনেও ঐ একই কারণ। সে-কারণ হ'ল এই যে গ্রীক সাধনাতেও আছে সেই একই শৃঙ্খলার অভিনিবেশ, গাণিতিক, নির্ভুল, ও তা মহান, দৃঢ়, নিষ্কম্প।

উক্ত কবিতাটি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতায় উৎসর্গ করেন আঁদ্রে জিদকে। উৎসর্গ পত্রে লেখেনঃ 'গত বেশ কয়েক বছর ধ'রে আমি বর্জন করেছিলাম কবিতা লেখার আর্ট। এখন চেষ্টা আমার তাতে আবার নিজেকে বাধ্য করায়। বর্তমান পরিশ্রমের ফলটি তোমায় উৎসর্গ করলাম।' যেমন স্যাঁ-জন পের্সের ক্ষেত্রে, তেমনি ভালেরিরও ক্ষেত্রে, আঁদ্রে জিদ যেন আসেন তাঁদের কাছে তাঁদেরই নিয়তির ডাক শুনিয়ে, এবং এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর এই সময়োচিত আসা না ঘটলে হয়তো পের্স ও ভালেরি তাঁদের কবিতার পথে আর অগ্রসর হতেন না।

পরে, ১৯২২-এ, প্রকাশ 'কবিতার' (ফরাসীতে *Charmes*, অর্থ মায়া, কিন্তু গ্রীক অর্থে কথাটি হ'ল কবিতা ও এই নাম দিয়ে ভালেরিও বোঝাতে চেয়েছিলেন কবিতাই), আরো একটি কাব্য গ্রন্থের। 'সমাধিভূমি সিন্ধুতীরে' অন্তর্ভুক্ত এরই মধ্যে, যদিও তা ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় একটি পত্রিকায় আগে, ১৯২০-এ। কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবির খ্যাতির ব্যাপ্তি গুণী মহলে।

তাঁর গদ্য রচনাতেও ক্রমাগতই চলছিল নতুন সংযোজন। একটি বিখ্যাত

লেখা, ১৯২৩-এর, 'আত্মা ও নৃত্য।' বহুকাল কাব্য সাধনার শৃঙ্খলায় কাটিয়ে অবশেষে কবিকে আরম্ভ করতে হ'ল জাগতিক জীবন। খানিকটা খ্যাতির খাতিরে, খানিকটা সরকারী চাপে, চলাফেরা সুরু করলেন উচ্চ সমাজেব চাকচিক্যময় মন্ডলে। বাগ্মী হিসেবে খ্যাতিও পেলেন। এ-সময়ে বহু বক্তৃতা তাঁর পাঁচ খন্ডতে সংকলিত 'বিচিত্রা' গ্রন্থের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

কিছু পরে, ১৯২৫-র ১৯শে নভেম্বর, ফরাসী আকাদেমীর সদস্য নির্বাচিত হলেন। আকাদেমীর যে-আসনটি খালি ছিল আনাতোল ফ্রাঁসের মৃত্যুর পরে, সেই জায়গায়। ১৯৩৩-এ ভূমধ্যসাগরীয় এক বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরিচালকের পদ পেলেন, ১৯৩৬-এ তাঁকে নির্বাচিত করা হ'ল জাতিসঙ্ঘের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পদে। ১৯৩৭-এ পেলেন পারীর কলেজ দ্য ফ্রাঁসে কাব্যদর্শনের অধ্যাপকের পদ।

নাৎসী-অধিকৃত পারীতেও, শীতের প্রকোপ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও, কলেজ দ্য ফ্রাঁসে তাঁর অধ্যাপনা তিনি বন্ধ রাখেন নি। তাঁর শেষ গদ্য রচনা, 'আমার ফাউষ্ট', তাও সম্পন্ন করলেন এই সময়েই। ভিশি সরকারের প্রতি তাঁর প্রত্যক্ষ বিরূপতা জানিয়ে ১৯৪৩-এ নাম লেখালেন এক প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘে। এল পারীর উদ্ধারের দিন। সে-ফিরে-পাওয়া গৌরব দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর ঘটল। অবশেষে ১৯৪৫-এ মৃত্যু। আলিঙ্গন জীবনের শেষ সূর্যাস্তকে।

একটি জীবন, একটি সাধনা। তবু এমনি জীবন ও সাধনা। 'তাকে কে পড়ল না, বুঝল না? কী ভুলের শপথই সঞ্চিত মহাত্মাদের প্রতি।' —ভালেরির এই উক্তি খানিকটা প্রযোজ্য হতে পারে তাঁর নিজেরই সম্বন্ধে।। খানিকটা বললাম এই কারণে যে ভালেরি সম্পূর্ণ অপঠিত নন, অবোধ্যও নন। বরং ফরাসী কাব্যের একটি মহান দিনান্তের দিগন্তের তিনি এক অন্যতম দিকপাল। পরবর্তী বিশ্বকবিতার ধারাতে তাঁর প্রভাবও কিছু কম নয়।

তবে আজকের কবিতা যে-নানান পথে চলেছে ও ভবিষ্যতের কবিতা যে-আরো অজস্র নানা পথে এগোবে, তার সঙ্গে ভালেরির পথের দূরত্ব একটি আছে ও হয়তো থাকবেও। আমি যা চেয়েছি আমার এই বর্তমান প্রয়াসে, তা শুধু নমস্কারের একটি রূপ ধরতে। ভালেরির সাধনাকে নমস্কার করার যোগ্যতা সমস্ত যথার্থ কবিরই থাকবে। যে-কবি (বা শুধু কবিই কেন? আমাদের ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র যাঁদের সহৃদয় আখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের সকলেই) আজকের, কালকের, বা আজ হতে একশো বছর পরেরও,

তাঁদের অনেকেই এক অর্থে ভালেরির সাধনার দিকে চেয়ে হয়তো বলতে পারবেনঃ 'হে অনুরূপ আমার, তবু কী পূর্ণতর এই আমার চেয়েও।' তবে সেই এক অর্থে এই বলা হবে না ভালেরির অর্থে বলা।



লেঅঁ-পল ফার্গ

এই লোকটাকে ভারী আশ্চর্য মনে হয়, এই লেঅ-পল ফার্গকে। 'লোকটা' বললাম, তা' কোনো অসম্মানসূচক ভঙ্গীতে নয়, বরং এক শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ-সম্বোধনে। সমগ্র কবি সমাজের আত্মীয় ফার্গ, আজকের আমাদের বাংলা দেশের কবিদেরও তিনি এক অর্থে আত্মীয় তাই।

এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই যে-আত্মীয়তাটি, তা' বর্তমানের যুগ-ধর্মের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অর্থাৎ, গত শতাব্দীর শেষার্ধ হ'তে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত যে-ফরাসী কাব্য সমগ্র বিশ্বকাব্যে তার ছায়া ফেলে এসেছে, ফরাসী কবিতার সেই তাৎকালিক ক্রমবিকাশের পর্যায়ে ফার্গ একজন অতি উল্লেখযোগ্য কবি। যে-হিসেবে ফ্রান্সের বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, ভেরলেন, মালার্মে, ভালেরি এমন কি স্যাঁ-জন পের্সও আত্মীয় আমাদের ও অন্য সকলের, ঠিক সেই একই হিসেবে ফার্গও আমাদের সকলের আত্মীয়। একই ধরনের কবিতার রাজপথে তিনিও একজন নমস্য যাত্রী।

অথচ তাঁকে নমস্কার করাটা ঠিক হয়ে ওঠেনি আজ পর্যন্ত, তাঁকে আমরা চিনি নি। এ-কথা যদি শুধু সত্য হয় আমাদেরই পক্ষে তো তাতে তেমন ক্ষতি হয়তো নেই। কখনো-কখনো নমস্কারের মুহূর্ত আসে অতি ধীর পদক্ষেপে, অত্যন্ত দেরী ক'রে। কিন্তু একবার যখন সে এল, তখন নমস্কার করতে না পারার যে-গ্লানি সঞ্চিত হয়ে ছিল বহুদিন ধ'রে, তা' নিমেষের মধ্যে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যায়। আর না চিনতে পারার প্রশ্নটা? বিদেশী কবিতার কতটুকুই বা আমরা চিনে উঠতে পেরেছি? এবং না চিনতে পেরে ওঠার সেই দোষটাও আমাদের নয়। বহু শতাব্দী ধ'রে আমরা বদ্ধ ছিলাম, বন্দী ছিলাম, গেঁয়ো ছিলাম—আমাদের প্রাক-ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বা কাব্যে সর্বত্র (এক বোধ হয় বৈষ্ণব কবিতা বাদ দিয়ে) যে-অলস অবশ সারল্য ছিল, তার আর যাই থাকুক, মহিমা ছিল না। এদিকে বাইরের বৃহৎ জগতটা তার নানাবিধ বস্তুমুখী প্রয়াসে ও তার বহুমুখী অন্তর প্রকাশের পথে (শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে, বলা বাহুল্য) এগিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর। সেই বাহ্যিক জগতটার সঙ্গে আমাদের একটা প্রথম রাখী-বন্ধন ঘটল, যখন ইংরেজরা এলেন ভারতে। ইংরেজী সাহিত্যের জ্ঞান এল আমাদের আংশিক মুক্তিদাতা হয়ে, কিন্তু অন্যান্য বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা সমানই অজ্ঞ রয়ে গেলাম। আজো সেই

প্রকাণ্ড প্রচণ্ড অজ্ঞতাটার যে বিশেষ কিছু ঘাটতি ঘটেছে, তা নয়। তবে সম্প্রতি, বিশেষ ক'রে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হতে, দেশে যেন একটা নতুন হাওয়া এসেছে। নানান প্রাদেশিক সাহিত্যে, ও হয়তো অত্যন্ত বিশেষ ক'রে বাংলায়, বহু বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান, মার্কিন, রুশ, কিছুই বাদ নেই। তবে এটুকুও বলব, আমাদের এই ধরনের আলোচনায় আজ পর্যন্ত যতটা একটা হুজুগের ভাব আছে, ঠিক ততটা যথার্থ শ্রদ্ধা বা জ্ঞান-পিপাসা হয়তো তেমন নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব আলোচনায় একটু অন্তঃসারশূন্যতা, একটু মূঢ় আত্মম্ভরিতা যেন প্রচ্ছন্ন থাকে—আলোচকদের কাছে যেটা প্রায়ই সবচেয়ে বড় হয়ে ঠেকে, সেটা যেন তাঁদের নতুন কোনো একটা নাম উচ্চারণ করতে পারার ক্ষমতাটা ও সেই ক্ষমতাটা একটু বুক ফুলিয়ে দেখানোর বাসনাটা। তবে প্রথম প্রথম আমাদের অনেকের এই অন্তঃসারশূন্যতাটা কিছু অস্বাভাবিক নয় (এবং এই অন্তঃসারশূন্যতার ব্যতিক্রমও ঘটেছে ও আছে বাংলাদেশে, ও সেই ব্যতিক্রমকে যেন নমস্কার করতে না ভুলি), এটা হবেই।

না, ফার্গকে চিনতে না পারার দরুন যে-ত্রুটী আমাদের—যদি ত্রুটী সেটা হয়ই—সেটা তেমন মারাত্মক নয়। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর নিজের দেশেও আজও তিনি বহুলাংশে অপরিচিত রয়ে গেছেন। একটি উদাহরণ দিই। ফার্গ-এর নাম শুনে আসছি বহুকাল ধ'রে, ইংরেজীতে অনূদিত তাঁর কিছু কিছু উদ্ধৃতিও মধ্যে মধ্যে নজরে পড়েছে। আধুনিক কালের প্রসিদ্ধ মার্কিন কবি ওয়ালেস স্টিভেন্স ফার্গ-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। স্টিভেন্স ছাড়াও আরো অনেকে এই কবির গুণগান করেছেন নানান অবকাশে। অথচ মূল ফরাসীতে ফার্গ-এর কবিতা পড়ার সুযোগ আমার আগে ঘটে নি। তাই একদিন মনে হ'ল, দেখাই যাক না লোকটা কে ছিল, কবে জন্মেছিল, কী করেছিল, কেমন লিখেছিল—ও সেই ভেবে তুলে নিলাম একটি অতি প্রখ্যাত ফরাসী অভিধানের জীবনী অংশটি। এই অভিধানটি সময়ে-অসময়ে নানান সহায়ে এসেছে আমার, এতে রাজ্যের খবর মেলে। অভিধানটির নাম 'নুভো প্যতি লারুস' ও তার যে-সংস্করণটি আমার কাছে আছে, সেটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। কিন্তু ভেবে দেখুন আমার বিস্ময়, যখন অভিধানটির ১৯৫৪-এর পরিবর্ধিত সংস্করণেও লেঅঁ-পল ফার্গ সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই দেখতে পেলাম না। অভিধান-টির অপরিমেয় খ্যাতির কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন ফার্গ সম্বন্ধে তার এই সম্পূর্ণ নীরবতার খাঁটি অর্থটি কী।

সেই অর্থটি হ'ল এই যে, ১৯৫৪ পর্যন্ত যে-সাহিত্যিক জনমত ফ্রান্সে সম্মানিত হয়ে এসেছিল, তার বিচারে ফার্গ দাঁড়ান নি কোথাও, তিনি উল্লেখযোগ্য নন। এবং এর চেয়ে অসত্য কথা খুব কমই হতে পারে। কারণ ফার্গ শুধু দাঁড়ানই নি বা তিনি শুধু উল্লেখযোগ্যই নন, ফরাসী কবিতার আধুনিক পর্যায়ের তিনি একজন ছোটখাটো মহারথী। ১৯২৭-এর জুনে দেখি ফ্রান্সের কাব্য জগত তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে উদ্যত। সেই মাসের এক সাহিত্য পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে বেরোয়। সেই সংখ্যায় ফার্গকে উদ্দেশ্য ক'রে যাঁরা লেখেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক বড় বড় কবি, অনেক বড় বড় সাহিত্যিক। ছিলেন রাভেল, ছিলেন পল ভালেরি। তখন হ'তেও আরো ছ' বছর আগে, ১৯২১-এ, মার্সেল প্রুস্ট একটি চিঠিতে ফার্গ-এর 'প্রশংসনীয় প্রতিভার' উল্লেখ করেন। এবং ১৯২৬-এ দেখি রাইনের মারিয়া রিলকে লিখেছেন প্রিন্সেস বাস্সিয়ানোকেঃ 'ফার্গ আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন।'

অতএব? এত সত্ত্বেও এই কবির সম্বন্ধে লারুস-এর নীরবতা যেমন পীড়াদায়ক, তেমনি আশ্চর্য ঠেকে। আশা করি লারুস তাঁদের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই বিরাট ভুলটি সংশোধন করতে পেরেছেন।

গোড়ায় বলেছি, ফার্গকে আশ্চর্য লাগার কথা। কিন্তু তাঁর যথার্থ পরিচয়ের যে-অভাব আজো দেশে দেশে, এমন কি তাঁর নিজেরও দেশে, সেটাও কিছু কম আশ্চর্য নয়। তাঁকে নিয়ে বা তাঁর যথার্থ স্থানটি যে কী, তাই নিয়ে যে-বিস্ময়, সে-প্রসঙ্গে এখন আসছি।

১৮৭৬ হ'তে ১৯৪৭ পর্যন্ত লেঅঁ-পল ফার্গ-এর জীবনকাল। জন্ম পারীতে, পারীরই কবি ছিলেন তিনি, আজীবন ছিলেন সহর প্রেমিক। সাম্প্রতিক ফরাসী কবিতার সব কটি বিশিষ্ট পর্যায়ই তিনি তাঁর জীবন-কালে দেখে যেতে পেরেছেন, ও তাদের সব কটির সঙ্গে তাঁর নিজেরও গাঢ় সম্বন্ধ ঘনিয়ে উঠেছিল। সেই সময়টা একবার ভেবে দেখুনঃ ১৮৭৬-এর পারী, যখন জন্মালেন ফার্গ। ফরাসী কাব্য ও শিল্প জগতের তখন এক স্বর্ণযুগ। মাত্র ন' বছর আগে, ১৮৬৭-র আগস্টে, মৃত্যু হয়েছে বোদলেয়ারের। কবিতার মোড় চিরকালের জন্যে ফিরে গেছে। ১৮৬৮তে বেরিয়েছে বোদলেয়ারের 'পাপের ফুল'-এর তৃতীয় সংস্করণ, সেই সংস্করণের একটি বিশেষ ভূমিকা লিখেছেন তেওফিল গ্যতিএ। এদিকে ভেরলেনের খ্যাতিও তখন মধ্যাহ্ন-গগনে। তাঁকে দেখি, ১৮৭৬ হ'তে ১৮৭৯-তে, শিক্ষক হিসেবে ইংল্যান্ডের নানা স্থানে। তাঁর জীবনের একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার—র‍্যাঁবোর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি ঘটে গেছে ইতিমধ্যেই, র‍্যাঁবো লিখে

ফেলেছেন 'নরকে এক ঋতু' (যদিও সে-গ্রন্থের প্রকাশ ঘটবে কিছু পরে, ১৮৭৩-র অক্টোবরে), তাঁর অন্তর বিক্ষোভ ও বিরাগের প্রচণ্ডতায় ইউ-রোপকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি। ১৮৮৪-তে—ফার্গ যখন মাত্র আট বছরের বালক—ভেরলেন প্রকাশ করবেন তাঁর 'অভিশপ্ত কবিরা', তিনজন কবিকে (বিশেষ ক'রে র‍্যাঁবোকে) পরিচিত করাবেন ফরাসী পাঠক-দের কাছে। এসে গেছেন মালার্মে, ভালেরি। চিত্রশিল্পের জগতেও এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘ'টে গেছে—জন্ম হয়েছে বিম্ববাদ বা ইম্প্রেশনিজমের। সারা দেশটায় যেন একটা নতুন সাড়া প'ড়ে গেছে তখন, একটা নতুন আলোকের বন্যা ব'য়ে গেছে ও যার প্রভাব অনুভূত হতে আরম্ভ করছে দেশের সর্বত্র। সমস্ত দেশটা যেন খেপে উঠেছে, নিত্য নতুন 'ইজমের' কথা শোনা যাচ্ছে কাব্য ও শিল্প প্রসঙ্গে, এবং সব চিন্তাধারাই সমান একাগ্রতায় নিজেদের বিশিষ্ট ও একক ব'লে চিহ্নিত করতে প্রাণপণে কোমর বেঁধে লেগেছে। সকলেরই আছে নিজের নিজের চেলাচামুণ্ডার গোষ্ঠী। সেই সব চিন্তাধারার কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম এবং কী বিচিত্র তাদের জীবন-দর্শনঃ প্রথমে এল প্রতীকবাদ বা সিম্বলিজম, পরে এল বিম্ববাদ বা ইম্প্রেশনিজম, ও আরো পরে একে একে ক্রমাগতই আসতে থাকল ফোভিজম, স্যুররেয়ালিজম, দাদাইজম, ও শেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালের রিয়ালিজম। ফার্গ-এর জীবনকালেই এতগুলি, 'ইজমের' সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর।

শুধু কি তাই? যখন দেশে এই রকমের কাণ্ড চলেছে, কাব্য ও শিল্পের জগতে একটার পর একটা নতুন বিপ্লব সমস্ত আকাশ-বাতাস মন্দ্রিত ক'রে তুলেছে, তখন ফার্গ হাত-পা গুটিয়ে ব'সে ছিলেন না এই সবের এক নিরপেক্ষ, উদাসীন দ্রষ্টামাত্র হয়ে। নিরপেক্ষ বা উদাসীন দ্রষ্টামাত্রও যদি হতেন তিনি, তবুও সেই নিত্য নতুন ঢেউ-এর পর ঢেউ অন্তত আংশিক-ভাবে প্রভাবান্বিত করত তাঁকে নিশ্চয়ই। প্রভাব হতে নিস্তার ছিল না তখন কারুরই—কারণ দৈনন্দিনের তুচ্ছ জীবনটাও যেন পালটে যেতে বসে-ছিল তখন, এবং যেহেতু বাঁচতে গেলে আশপাশের জীবনের তালে তালে পা ফেলতেই হয়, সাধারণ মানুষও তার নিজেরি অজ্ঞাতে ও কোনো বিশেষ চেষ্টা না ক'রেই যেন সচেতন না হয়ে পারে নি তখনকার কাব্য বা শিল্পের সেই ক্রমাগতই নব নব মূল্যায়ন সম্বন্ধে। কিন্তু আগেই বলেছি, ফার্গ ছিলেন না দ্রষ্টামাত্র হয়েই, উল্টে একই বিপ্লবীদের সঙ্গে সমানে তুমুল প্রয়াসে তিনিও সারাজীবন হাত চালিয়েছেন কবিতার সাধনায়। মালার্মের মঙ্গলবারের অধিবেশনে তিনি যেতেন, পল ভালেরিকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে চেনার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল (শুধু তাই নয়, কবি ভালেরিকে

সব সমকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা বোধ হয় তিনিই প্রথম করেন—ভালেরির নাম তখনো বিশদভাবে অজ্ঞাতই, যখন ফার্গ ১৯১৭ সালে মালার্মের এই প্রধান শিষ্যের উপর একটি বক্তৃতা দেন), তিনি স্যুররেয়ালিজমের অন্যতম এবং স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা আঁদ্রে ব্রত'-রও অতি নিকট বন্ধু ছিলেন। বেঁচে ছিলেন ১৯৪৭ পর্যন্ত, অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধের অবসানের পরেও। ততদিনে ফরাসী কবিতা ও শিল্প আরো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে, আরো অনেক নতুন মহারথী এসে হাজির হয়েছেন অনেক নতুনতর বক্তব্য নিয়ে—এঁদের সকলের সঙ্গেও ফার্গ বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ ছিলেন। তিনি যেন এক জীবনে পেরিয়ে যান ফরাসী কবিতার একটি উজ্জ্বলতম দিগন্তের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত।

এবং শুধু কবিতাতেই তাঁর আগ্রহ বা প্রয়াস সীমিত ছিল না। রীতিমত সংগীত রসিকও ছিলেন তিনি, পিয়ানো খুব ভালো বাজাতেন। সংগীত ছিল তাঁর আরো এক মস্ত বড় প্রেম, ও খুঁজলে সেই সংগীতের ধ্বনি তাঁর কাব্যের মধ্যেও মিলবে অজস্র। একবার বলেন সোজাসুজিঃ 'শুধু গীতেরই মাধ্যমে পারব তোমার কাছে ব্যক্ত করতে কয়েকটি বিশিষ্ট মহিমা, কয়েকটি তাৎপর্য।' আবার শুধু সংগীতই নয়, শিল্পেও (অর্থাৎ চিত্র শিল্পেও) তাঁর ছিল এক মহান অনুরাগ। অনেক সময় তাঁর পক্ষে বলা একটু মুস্কিল হয়ে পড়ত, কোনটা তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন—কবিতা, না গান, না ছবি। এবং এই যে-অনুরাগ তাঁর, এ ছিল না কোনো অপেশাদারীর অনুরাগ, শুধু একটা খেয়াল বা সখ বা একটা পছন্দমাত্র। এ-অনুরাগ ছিল তাঁর যেমন জাগ্রত, তেমনি গভীর—কর্মের দ্বারা, সাধনার দ্বারা, অনুশীলনের দ্বারা, এই অনুরাগ তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পন্ন করতে চেয়েছিল। কাব্যলক্ষ্মী অবশ্য নিঃসন্দেহে ছিলেন তাঁর হৃদয়ের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই দেবীরই সাধনায় তিনি নিজের জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছবি ও গানের প্রতি তাঁর যে-প্রেম, তাও কবিতার মূল ধারার সঙ্গে মিশে যেন সঙ্গতি খুঁজতে চেয়েছিল একটি বিচিত্র সাধনায়। এবং কবিতা, ছবি, ও গানের এই ত্রিধারার সংমিশ্রণ শুধু ফার্গ-এর সাধনারই বৈশিষ্ট্য ছিল না, এক অর্থে এই একই বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয় তৎকালীন ফ্রান্সের সকল উল্লেখযোগ্য কবি বা শিল্পীর সাধনা। বোদলেয়ার হ'তে আরম্ভ ক'রে পরবর্তী সকল প্রতীকবাদী কবিদের অন্যতম একটি প্রতিপাদ্য ছিল, কবিতাকে ক্রমশই সংগীতমুখী ক'রে তোলার অনিবার্য আবশ্যকতা, সংগীতের রহস্যাতে কবিতাকে সমৃদ্ধ করার সার্থকতা। ইন্দ্রিয়ানুভূতির

বাহ্য জগতের অতীত একটি 'সংযোগ' তাঁরা কামনা করেছিলেন—একটি সংযোগ দৃষ্ট বা দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে শ্রুতের বা শ্রোতব্যের। এবং আর্ট বা চিত্রকলার সঙ্গে কবিতার যে-অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সেই ঐতিহ্যেরও সূত্রপাত বোদলেয়ার হ'তেই। চিত্রকলার সঙ্গে কবিতার সেই সম্বন্ধটি ফ্রান্সে—একটির চলা কী ভাবে আরেকটিকে চালিয়েছে নতুন নতুন পথে—তা আজ এমন সর্বজনবিদিত সত্য যে তা নিয়ে কিছু না বললেও চলে।

কবিতার ক্ষেত্রে ভালেরিকে পরিচিত করার যে-প্রয়াস ফার্গ-এর, তার উল্লেখ করেছি। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও দেখি, যাঁরা প্রথম সেজানকে পরিচিত করানোর ভার নেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ফার্গ। শুধু সেজানকেই নয়, অন্যান্য অনেক ইম্প্রেশনিস্টদেরও তিনিই প্রথম অভিনন্দিত করেন। তখন তাঁর বয়স হবে চব্বিশ কি পঁচিশ—১৯০০-র কাছাকাছি—তখনই তাঁকে দেখি এত উৎসাহী নতুন চিত্রকলা সম্বন্ধে। শুধু তাই নয়, তারো আগে অর্থাৎ আরো অল্প বয়সে তাঁকে গভীরভাবে আলোচনা করতে শুনি গগ্যাঁকে নিয়ে, ভান গগকে নিয়ে, বনারকে নিয়ে, ভুইয়ারকে নিয়ে, সেরুজিএ-কে নিয়ে। চিত্রকলার প্রতি এই প্রীতি তাঁর বেড়েই চলবে—বহু পরে, ব্রাক ও পিকাসোরও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে দাঁড়ান তিনি।

বোদলেয়ার হতে পিকাসো পর্যন্ত যে-বহুধা বিচিত্র, চলমান ও সর্বদাই পরিবর্তনশীল জীবনের প্রতিচ্ছবি ও স্বাক্ষর ধরতে চেয়েছে ফরাসী কাব্য ও শিল্প জগত, তার সবটার মধ্য দিয়েই ফার্গ তাই বেঁচে গেছেন বলা চলে। যদিও বোদলেয়ারের মৃত্যুর কিছু পরে তাঁর জন্ম, বোদলেয়ারের প্রথম প্রভাব যখন সার্থকভাবে অনুভূত হতে আরম্ভ করে, তখন ফার্গ কিশোর ও তাই বোদলেয়ারের যুগের মধ্যেও তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করলাম।

এবং ঠিক এইখানেই লোকটাকে নিয়ে আশ্চর্য লাগার কথা। ফার্গকে যখন পড়বার চেষ্টা করলাম, বোঝবার চেষ্টা করলাম, যেন তাঁকে ঠিক ধ'রে উঠতে পারলাম না কোনো পরিচিত মার্কামারা ধরনের মধ্যে। অর্থাৎ, তাঁকে না বলা গেল সিম্বলিস্ট, না বলা গেল স্যুররেয়ালিস্ট, না বলা গেল দাদাইস্ট বা আজকের তথাকথিত রিয়ালিস্ট বা হিউম্যানিস্ট। বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছি, এ রকমটা হ'ল কেমন ক'রে? লোকটা সারাজীবন কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা ক'রে গেল, এবং কিছু কম কৃতিত্বও অর্জন সে করে নি সেই সাধনায়, এবং সে বেঁচে গেল এত বিভিন্ন বিচিত্র ভাবধারা-চিন্তাধারার প্রভাবের মধ্যে। কিন্তু তার নিজের ওপর এইসব চিন্তাধারা বা ভাবধারার কোনো বিশিষ্ট ছাপই পড়ল না? এটা কেমন ক'রে হয়?

কিন্তু আমার প্রশ্নটার মধ্যে একটা গলদও আছে, ও সেটাও ধ'রে ফেলতে বিলম্ব হ'ল না। কোনো একটি বিশিষ্ট প্রভাব পড়বে কী ক'রে, যখন যার ওপর প্রভাব পড়বে বা পড়া উচিত ব'লে মনে করছি, তাকে বাঁচতে হচ্ছে অজস্র (ও কখনো-কখনো পরস্পর বিরোধী) প্রভাবের চাপে?

আর এটাও তো একটা ভয়ংকর, এবং সমানই অযৌক্তিক, দাবী যে বিশিষ্ট লেখকমাত্রকেই হতে হবে কোনো বিশেষ প্রভাবের ছায়াযুক্ত? তা হলে ব্যক্তিত্ব ব'লে বস্তুটা যাবে কোথায়? র‍্যাঁবো কি সর্বাগ্রে র‍্যাঁবো নন, বোদলেয়ার বোদলেয়ার নন? তাঁদের বা তাঁদের কাব্যবিচার করার আগেই কি বিচার করতে বসতে হবে প্রধানত তাঁরা সিম্বলিস্ট, না স্যুররেয়ালিস্ট, না রিয়ালিস্ট, ইত্যাদি? না সেটা করা সম্ভব? এবং এ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা যা, তা হচ্ছে এই যে দেশকালের প্রভাব পড়তে বাধ্য যে-কোনো সার্থক কবি বা লেখকের উপর, কিন্তু সেই সার্থক কবি বা লেখক সেই প্রভাবটিকে অতিক্রম ক'রে যাবেন। এর মানে এই নয় যে তিনি সেই প্রভাবটিকে অস্বীকার করবেন বা সেই প্রভাবটিকে অস্বীকার করতে যাওয়া বা চাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তিনি সেই প্রভাবটিকে স্বীকার ক'রেও তাকে অতিক্রম ক'রে যাবেন, সেই প্রভাবের বশীভূত হয়েও তিনি এমন কিছু দিয়ে যেতে বা লিখে যেতে পারবেন যা হবে তাঁর এবং একমাত্র তাঁরই। নইলে তাঁর সঙ্গে তাঁরই যুগের ও তাঁরই দেশের অন্য আরেকজন কবি বা লেখকের তফাৎ থাকবে কোথায়? কই, র‍্যাঁবো তো ভেরলেন হ'য়ে যান নি, এবং ভেরলেনও হন নি র‍্যাঁবো? সুতরাং ফার্গ-এর মধ্যে যদি না পেলাম তাঁর যুগের বহুল প্রভাবগুলির অন্তত একটিরও অবিসংবাদিত ছাপ তো তা না হয় নাই পেলাম, ফার্গকে একেবারে ফার্গ হিসেবে এবং শুধুমাত্র ফার্গ হিসেবেই বা দেখতে দোষ কী।

দোষ নেই। তবে সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রেরা একটু অন্য রকম আশা করে, কারণ তারা যদি দেশকালের মাপকাঠিতে বিচার ক'রে একদল কবিকে বা লেখককে বা শিল্পীকে একটি বিশেষ শ্রেণীতে ফেলতে না পারে তো তাদের কাজের বড় অসুবিধা হয়। আর বিশেষত ফ্রান্সের এবং পারীর যে-বিশিষ্ট যুগের মধ্যে ফার্গ-এর জীবনকালটা কেটেছে, তার একটি চারিত্রিক অদ্বিতীয়তা ছিল। সেই অদ্বিতীয়তার আকর্ষণ এত প্রচণ্ড যে তার হতে মুক্ত হওয়াটা বা মুক্ত থাকতে পারাটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকে। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত যে ফার্গ ছিলেন, তাও নয়। তাঁর কবিতায় তাঁর যুগের বহু প্রতিধ্বনি মিলবে—প্রতিধ্বনি কখনো সিম্বলিজমের, কখনো

স্যুররেয়ালিজমের, কখনো হয়তো অন্য কোনো 'ইজমের', যার রেওয়াজ উঠে থাকতে পারে তাঁর জীবনকালে। তবু যেন তাঁকে ঠিক ধরা গেল না, তাঁর যেন নাম দেওয়া গেল না, তাঁকে ঠিক চিহ্নিত করতে পারলাম না। অবশ্য এই ব্যর্থতা আমারই, তাঁর নয়, তিনি নিশ্চয়ই নিজেকে চিহ্নিত করেছেন তাঁর স্বকীয় বিশিষ্টতায়। তবে আমার চেষ্টা ছিল তাঁকে দলে ফেলার, তাঁর চেষ্টা ছিল অন্য।

তাঁর ব্যবহার বা আচার-আচরণের মধ্যেও আরো দুয়েকটা ছোটখাটো জিনিস ভারী আশ্চর্য ঠেকে, তাঁর যুগের ও দেশের এক কবির পক্ষে ভারী অস্বাভাবিক ব'লে মনে হয়। প্রথমেই মনে পড়ে বাবা-মা'র প্রতি তাঁর অত্যধিক প্রীতির কথা, ও তাঁদের মৃত্যুতে তাঁর অসামান্য শোকের কথা। বাবা-মা সর্বত্রই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, এবং তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধার অভীপ্সা না থাকলে যে কবি হওয়া যায় না, এমন কথাও সে-যুগের কোনো কবি বলতে উদ্যত হন নি ফ্রান্সে। যদিও এ-ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে মনে না প'ড়ে পারে না বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবোর ব্যক্তিগত জীবনের কথা। এঁরা দুজনেই তাঁদের মায়ের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়েছিলেন কৈশোর হ'তেই, এবং সেই বিতৃষ্ণা ও তজ্জনিত নিরাপত্তার ভাবের যে-সম্পূর্ণ ও আশৈশব অভাবে তাঁরা ভুগেছিলেন সারা জীবন, তা তাঁদের জীবন ও কাব্যকে কম প্রভাবান্বিত করে নি। তবু তা' সত্ত্বেও এ-কথা বলা চলে না যে মা-বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সে-যুগের সকল উল্লেখযোগ্য কবি বা শিল্পীকে হতে হয়েছে। তবে ফার্গ-এর এই প্রীতিটার কিছু অসাধারণত্বও ছিল, দেখে শুনে মনে হয় তিনি যেন সারা জীবন বুড়ো খোকা হয়ে বেঁচে গেলেন। শুধু কি তাই? মা-বাবার মৃত্যুর পর তাঁকে যে-ধরনের কবিতা লিখতে দেখি, এবং সেই সব কবিতার মধ্যে এমন একটি মর্মস্পর্শী বেদনার আবেগ দেখি, যাও কম অবাক ক'রে তোলে না। বোধ হয় মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পরও রবীন্দ্রনাথ এত আকুল কবিতা লেখেন নি। এবং কথাটি তাই। পিতা-মাতার স্মৃতির প্রতি এই-যে বিহ্বল উচ্ছ্বাস ফার্গ-এর, তা যেন দয়িতের প্রতি প্রেমেরও উপর যায়। অবশ্য একভাবে দেখলে এতে আপত্তির কিছু নেই—যে-কোনো সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই যদি মানুষ তার অন্তরে উপলব্ধি করতে পারে মহত্তর প্রেমের সেই আকুতি-ভরা বাণীটি, তাতে তার লাভ বই লোকসান নেই। এবং ফার্গ-এর এই জাতীয় কবিতাগুলি কবিতা হিসেবে এত উচ্চস্তরের, যে তা পাঠকদেরও চরিতার্থ করে। আর কী দরকার কবির? মা বা বাবা, ভাই বা বোন, স্ত্রী বা প্রেমিকা, সবই তো আধার মানুষের কাছে, সেই আধারে সে সঞ্চয় করতে চায় প্রেমভাবের

অমৃত। এবং সেই অমৃতের সঞ্চয় যখন আমার পূর্ণ হ'ল, তা সে যে কোনো আধারের মাধ্যমেই ঘটুক না, আমার যা পাবার তা তো আমি পেয়ে গেলাম। আর কী চাই?

কিন্তু তবু এ-সব ভারী আশ্চর্য লাগে, অন্তত সেই যুগের ফ্রান্সের পক্ষে। সত্যিকারের দয়িত তাঁর গেল কোথায়, কোথায় তাঁর প্রেমিকা? তার সন্ধান নেই। শেষ জীবনে ফার্গ বিয়ে করেছিলেন, তবে সে-বিয়েও এক অদ্ভুত ধরনের বিয়ে—এক অর্থে তাই ফার্গ আইবুড়োই থেকে যান মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু বিবাহ, স্ত্রী, স্ত্রীর প্রতি প্রেম, এ-সব কী কথা আওড়াচ্ছি আমি গত শতাব্দীর ফ্রান্সের কাব্যজগত প্রসঙ্গে? তখনকার ফরাসী কবিরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে অভিশাপের ছাপ গায়ে পিঠে মেখে ছন্নছাড়া হ'তে চেয়েছিলেন, মুক্তি খুঁজেছিলেন নিজেদের অভিশপ্ত ক'রে তোলার তান্ত্রিক সাধনায়, চাষ করতে চেয়েছিলেন পাপের ফুলের—বেশ্যা আর আফিম আর উঞ্ছবৃত্তি আর সিফিলিস, এই সব যেন তাঁদের সাধনার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, সেই তথাকথিত চিরাচরিত নীতিবাদের প্রশ্ন নেই—এটা একটা সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের জীবনে, এবং সেই সত্যের সাধনার মাধ্যমে সৌন্দর্যের একটি নতুন রূপ ও সংজ্ঞা দিতে তাঁরা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু পাপের ফুলের সেই যে-চাষটি, তারই বা স্বাক্ষর কোথায় ফার্গ-এর জীবনে? এইদিক দিয়ে দেখতে গেলেও তাঁকে তাঁর সমকালীন ধারা হ'তে যেন বেশ একটু বিচ্ছিন্ন ব'লে মনে হয়।

অবশ্য উঞ্ছবৃত্তি যে তিনি একেবারে করেন নি, তাও নয়। বরং সারা-জীবন শুধু উঞ্ছবৃত্তিই ক'রে গেছেন। খেয়াল-খুশী ও আলস্যে সারাটা জীবন উড়িয়ে দেওয়া, জীবিকা উপার্জনের জন্যে কোনোদিন কোনো চিন্তা না ক'রে রাত দুপুরে সহরের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে টোঁ টোঁ ক'রে ট্যাক্সি চ'ড়ে ঘুরে বেড়ানো, কেবল এক হোটেল থেকে আরেক হোটেলে আড্ডা মারতে যাওয়া আর সাদা বা লাল মদে মধ্যে মধ্যে দেহটাকে সিক্ত করা, এ ছাড়া বলবার মত আর কী করেছেন? অবশ্য কবিতা লিখেছেন, সারা জীবন লিখেই গেছেন, কিন্তু তা অন্য ব্যাপার। এবং এই যে উঞ্ছ-বৃত্তি তাঁর, এতে আর যাই থাকুক, খুব একটা পাপের গন্ধ তেমন নেই। নীতিবাদীরা নাক সিঁটকাবেন না এর কথা শুনে।

আবার ব্যক্তিগত জীবনেই দুয়েকটি খুঁটিনাটিতে তাঁর কিছু কিছু আশ্চর্য মিলও আছে তৎকালীন কোনো কোনো কবির সঙ্গে। এই যেমন, শেষ বয়সে হঠাৎ তাঁর পক্ষাঘাত হওয়া। এই সর্বনাশ ঘটে বোদলেয়ারেরও

—কিন্তু বোদলেয়ারের পক্ষাঘাত তাঁর সারাজীবন পাপ পূজার ফল, তাঁর সিফিলিসের সর্বশেষ ও চরম দশা হতে জাত, এবং এই সর্বনাশ যেন তাঁর ঈপ্সিতও ছিল। কারণ এই একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই বাইরের লোকের চোখে যেন তাঁর পাপ একটি অবিসংবাদিত পূর্ণতা লাভ করল, নিজের কাছে নিজেকেও তিনি এতদিনে মনে করতে পারলেন সার্থকভাবে অভিশপ্ত। কিন্তু ফার্গ-এর যে-পক্ষাঘাত, তার পিছনে ছিল মুখ্যত তাঁর সারাজীবনের কোল-জোড়া আলস্য, এক উচ্ছৃঙ্খল দৈনন্দিনের যাত্রা, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে যথারীতি চালনার সম্পূর্ণ অভাব, এবং সবার ওপরে 'শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি।'

এই নিছকই দৈনন্দিন ও তার অনিবার্য অসহ্য গ্লানি, তা-ই তাঁর সমগ্র কবিতাও। সেই কবিতা যেন এক সহুরে উড়নচন্ডীর ক্ষণশাশ্বতীর জয়গান, অথবা সেই ক্ষণশাশ্বতীর প্রচন্ড বেদনার গান। এক দম বন্ধ ক'রে আনা মন খারাপ। কারণ জীবনটা বৃথাই গেল, তা' দেশের বা দশের কোনো ব্যবহারিক কাজেই লাগল না, কেবল প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই সার হ'ল। সুতরাং মনে হ'ল, এ-জগতে কিছুই কিছুর জন্যে নয়, কোন একটি নিরর্থক মুহূর্ত হতে আরেকটি নিরর্থক মুহূর্তের দিকে ক্রমাগতই পা বাড়ানো। ভিত্তি নেই জীবনে, এমন মাটি নেই যার ওপর পা ফেললে মনে হতে পারে এই তো আমি আছি, আমি বাঁচছি, আমি আনন্দ পাচ্ছি। ফুল আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা ফুটতে না ফুটতে শুকিয়ে যায়, এবং অচিরেই ঝ'রে পড়ে। আর মেয়েরা? তারা শুধু মিথ্যা কথা বলতে জানে। জীবনটা মোড়া এক নির্জনতার অন্ধকারে। 'আমার একাকী হৃদয়টা কেবলি ক'কিয়ে কেঁদে উঠছে বিরাট এক নির্জনতার মধ্যে।' লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট জিনিসের সঙ্গে কবির আন্তরিক সম্বন্ধ, এবং যা তাঁকে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছে এক ক'রে এই বহুল বিচিত্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ সম্ভারের সঙ্গে, সে-বন্ধন সূক্ষ্মতর মাকড়সার জাল হতেও। মাথার মধ্যে যেন এক অসম্ভব অকল্পনীয় প্রকান্ড শোভাযাত্রা চ'লেই চলেছে—শোভাযাত্রা অজস্র মানুষের, স্মৃতির, ছবির। 'আমার আছে বারো হাজার ইন্দ্রিয়, চিন্তার ধারণার কত-যে অসংখ্য বীথিকা আমাতে, কত-যে উপনিবেশ সেখানে ভাবের, আর আমার স্মৃতিটা প'ড়ে আছে তিরিশ লক্ষ বিঘা জুড়ে।' ভালোই তো, যদি এত অপরিমেয় ভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পেরে থাকেন তিনি তো তা হবে নিশ্চয়ই আনন্দেরই কথা। কিন্তু সব সত্ত্বেও বিষণ্ণতা যে ঘোচে না, কেবলি তাঁর মনে হয় সবই অর্থহীন, কিছুই কিছুর জন্যে নয়।

দৈনন্দিনের মুহূর্ত নিয়ে কারবার ফার্গ-এর। কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য ও তাঁর কবিতার সাফল্য এই যে খণ্ড খণ্ড মুহূর্তের মধ্য দিয়েই তিনি শাশ্বতীকে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর দৈনন্দিনের, অতি পরিচিতের, হাতে-ছোঁওয়ার ও চোখে দেখার মুহূর্তগুলিকে তিনি ক্ষণশাশ্বতীর রূপ দিতে চেয়েছেন। এর বাইরে অন্য কোনো জটিল বা বৃহৎ তত্ত্ব কিছু নেই তাঁর কবিতার পিছনে। এখানে প্রশ্ন নেই শৃঙ্খলার, সেই সর্বশক্তিমত্তার, যাকে মালার্মে ও ভালেরি কাব্যসাধনার রহস্যের শেষ ও একমাত্র চাবি ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। প্রশ্ন নেই বোদলেয়ারের মহান পাপবোধের বা এলুয়ার-আরাগ'র সমাজসচেতনতার। এক কথায়, কোনো তত্ত্ব জাহির করার চেষ্টাই নেই ফার্গ-এর কবিতায়। এই কবিতাকে যদি নিতে চাও বা নিতে পারো তো নাও শুধু কবিতা ব'লেই। তাই যা ফার্গ হতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে সেই প্রায় অসম্ভব বস্তুটিঃ শুদ্ধ, স্বতস্ফূর্ত কবি।

এবং কবিতা তাঁর কাছে একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তিরই ব্যাপার ব'লে প্রেরণারও দরকার নেই তাঁর। কবিতা তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। অবশ্য প্রেরণার দাক্ষিণ্যকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন মালার্মেও, ও তাঁর শিষ্য ভালেরিও। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য ছিল ভিন্ন। ফার্গ-এর কবিতার বড় কথাটা হ'ল এই যে তার কোনো বক্তব্য নেই, কোনো প্রতিপাদ্য নেই। এর মানেও আবার এই নয় যে, ফার্গ অতি সাধারণ কোনো কবি ছিলেন বা তিনি শুধু সহজবোধ্য গতানুগতিক পদ্য লিখে গেছেন। যে-পারিপার্শ্বিক তাঁকে রসদ যুগিয়ে এসেছে, তা কোনো অর্থেই সাধারণ ছিল না, এবং সেই পারিপার্শ্বিকের চাপে প'ড়ে তাঁর কবি মানসও অসাধারণ না হয়ে পারে নি। যে-বিশিষ্ট বিতৃষ্ণা, বিষণ্ণতা ও বিরাগ তাঁর, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগেরই মার্কা মারা। তা ছাড়া ছিল তাঁর বিচিত্র উচ্ছৃঙ্খল জীবন, উঞ্ছ-বৃত্তি, তাঁর কর্মহীন, সন্তানহীন, আত্মীয়হীন অস্তিত্ব, যা তাঁর কাব্যকে একটি সংজ্ঞাতীত মর্যাদায় মণ্ডিত হতে সাহায্য করেছে। এবং সে-মর্যাদাও সকল নীতিবাদের ঊর্ধ্বে। এখানে প্রশ্ন কাব্যের উত্তীর্ণ হওয়ার কথার, কোন ধরনের (অর্থাৎ তথাকথিত বিচারে ভালো বা মন্দ) জীবনের উপর ভিত্তি ক'রে সেই কাব্য লিখিত হয়েছে, তাকে তিরস্কার বা প্রশংসা করার প্রসঙ্গ হবে অবান্তর।

ফার্গ-এর প্রসঙ্গে তৎকালীন ফরাসী কবিতার যে-দুটি প্রধান ধারা আজ পর্যন্ত প্রভাব ফেলে এসেছে কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে, তাদের উল্লেখের দরকার। একটির সূচনা হয় তাঁর জন্মের আগেই, অন্যটি প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করে তাঁর জীবনকালে। প্রথমটি তো আধুনিক ফরাসী কবিতার

সেই অতি পরিচিত কথা, যা র‍্যাঁবোর যুগ হ'তে নিজেকে চিহ্নিত করতে চায় অব্যক্তের অব্যর্থ যাত্রায়। সেই দলের কবিদের ছিল একটা প্রচণ্ড প্রতিপাদ্য, তাঁরা নিয়েছিলেন একটা যুগান্তকারী প্রতিজ্ঞা, মেতেছিলেন একটা সমানই যুগান্তকারী পরীক্ষায়। তাঁরা কবিতাকে ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন একটি অমোঘ শাণিত অস্ত্র, যা হাতে ক'রে তাঁরা নির্ভয়ে পেঁাছোবেন রাত্রির অন্ধকার পেরিয়ে পরম জ্ঞানের আলোক মন্দিরে। কবিতা যেন বলতে পারে সমস্ত লৌকিক-অলৌকিক অভীপ্সার সর্বশেষ কথাটি, হতে পারে জীবনের চরম অভিব্যক্তিটি। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন কবিদের জ্বালিয়ে দিতে প্রজ্ঞার বৃশ্চিক দংশনে, কাব্য প্রয়াসের ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ করতে। কবিদের, তাঁরা বলেছিলেন, দ্রষ্টা না হয়ে উপায় নেই।

দ্বিতীয় ধারাটির সূত্রপাত হয় স্যুররেয়ালিজমের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই, যদিও তার যথার্থ রূপটি পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিপ্লবী জীবন দর্শনের পরিবেষ্টনীতে। এই কবিতা নতুন ক'রে ও নতুন বাণী নিয়ে আবার ফিরে আসতে চাইল মানুষের কাছে, হতে চাইল লৌকিক মানুষেরই সম্পদ। যে-মানুষ সমাজ ও কালের অনুশাসনে পীড়িত, যার কপালে যুগযুগান্তের অন্যায়ের তিলক, যে নিঃসহায় অথচ যে মুক্তি চেয়েছে, তাকে নমস্কার করার প্রস্তুতি এই কবিতায়।

এই দুটি ধারারই সম্পূর্ণ বাইরে ফার্গ। তাই তিনি এত একক ও একাকী, বিচ্ছিন্ন যেন সব কিছু হতে। এবং সেই কারণেই হয়তো তাঁর কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞান বা উৎসাহ বেশ খানিকটা সীমাবদ্ধ হয়েছে তাঁর নিজেরও দেশে। তবু সব সত্ত্বেও, তাঁর কবিতা একবার পড়তে বসলে তাঁকে ভালো না লেগে উপায় নেই। এবং এই ভালো লাগার দুটি প্রধান কারণ আমি দেখতে পাই। প্রথমত, তাঁর সেই অতি বিশিষ্ট ও অপ্রত্যাশিত ভিন্নতাটি একটু আরামের ভাব আনবেই। যেহেতু কোনো প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ করতে তিনি কোমর বেঁধে লাগেন নি, জটিল কোনো বক্তব্যের গুরুভার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাঁর লেখা। অবশ্য বক্তব্যধর্মী কবিতার অনুশীলনেরও একটি প্রচণ্ড সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে—তবে আজকালকার বহু কবি-লেখকের এত বিভিন্ন বিচিত্র বক্তব্য অহরহই শুনতে হচ্ছে যে তাতে কান যেন ঝালাপালা হয়ে যাবার দশা হয়েছে। তাই যখন পাই ফার্গ-এর মত একজন কবিকে, যাঁর কবিতা যেমন মর্মস্পর্শী ও তেমনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত ও যাতে বক্তব্যের জগদ্দল পাথরটি নেই, তখন পাঠক হিসেবে আমাদের যেন একটু হাওয়া বদলানো হয়, ও সেই কবিতা খানিকটা মন দিয়ে পড়ার

পর বেশ ভালোও লাগতে সুরু করে। দ্বিতীয়ত, ফার্গ-এর কবিতা একক ও একাকী, কিন্তু সেই একাকীত্বটির সঙ্গেও যেন আমাদের সকলের একটি বিশিষ্ট সংযোগ আছে। জগতটা যতই ছোট হয়ে আসছে, যতই মানুষ ক্রমশই মানুষের নিকট হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের এক আন্তরিক বিচ্ছেদও যেন ঘটছে তত বেশি ক'রে। একটা সংযোগের বা নাড়ীর যোগের অভাব, যেন প্রত্যেকটা মানুষ এক একটা দ্বীপ, একটি নামহীন অসহ নির্জনতার চেতনা, তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত আজকের কোনো মানুষই নয়। এবং সেই হিসেবে দেখলে ফার্গ আমাদের সকলের অত্যন্ত সমসাময়িক। যে-নির্জনতার চেতনা তাঁর, তা' তাঁরই—কিন্তু আমরা সকলেই যে যার নিজস্ব নির্জনতার চেতনায় ভুগি। ফার্গ-এর একাকীত্ব বা তার ভাব যেন প্রতিভূ একটি বিরাট বিশ্বজনীন একাকীত্বের। তাঁকে মনে হয় একটি ভ্রষ্ট পথ-হারানো শিশু, যে তার দুঃখকে গ্রহণ করতে চাইছে তার একমাত্র আশ্বাস ব'লে। তিনি নিজেকে বলেছেন বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রতীরের এক আলোকস্তম্ভ, কিন্তু সেই স্তম্ভ হতে বিচ্ছুরিত আলো হয়তো পেঁাছোল না কোনো তরণীতে। অন্যত্র বলছেন তিনিঃ 'দুঃখের ইস্টিশান, তোমার সব পথই তো হাঁটা হ'ল আমার—আর যে চলতে পারি না, আবার পারব না যাত্রা করতে।' এই ক্লান্তি বা বিক্ষোভ বা হতাশা তার প্রতিধ্বনি তুলবেই আমাদের মধ্যে।

অবশ্য মনস্তাত্বিকরা সান্ত্বনা পাবেন জেনে যে ফার্গ-এর এই বিষণ্নতা ও ব্যর্থতার গ্লানির একটি ভিত্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, এমন কি তাঁর শৈশবেই। শোনা যায়, ফার্গ-এর বাবা তাঁর মাকে কোনোকালেই যথারীতি বিবাহ ক'রে উঠতে পারেন নি। তাঁদের গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক পরিবারের ঘোর আপত্তি ছিল এই বিবাহের বিরুদ্ধে। অথচ দুজনে বাস করছেন এক সঙ্গে, সন্তান হয়েছে—কিন্তু কাউকে বলবার যো নেই তাঁরা অবিবাহিত। আর দুজনেই অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন ব'লেই ঐ স্বামী-স্ত্রীর মতন বাস করার ব্যাপারটা নিয়ে তাঁদের একটা প্রচণ্ড মনঃপীড়া ছিল। সেই মনঃপীড়ার অংশ ফার্গকেও গ্রহণ করতে হয়েছে, অন্তত তাঁর তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত—তারপরে নাকি বিরোধী পরিবারের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায় তাঁর পিতা-মাতার। কিন্তু ফার্গ চিরকালই জানতেন তাঁর পিতা-মাতার সম্পর্কের রহস্যটি ও তজ্জনিত তাঁদের নীরব বেদনার কথা। সমাজের মধ্যে থেকেও তাঁদের তিনজনকে যেন এক ধরনের অজ্ঞাতবাস ক'রে যেতে হয়েছে বহুকাল। তাই শৈশব হতেই ফার্গ-এর ভাবপ্রবণ মন নিজেকে যেন অন্য সকল সাধারণ শিশু হতে ভিন্ন ব'লে আবিষ্কার করেছিল—তাঁর

মনে হয়েছিল, এ-সমাজের অনুপযোগী তিনি। পরে বলেছেন, 'আমার শৈশব, সে এক ভয়ংকর দুঃখের জিনিস—কী বিপুল রহস্য তাকে ঢেকে রেখেছিল।' এবং একই কারণে মা-বাবার প্রতি তাঁর গড়ে উঠেছিল এক গভীর ও বিচিত্র সহানুভূতি। তাঁরা তিনজনে যেন একে অন্য থেকে অভেদ্য হয়ে দাঁড়ান, হয়ে দাঁড়ান একটি অবিচ্ছেদ্য ত্রয়ী। তাঁর কাছে তাঁর মা-বাবা ছিলেন 'আমার প্রিয়তমেরা।'

শোনা যায়, লেখার ব্যাপারে ফার্গ নাকি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছিলেন—কোন কথার প্রয়োগটি ঠিক হবে, তা নিয়ে তিনি নাকি কখনো সহজে মনস্থির করতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও লিখেছেন প্রচুর, তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা পঁচিশের ওপর। ১৮৯৪-এ যখন তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে, তখন হ'তেই তাঁর ধ্বনি অতি বিশিষ্ট। প্রথম প্রথম লিখেছেন ছন্দে, পরে প্রাঞ্জল সুন্দর সংগীতমুখর গদ্যে। গদ্য কবিতার যে-পথ বোদলেয়ার আগেই দেখিয়ে গেছেন, সেই পথ ধ'রেই ফার্গ এগিয়েছেন।

এই দুঃখের ও দৈনন্দিনের কবি কেন এত বিশেষ, কেন তিনি নমস্য আমাদের, তার পরিচয় মিলবে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি হ'তে। তাঁর তিনটি কবিতার সহজ অনুবাদ তুলে দিচ্ছি।

১ : ক্ষণ

ছেলেটা মরতে পারে সহজেই
যদি সে হাঁপিয়ে ছুটে চলবেই
প্রেয় জিনিসের মাঝখানে।
জানালায় ভেসে আসে কানে,
চলে বেচারার প্রেম-নিবেদন—
ফুটফুটে দিন চুপ, নির্জন।
দিনের শব্দ, প্রার্থনা কর।
স্বচ্ছ সময় কাটে মন্থর
ঐ তন্দ্রালু পথটায়,
শীতের আকাশ শিহরায়।
দুঃখ দেওয়াই কাজ জীবনের,
নীরবে, ও ধার ধারে না সে কোনো তিরস্কারের—
শুধু মিছামিছি, তার একটি খুশীর জের।

২ : লাউড স্পীকার বলছে

প্রায়ই আমি নেমেছি তোমাদের মধ্যে। মেঘের মত ম্লান করিয়েছি তোমাদের কত না পর্বত-শিখর। প্রকান্ড প্রকান্ড ছায়া হ'য়ে যখন উড়ে বেরিয়েছি, তার মধ্যে তো আমাকে তোমরা ধরতে পার নি। ডুবিয়েছি, ভিজিয়েছি কত না ক্ষুদ্রকায় জাতির কুল, যাদের অস্ফুট কোলাহল এগিয়ে এসেছে কানে। স্বাভাবিক মহিমার এত-যে মাথাগুলি, তাদের সকলের উপরই অবতরণ করেছি। আর তারা আমাকে ভালো ক'রে না দেখেও যেন আমার দিকে তাকিয়েছে এমন একটি মৃদু মিষ্ট হাসিতে, যা আমাকে বিচলিত করেছে। নিজেকে যেন আর নিজেই চিনি নি তারপর। তোমাদের থেকে বেরিয়ে পড়েছি, আবার ঢুকেছি তোমাদেরই মধ্যে। কিন্তু তোমরা ছুটতে লাগলে। আর তোমরা আঘাত চালালে দমাদম শব্দ ক'রে। আর সেই সব মাংসের দস্তানা-পরা কঙ্কালগুলো, যারা স্পন্দন তুলল, তাদের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, স্পন্দন কড়ি ও কোমলের, স্পন্দন মরণেরঃ সেই সব যন্ত্রগুলো, সেই সব মস্তিষ্কগুলো, সেই সব কৌশলগুলো আর সেই সব পুরোনো মুদ্রাগুলোঃ সেই সব জটের জড় আর সেই তারা অশ্রুসিক্তঃ আমি হয়েছিলাম তোমাদেরই হাত, তোমাদের কাজ, তোমাদের রক্তাক্ত চক্ষু, তোমাদের যন্ত্র অণুবীক্ষণের, তোমাদের নিভৃত লাল কোণ। হ্যাঁ, সব দেখেছি আমি। শুঁকেছি তোমাদের জুতোর গন্ধ, গন্ধ তোমাদের অসুখের আর নূতনত্বের, গন্ধ তোমাদের যুদ্ধের আর প্রেমের......

আমার দরকার পড়েছিল তোমাদের আরো নিকট ক'রে পাওয়ার। আমি নোঙর তুললাম।

ভালো যে বাসে যত, শাস্তিও সে দেয় তত।

তা-ই যথেষ্ট হ'ল। তোমাদের বুদ্ধি। আমার ছন্দের বিরোধী। খুন-জখম আমার একতানটির, বিদীর্ণ ক'রে দেওয়া আমার একত্বটিকে, যা' অন্ধ, বধির ও অবিভাজ্য।

সেই একত্বটির দ্বারাই মানুষ অন্য মানুষের কাছে নিজেকে সীমিত করে।

এক নিশ্চিত চোখের পলকে দেখে নেওয়ার যে-ক্ষমতা, তাতে অসমর্থ যারা, আবার আধ্যাত্মিক ফাজলামি না ক'রে আমার বস্তুটির সঙ্গে চেপটে লেগে যাওয়া, তাও পারল না যারা, সেই তোমার চিন্তাশীলেরা যতই পাইকারী দরে যাচাই করতে চাইল জিনিসটা, ততই ভুল করল প্রতিবার।

তোমাদের ধারণার আর তোমাদের শব্দের না আছে বীচি, না আছে রস, না আছে গুণ, না আছে সার। ছোট ছোট প্রতিধ্বনি শুধু, শুধু এক

শক্তির অনুরণিত ক্ষয়। যেন সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত কতকগুলি সম্পর্ক, অমনোযোগী একটি গণিত। অন্য কিছু নয়।

ওরা ভাবছিল আমার সক্রিয় তত্ত্বটি, পীড়িত করছিল আমার আধ্যাত্মিক একতাটিকে।

জিনিসগুলো কী বা তারা তৈরি কী দিয়ে, তার সন্ধান না ক'রে যা করা উচিত ছিল, তা হচ্ছে সেই জিনিসগুলোকে সর্বাগ্রে ভালোবাসা জিনিস হিসেবেই।

তোমরা পেঁছোতে পারনি বুদ্ধির পাশব অবস্থায়।

জানোনি কী ক'রে নিজেকে মেলাতে হয় অন্যের সঙ্গে।

তোমাদের ভাব বা অভিমত? তোমাদের পেট কামড়াচ্ছিল।

যথেষ্ট।

অভিজ্ঞতা হতে প্রকল্পে, ধারণা হতে চিন্তায়, চিন্তা হতে উক্তিতে, উক্তি হতে অতীন্দ্রিয়ে, অতীন্দ্রিয় হতে বাসনার ক্রন্দনে,

বাচ্চা ছেলেরা, আরো একটুক্ষণ কথা ব'লে চল আমার তলায়, ঝনঝন ক'রে ভেঙ-পড়া কাচের যে-বিজাতীয় সংগীত, তার শব্দের ঘূর্ণমান অনন্তে......

এবং আরো, নাম দেওয়ার আর চেষ্টা ক'রো না তাকে যার নাম নেই।

ব্যস...সব। আর কিছু না। এবার চুপ কর। ফিরে চল বিভাসিত অজ্ঞতায়।

৩ : পারিবারিক দলিলপত্রে প্রাপ্ত

এত স্বপ্ন দেখলাম আমি এত স্বপ্ন দেখলাম যে আর যেন এ-জগতের নই।

প্রশ্ন ক'র না, বিব্রত ক'র না আমাকে।

আমার সঙ্গে এসো না আমার শহীদ-ভূমি পর্যন্ত।

আদেশ ব্যাখ্যা করার অধিকার তো দেওয়া হয় নি আমায়।

তা' নিয়ে ভাবারও নেই অধিকার।

অনেক দেরী হ'ল, এবারে উঠতেই হয়, আমাকে যেতেই হয়।

যমের একটি অনুমতি পেল সে, ও সে আসছে—

যে-পথ চলেছে রাত্রির দিকে, তার মোড়ে আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রে।

সমুদ্র গুটিয়ে আনে তার শেষ চাতালগুলি।

অন্ধকারে যে-প্রদীপটি জ্বলল প্রথম, তার বুকে তৃষ্ণা।

এক পা বাড়ানো পথের ওপর। ছায়া তার সামনে এগিয়ে এগিয়ে চলে,

ও সে শুল আমার উপর, আমার বুকের উপর তার মাথা।
ঐ এল সে।
প'রে তার সেই চিরকেলে গোল টুপিটা, হাতে নিয়ে সেই চিরকেলে ঝুলিটা—
যে-একই বেশে দেখেছিলাম তাকে, যেদিন সে ফিরেছিল ইতালী হতে।
তার চোখ দেখতে পাচ্ছি না। সে বলছেও না কিছু আমায়।
মূঢ় এক নুড়ির মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি ওর দিকে।
কিছুতে পারি না ওর ছায়াটা পেরিয়ে যেতে।
আরে? ভালো আছ? কী করলে এ্যাদ্দিন?
চ'লে আসনি কেন তোমরা?
রোজ, রোজ আমি যে তাকিয়ে থেকেছি পথে, আর তোমাদের দেখাই নেই।
এ-সবের ও মুখ ফুটে কিছুই বলে না।
কিন্তু ওর সব যেন নীরবে জিজ্ঞাসা করেঃ মনে পড়ে তোমার?
রাত্রি ওকে ঢেকে ফেলে আবার।

৭

চলতি কালের ফরাসী কবিতা

বোদলেয়ার অনেক দুঃখে বলেছিলেন, ফ্রান্স কবিতার দেশ নয়, সত্যি-কারের কবিতার প্রতি তার একটি বিজাতীয় আতংক আছে, এখানে দ্য মুস্যে ও সেই গোত্রীয় সুললিত পদ্য-লিখিয়েদেরই জয়জয়কার। সত্যি-কারের কবিতা কী, সে তো যুগযুগান্তরের প্রশ্ন এবং এমন উক্তির পেছনে যাই থাকুক, তার কঠিন আত্মগ্লানি, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অবিরাম ব্যর্থ প্রচেষ্টা, সব সত্ত্বেও সেই এক ও অদ্বিতীয় বোদলেয়ার আজ ফরাসী কাব্য জগতে পাঠকমাত্রেরই নমস্য। বোদলেয়ার যে-যুগে বেঁচেছিলেন, তার পরে বহু যুগ কেটে গেছে। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, পরিবর্তনের স্রোতে আদর্শ ও ধারণার রূপ এত বদলে গেছে যে তাকে আর চেনবার উপায় নেই—তবু আজ মেট্রোয় যেতে যেতে কখনো কোনো সুন্দরী তরুণীকে দেখি, হয়তো যাবে দশ বারোটা স্টেশন, মিনিট পনেরর পথ, হাতে তার বোদলেয়ারের তিক্ত মন্দ দিনের কুপুষ্প-চয়ন। পড়ছে সেঃ প্রকৃতি এমন এক মন্দির যার জীবন্ত খিলান হ'তে কখনো-কখনো অদ্ভুত সব ধ্বনি বেরোতে থাকে, চিন্ময় কোনো অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মানুষ যখন তাকে অতিক্রম করে, তারা পরস্পর পরিচিত সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায়।

চলতি কালের* স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো অস্তিত্ব নেই, পিছনের পটভূমিকায় তাকে না ফেললে তার স্বরূপ বোধগম্য হবে না। বলা বাহুল্য, ফরাসী কবিতা বলতে একেবারে অনন্য অথবা অদ্ভুত একটা কিছু নিশ্চয়ই বোঝায় না। দেশ কাল পাত্রে যেমন ভেদ আছে, অভেদও আছে। একই সেই অনুভূতি, আবেগ, আত্ম-প্রকাশের বাসনা সর্বত্রই ধ্বনিত। তবু কেমন যেন একটু একটু অন্যরকম। যেমন এখানকার এই ঘর বাড়ি, নিসর্গ শোভা, লোকেদের চোখ-মুখ-চেহারা, আমাদের সঙ্গে এ-সবের খুব একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই, তবু পার্থক্য আছে। ফ্রাঁসোয়া ভিল'-র সেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, লিরিকের জগতে এখানকার সেই প্রথম বসন্ত ঋতু, তারপর আরম্ভ হ'ল মিছিল একের পর এক, রেনেসাঁস-এর যুগ, অপূর্ব সব উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, তারপর এলেন ক্লাসিকরা, কর্ণেই, রাসিন এবং আরো অনেকে,

* এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে।

আবার লিরিকের যুগ, রোমাণ্টিকদের আত্মবিক্ষোভ, পরে এলেন পারনাস ও সিম্বলিষ্টরা। এবং এই সিম্বলিষ্টদের থেকেই আজকের ফরাসী কবিতার আরম্ভ।

রীতির দেশ, কলাকৌশলের দেশ ফ্রান্স। দৃষ্টির জগতে কারু শিল্পের যেমন চমৎকারিত্ব এইখানে, অন্তরের জগতেও নতুন নতুন ধারা, বাঁচবার, ভাববার নিত্য নতুন পদ্ধতি এরা আবিষ্কার করেছে ও ক'রেই চলেছে। যেমন এদের বাগানের গাছ কাটা, বসন্তে বসন্তে হরেক রকম পরিচ্ছদের উদ্ভাবন, তেমনি শিল্প ও সাহিত্যের এলাকায় নিত্য নতুন দর্শন, নতুন নতুন আঙ্গিকের অবিরাম মহড়া। তাই এই সব পারনাস, সিম্বলিষ্ট, ইম্প্রেশনিষ্ট, দাদা-ইষ্ট, স্যুররেয়ালিষ্ট, কতরকম শব্দই না এখানে শুনতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয়। চিত্রকলার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এখানে যত ঘনিষ্ঠ, আমাদের দেশে ততটা নয়। এক দলের যাত্রীর আলো অন্য দলের পথের অন্ধকার দূর করেছে। বিশেষত চিত্রকলা সম্বন্ধে এখানকার সাধারণ লোকও এত বেশি সজাগ যে তাই দেখে আমরা শুধু বিস্মিতই হতে পারি। এই শিল্প সচেতনতার প্রমাণ মেলে এখানকার অন্তহীন আর্ট গ্যালারিতে, প্রতি সপ্তাহের সংখ্যাহীন ছোট বড় মাঝারী প্রদর্শনীতে। কাফেতে যাওয়া, থিয়েটার দেখা, অতি তুচ্ছ লোকের পক্ষেও সৌন্দর্য জগতের অন্তত একটু আধটু খবরাখবর রাখা এখানকার জীবনের অঙ্গ। যে-প্রদর্শনী যেমনই হোক, কোনো নাটক ব্যালে অথবা অপেরা যত সাধারণই হোক, সময় মতো শ্রোতা ও দর্শক ঠিকই জুটে যায়—ভিড় সবখানে। তাই বোদলেয়ারের জীবনে শুধু এডগার পো-ই নয়, দ্যলাক্রোয়ার প্রীতিও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আজকের দিনেও দেখি শুধু মায়াকোস্কিই নয়, পিকাসো-ও আরাগঁ এবং এলুয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একজন আরেকজনের দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু সে-কথা পরে হবে।

একেবারে আত্মকেন্দ্রিক চেতনা, অকারণ মানসিক বিক্ষোভজনিত অনভূতি ও আবেগ, ছায়াবাজি, এ-সব হ'তে রেহাই পাওয়ার একটা দুর্দম বাসনা সিম্বলিস্টদের অনেককেই আকুল ক'রে তুলেছিল। এমন কি বোদলেয়ারও একবার উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, অতএব এই সব কুহকিনী ছায়া, রনে, দ্যর্বেমান ও হবার্থের, তোমরা ছিটকে পড়, শূন্যের ধোঁয়ায় মিশে যাক তোমাদের আলস্য ও নিঃসঙ্গতার দানবীয় সৃষ্টি সব, জেনেজারেথের হ্রদের মধ্যে শূকরদের মত তোমাদের মুগ্ধ অরণ্যের ছায়ায় তোমরা নিজেদের বিছিয়ে দাও, যেখান হতে বেরিয়েছে তোমাদের এই সব স্বকপোল-কল্পিত অরির দল, রোমাণ্টিক চেতনায় আক্রান্ত পাল পাল ভেড়া—সময়ের বিচার

তোমাদের স্থান দেবে না আমাদের মধ্যে, কাব্যের নিয়তি বড় কঠিন মনে রেখো। মালার্মেও অবিশ্রান্তভাবে খুঁজে গিয়েছেন এমন একটি অর্থ, যা অব্যর্থ, যা মানুষকে ঐশী চেতনার দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যাতে মানুষ ভুল আবেগ ও সুযোগের পথে স্বেচ্ছাচারী হবে না, তাকে বশ করতে পারবে। মানুষ অর্থে এখানে কবি, বলা বাহুল্য। ভালেরিতেও ঐ একই ধারণার পরিণতি। ভালেরি ছিলেন মালার্মের বন্ধু এবং তাঁরি পথের পথিক। লেখাকে ঐশী চেতনার মত দৃঢ় ও উজ্জ্বল ক'রে তোলা ছিল মালার্মের স্বপ্ন। ভালেরিও বারবার এই কথা ব'লে গেছেন, লেখাটা বড় কথা নয়, কী ভাবে লিখলাম, সেটাই বিবেচ্য—তার প্রতিচ্ছবি ও পরিণতি যেন আমাদের নতুন ক'রে নির্মাণ করতে পারে, সমৃদ্ধ করতে পারে। এঁদের বক্তব্য বড় অস্পষ্ট—তবে সৌভাগ্যের কথা, এত জীবন দর্শনের ঘোর প্যাঁচেও তাঁদের কাব্য সব সময় ভারাক্রান্ত হয় নি এবং সেইখানেই তাঁরা সাবলীল হয়েছেন, এবং এক কথায়, কবি হয়েছেন। ছায়াবাজির থেকে রেহাই পেতে চেয়ে আবেগ ও অনুপ্রেরণাকে এঁরা এমনভাবে বশ করতে চেয়েছিলেন যাতে কবিতা লেখা রীতিমত ব্যায়ামের পর্যায়ে প'ড়ে যায়। লজিককে প্রাধান্য দিতে দিতে ভালেরির পরিণতি অঙ্ক-প্রীতিতে, লেওনার্দোর প্রতি শ্রদ্ধায়। এত সত্ত্বেও, এই জীবন দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোকও তাঁর কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হবে এবং সত্যি কথা বলতে কি, ভালেরিকে ঐতিহ্য-অনুসরণকারী কবি হিসেবে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য ঐতিহ্য পন্থীদের সাম্প্রতিক সৌরজগতে ভালেরি যদি সূর্য হন, উল্লেখ-যোগ্য কয়েকজন গ্রহেরও তবে নাম করতে হয়। যেমন—শার্ল মোর্‌রা, ফ্রাঁসোয়া-পল আলিবের, রেমঁ শোয়াব, ভ্যাঁসাঁ মুসেইঈ, রজের আলার, জ়াঁ পেলব্যাঁ, ও ত্রিস্তাঁ দ্যরেম্।

এতো গেল একটু পরের কথা। আগে রইলেন সিম্বলিস্টরা। কাব্য জগতের গড্ডলিকাস্রোতে মোড় ফেরালেন তাঁরাই—ভাষার মুক্তি দিলেন, বাণী আনলেন, কত বিচিত্র ছবি, বিচিত্রতর অনুভূতির রাজ্য খুলে দিলেন পাঠকের চোখে। তবে বর্তমান কালটা স্বভাবতই বড় নিষ্ঠুর, অবুঝ, বধির। স্বীকৃতি প্রায় কেউই পান নি। তাঁদের প্রতিভা বুঝতে পৃথিবী সময় নিয়েছে, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সংঘাত অতিক্রম করেছে শুধু প্রাণপণ বিশ্বাসের জোর—এবং সে-বিশ্বাস ব্যর্থ যায় নি। আজ তাই র‍্যাঁবোকে নিয়ে কাহিনীর অন্ত নেই, তাঁকে দেবশিশু ব'লে যেন ঊনিশ বছরের কীর্তির অলৌকিকতাকে লোকে অনেকখানি সহজ ক'রে নিয়েছে। বাস্তবিক, যারা বোদলেয়ারকেই গ্রহণ করতে চায় নি, আইন্ ক'রে তাঁর বই নিষিদ্ধ

ক'রে দিয়েছিল, তারা যে র‍্যাঁবোর মত লাগাম ছেঁড়া এক ক্ষ্যাপাকে সহজে স্বীকার করবে না, এতে আর আশ্চর্য কী। কোথায় যেন পড়েছিলাম মনে নেই, বোদলেয়ারকে শুদ্ধ মদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর র‍্যাঁবো হচ্ছেন এ্যালকোহল। র‍্যাঁবো এত তীক্ষ্ন, এত তীব্র যে আজও তিনি সকলের জন্য নন। সবাইকার ধাতে র‍্যাঁবোর কবিতা সয় না। যাই হোক, সিম্বলিস্টরা কাব্যকে মুক্তি দিলেন, এক অর্থে তার নতুন জন্ম দিলেন। উনিশ শতকের শেষদিকেই জেরার দ্য নের্ভালকে বলতে শুনি যে তাঁর কবিতায় তিনি শুধু স্বপ্ন সঞ্চয় ক'রে যাচ্ছেন, তাতে এতটুকু লজিক নেই। এ-কথা গর্বের সঙ্গে তিনি বলেন নি, এ তাঁর খেদোক্তি। তার কিছু পরে র‍্যাঁবোও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কবির চোখ কান খুলে রাখার দরকার আছে, যথার্থ দার্শনিক না হয়ে তার উপায় নেই—এই অন্ধকার ও আবেগের পথে শুধু মৃত্যু চয়ন ক'রে কী হবে? নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে আশপাশের জগতকে চিনতে হবে ও তাকে সেইভাবেই প্রকাশ করতে হবে। তাঁর এক বিখ্যাত চিঠিতে (১৫ই মে, ১৮৭১) র‍্যাঁবো চেঁচিয়ে উঠেছিলেন এই ব'লেঃ এই একঘেয়ে আমির কথা থাক—আমি একটা অন্য জিনিস। আশ্চর্য, ঠিক একই সময়ে অজান্তে লোত্রেয়াম'-ও লিখছেন তাঁর কাব্য ও মালদোরের গীতি। তাঁর লেখায় আশ্চর্যভাবে একটি সচেতন মনোযোগের ক্রিয়া রূপায়িত হয়ে উঠছে, স্বপ্নের মত হ'লেও বাস্তবের কেমন যেন এক অনির্দেশ্য সম্বন্ধ সর্বত্র বিক্ষিপ্ত রয়েছে—যা বলছেন তা যদিও স্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গেই তাঁর হাত দিয়ে বেরোচ্ছে, তবু বক্তব্য ও বলবার ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটি সংযম লুক্কায়িত রয়েছে যেটা কিছু কম অস্বাভাবিক নয়। অন্য এক জায়গায় তিনি নিজেই বলেছেন, কাব্যের যখন বিচার করতে বসবে, তার ভার কাব্যের চেয়েও অনেক বেশি হওয়া উচিত—কারণ তখন তা তো শুধু কাব্য নয়, সে যে দর্শনও, কবিরা দার্শনিকদেরও মাথার ওপর চড়তে পারেন, কবি মাত্রেই ভাবুক। চলতি কালের কাব্যের এই গেল পটভূমিকা। তবে বুদ্ধির পথে যাত্রা করা মানেই সহজ হবার সাধনা নয়, এ শুধু স্বপ্ন, কুহক ও আবেগ থেকে মুক্তি পাবার একটা প্রবল বাসনা মাত্র। তাকে কেন্দ্র ক'রে অনেক আঙ্গিকেরও সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই সাধনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা ঘটল তা হচ্ছে বস্তুময়তা তথা মানবধর্মিতার বীজ তাতে নিহিত হয়ে গেল।

এর পরে আসছেন দাদা ও স্যুররেয়ালিস্টরা। ১৯১৮ সাল থেকেই যুদ্ধোত্তর শিল্পজীবির মন এই ক্রমোন্নত বুদ্ধির চমৎকারিত্ব প্রদর্শনে একটু গা আলগা করেছিল। এ'দের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে একটি দলের

অভ্যুদয় ঘটল যাঁরা নিজেদের দাদা ব'লে পরিচিত করলেন এবং যাঁদের মুখ্য বক্তব্য হ'ল ধ্বংসকারী শক্তির বিনাশ সাধন। এই দলে যে-সব কবি ও ভাবুক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আঁদ্রে ব্রতঁ, জ়াঁ পোলাঁ, পিকাবিরা, জ়াক ভাশে, মার্সেল দুশাঁ, রিবমঁ-দ্যস্‌সেইন, ত্রিস্তাঁ জ়ারা ও পিয়ের রভের্দি। এঁদের বক্তব্য বিষয় অনেক কিছুই ছিল, তবে সবই এত ধোঁয়াটে ও ঘোলাটে রঙের যে বহুক্ষেত্রেই তার অর্থ উদ্ধার পাঠকের পক্ষে তো দূরের কথা, স্বয়ং কবির পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়। ত্রিস্তাঁ জ়ারার লেখার একটা নমুনা দিই। ইনি রীতিমতো একজন বিখ্যাত কবি, বাংলা-দেশেই এঁর নাম শুনে এসেছিলাম। তবু কাব্য এঁর কেউই পড়ে না আজ়কাল, অন্তত ফ্রান্সে তো নয়ই। এমন কি এখানকার জাতীয় গ্রন্থা-গারে এঁর একটি মাত্র বই আছে। জ়ারা বলছেন,

রোজ জাগে এক নতুন আবেগ জাগে
যখন অন্য কত অগণ্য ম'রে প'ড়ে গেল অতীতে
ভাসে কোন্ দূরে ক্ষুদে শিকারীর হাসি
আহত চরণে চলা কার হ'ল সহসা বিড়ম্বিত
লজ্জায় মরে তিক্ত বান্ধবী

পড়ার পরে মনে হয় এর সঙ্গে "তেঁতুল-বটের কোলে দক্ষিণে যাও চ'লে ঈশান কোণে ঈশানী ব'লে দিলাম নিশানী"র কোনো প্রভেদ নাই। পাঠকের প্রতি কোনো রকমের দায়িত্বই এই সব কবি অনুভব করেন না। জ়ারা পরে বলছেন,

যে-জীবন তবু গাঁজিয়ে উঠেছে আমাদের এই মনে
ভীষণের সনে কোমল সুতোয় গ্রথিত
তোমাকেও দেখে হাসবে অশ্বারোহী
নির্ভয় তুমি চিনবে একদা অসম্মানের মার
বিশুষ্ক রসে তোমার শক্তি হারানো

কিন্তু এইভাবে কাব্য বেশিদিন চলতে পারে না, তাই ১৯২৪ সালের মধ্যেই দাদাইজম ভেঙে আরো অনেক নতুন 'ইজমে'র উৎপত্তি হ'ল। তাদের মধ্যে যা সবচেয়ে প্রবল প্রবং ভবিষ্যতের কাব্যকে যা সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে, তা হচ্ছে স্যুররেয়ালিজম। আঁদ্রে ব্রতঁ অবিসংবাদিত-ভাবে এই যজ্ঞের প্রধান হোতা। স্যুররেয়ালিজম্ শব্দটি প্রথম উচ্চারণ করেন গীইওম আপোলিনেয়ার তাঁর নাটক "তিরেজ়িয়ার স্তনের" প্রসঙ্গে। কিন্তু ব্রতঁ শব্দটিকে ব্যবহার করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আপোলি-নেয়ারের কাছে স্যুররেয়ালিজম্ ছিল আত্মার সংস্পর্শে বাস্তবের এক

ঘনীভূত সমৃদ্ধি—চাকার প্রসঙ্গে তাই উররে স্যুররেয়ালিস্ট ব্যাখ্যা তাঁর মনে এসেছিল। স্যুররেয়ালিজম্ বলতে আঁদ্রে ব্রত্‍ঁ বুঝেছিলেন শুদ্ধ মনের এমন একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা যার দ্বারা মানুষ বাক্যে হোক, লেখায় হোক অথবা যে-কোনো চিন্তা পদ্ধতিতে হোক, নিজেকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে চায়। তিনি নিজেও বলেছেন, যদিও স্বপ্ন ও বাস্তব আপাত দৃষ্টিতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা, তবু আমি বিশ্বাস করি তাদের অনিবার্য সংমিশ্রণে, যার ফলে বাস্তব বা রিয়্যাল হতে পারবে সুররিয়াল।

ব্রত্‍ঁ এবং আপোলিনেয়ারের কবিতাতেই তাঁদের এই নতুন জীবন দর্শনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। আপোলিনেয়ার এক জায়গায় বলছেন,

আমরা আমাদের দিতে চাই অভিনব এক বিপুল ব্যাপ্তি
ফুলের অর্থ সেখানে ফুলকে অতিক্রম ক'রে
তার কাছে ধরা দেবে যে তাকে খুঁজে পায়
কত সে-রঙ অশ্রুত অপূর্ব আগুনে দেখেছি
স্বপ্নময় কত-যে অলীক
যাদের শুধু বাস্তবের জীবন কাঠি দিয়ে একবার ছুঁইয়ে
দিতে হবে।

আঁদ্রে ব্রত্‍ঁর লেখায় দৈনন্দিন ও অতিপরিচিতকে কেন্দ্র ক'রে একটি অনির্বচনীয় বেদনার প্রকাশ। তিনি বলছেন, মুখের ওপর এমন একটি আচ্ছাদন ফেলে দাও যাতে দেখতে পাবে আরো ভালো। আরেক জায়গায় বলছেন, নিসর্গ শোভার সর্বত্রই যে পর্দার পর পর্দা ফেলা রয়েছে—আমরা প্রতীক্ষা করছি তার একটির পর একটির উন্মোচন এবং ফাতা মরগনার মধ্যেঃ

বলো তো আমাকে
যাত্রার পথে কী ক'রে রক্ষা করা যায় সেই কষ্টকর মানসিক সাম্য
যা মানুষ খুসীমত ধ'রে রাখতে পারে না
সেই গভীর অন্তরাল গাছপালায় আচ্ছন্ন
অন্য সকলের থেকে যে পৃথক অদ্ভুত অদৃশ্যভাবে
আমরা একদিন তাকে জীবনের যথার্থ কোণটিতে
আবিষ্কার করব ব'লেই তো সে রয়েছে

স্যুররেয়ালিস্ট আন্দোলনে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন লুই আরাগঁ, আর্তো, আঁদ্রে ব্রত্‍ঁ, রনে ক্রভেল, রবের দেনো, পল এলুয়ার, ল্যাঁব্যুর, নাভিই, পেরে, স্যুপো, ত্রিস্তাঁ জারা ও ভিত্রাক। ১৯৩২ সালে আরাগঁ স্যুররেয়ালিস্টদের ত্যাগ ক'রে কম্যুনিস্ট-পন্থী হন

এবং তখন থেকে তিনি এমন কিছুই লেখেন নি যা মার্কসীয় দর্শনের আলোকে আলোকিত নয়। এলুয়ারও কিছুদিন পরে আরাগঁকে অনুসরণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, প্রগতিশীল বিপ্লবাত্মক লেখক ও শিল্পীদের একটি সংঘ ধীরে ধীরে গঠিত হয় ভাইয়াঁ-কুতুরিয়ের-এর পরিচালনায়। কিন্তু এ-সব কথা পরে আসছে।

স্যুররেয়ালিস্টদের যুগে যখন সোবিয়েৎ রাশিয়ার বিপ্লব সারা জগতের চোখের সামনে আশা, আনন্দ ও বিস্ময়ের জ্যোতি তুলে ধরেছিল, তখন স্যুররেয়ালিস্টরা জান্তে হোক, অজান্তে হোক এই বিপ্লবের প্রতি তাঁদের সমস্ত সহানুভূতি দেখিয়েছেন, কখনো লেখার মধ্য দিয়ে, কখনো সোজাসুজি সুপরিস্ফুট আচরণের মধ্য দিয়ে। এমনি ক'রেই যা ছিল প্রথমে সিম্বলিষ্ট বা স্বপ্নের আধার, ধীরে ধীরে তার রূপান্তর ঘটল সুররিয়াল বা স্বপ্ন মিশ্রিত বাস্তবে, শেষে তার পরিণতি হ'ল আজকের রিয়্যাল বা পুরোপুরি বাস্তবে। কিন্তু এ পরিণতি যে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে, এমন নয়—অনেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের কথা আগে বলি।

মাক্স জ়াকব এবং জ়াঁ কক্‌তো কিম্ভূতকিমাকারের উপাসক—যার কোনো অস্তিত্ব নেই, যা একেবারে কল্পনা প্রসূত, সেই রূপকথার রাজ্য নিয়ে এঁদের কারবার। এবং ফ্রান্সের আজ এমনি ভাগ্য যে অনেক লোকের মতে জ়াঁ কক্‌তোই নাকি সবচেয়ে প্রিয় কবি বর্তমানে। কক্‌তোর লেখার মধ্যে দিয়েই তাঁর এই অদ্ভুত মনের পরিচয় দেওয়া ভালো। বলছেন,

একলাই থাকব বেশ আমার এই চাহনি নিয়ে
এই কাগজপত্তর যন্ত্রপাতি
আর আমার পাগলামি নিয়ে

এবং আরেক জায়গায়,

চোখ আধো-বোঁজা
একটি মাত্র দাঁত উঁকি মারছে
হাসির তীর থেকে
শীত শীত করে
কী এক মোহে ঘুমিয়ে আছি বহুকাল

কিন্তু এই মোহে ঘুমিয়ে থাকার গ্লানি তো আছে—জীবনে বিশ্বাস না থাকলে বাঁচা যায় না। এঁরা তাই সহজ ক্যাথলিসিজমের পথ বেছে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শার্ল পেগি আর পল ক্লোদেল-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ক্লোদেল বলছেন,

তুমিই ধন্য হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা করেছ
পৌত্তলিকতা থেকে, তোমারি কৃপায়
আজ তুমি ছাড়া আর কাউকেই আমি বন্দনা করি না—
আইসিস অথবা ওসিরিস, ন্যায়, প্রগতি, সত্য,
দৈব মনুষ্যত্ব, প্রকৃতির নিয়ম, আর্ট, সৌন্দর্য,
কিছুরি অস্তিত্ব আমার কাছে নেই।

পেগি বলছেন শার্ত্রের নোৎর দামের প্রসঙ্গে,

এই প্রান্তরের তীরে, সুন্দরী লোয়ারের এই বাঁকটিতে
আমাদের জন্ম হ'ল তোমারি জন্যে
এবং এই যে বালুর নদী, এই মহিমার নদী,
এ শুধু তোমার ভাবসৌম্য বসনটিকে চুম্বন ক'রেই ব'য়ে চলেছে।

প্রতি বছর মে মাসে এখানে পাঁতকোতের (*Pentecoste*) সময় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পারীর নোৎর দাম থেকে শার্ত্রের অভিমুখে পায়ে হেঁটে রওনা হয়। এই তীর্থ-যাত্রার উদ্বোধন করেন শার্ল পেগি। তাঁর যে-কবিতাটি উদ্ধৃত করলাম, সেটি এই যাত্রা নিয়ে লেখা। তবু যা আশ্চর্য, প্রতি বছর এই তীর্থ যাত্রী যুবক যুবতীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সনাতন-পন্থী পরিবারে ধর্মগত একটা ঐতিহ্য আছেই এবং এ-দেশে বিশেষ ক'রে সেই সব ক্ষেত্রে ধর্মের প্রকোপটা অসাধারণ বেশি, কারণ ধর্ম যে এদের ডিকটেটর, সে কোনো 'অথবা'র ধার ধারে না। কিন্তু সেই পরিবারগত ধর্মের কথা নয়, দুটি যুদ্ধে মানুষের বিশ্বাস আশা ভরসা আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। বিশেষত ফ্রান্সে এবং ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশে অবস্থাটা সত্যই ভয়াবহ। শিক্ষিত তরুণ মন, যারা সহজে শান্তি পেতে চায়, একটা বিশ্বাস আঁকড়ে ধ'রে কোনো রকমে বেঁচে যেতে চায়, তাদের পক্ষে খ্রীষ্টবাদী হওয়াই নান্যেব পন্থা। সোরবন-এর দেয়ালে-দেয়ালে একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলের পোস্টার, সভা-সমিতি আন্দোলনের কথা, অন্যদিকে এবং একই সঙ্গে তেমনি বড় বড় অক্ষরে লেখা—যীশু খ্রীষ্টই আমাদের একমাত্র আশা।

সাম্প্রতিক কাব্য জগতে আরো একদল আছেন যাঁদের সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে কারবার, চিরাচরিত ভাব, অনুভূতি, প্রেম, একটি তুমি, ফুল, পাখি, চাঁদ, নদীর তীর, স্নিগ্ধ হাওয়া, ইত্যাদিই উপজীব্য। এঁদের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যিনি সর্বপ্রধান, সবচেয়ে সুললিত ও গীতিমুখর, তিনি নিঃসন্দেহে জুল সুপেরভিয়েঈ। তাঁরো লেখার একটু নমুনা দিইঃ

চেয়েছিলাম একটি পপলার
অনতিদূর নদীর তীরে,
চেয়েছিলাম একটি নদী
যার তীরে তোমাকে বসাব—

তুমি আর তুমি, কে এই তুমি,
কাকে নিয়ে এত কথা উদ্বেল হ'ল?
আধখানা উত্তরই তার জানি,
আর আধখানা সে স্বাধীন,
আপন খুসীতে ওঠানামা করে।

'প্রগতিশীল'দের বাদ দিলে মোটামুটি এই গেল চলতি কালের ফরাসী কবিতার ধারা। 'প্রগতিশীল'রা অধিকাংশই মাকর্সপন্থী, এবং তাঁদের নিয়ে আশা করবারও যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য বাড়াবাড়ি সর্বত্রই আছে, এখানেও তার ব্যতিক্রমের অভাব নেই। আগামী দিনের কবিতা কেমন হবে, তার ভাষা, রীতি, ছন্দ, ছবি, শব্দ-ভাণ্ডার এই সব নিয়ে সময়ে সময়ে অনেক অদ্ভুত ও হাস্যকর ঘটনা চোখে পড়ে। কবিতার প্রসঙ্গে কোন মার্ক্সপন্থী কী বলেছেন, অথবা শব্দ ভাণ্ডার বাড়াবার জন্যে কবিতার মধ্যে টপোগ্রাফি, ব্যারোমিটার, হেলিকপটর, রাডার, ডায়েলেক্টিক, এ্যাটম, প্রভৃতি কথার আমদানি প্রসঙ্গ এবং এ-ধরনের আরো কত কী যে মার্ক্সবাদী পত্রিকায় নজরে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ কেউ আবার এতদূর যান যে বলেন, র‍্যাঁবো, রাবলে, ভিক্তর উগো প্রভৃতিকে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেবার সময় এসেছে। (দ্রষ্টব্য—১৯৫২-র নভেম্বর মাসের *La Nouvelle Critique*-এ জাক দ্যুবোয়ার প্রবন্ধ)।

কিন্তু যথার্থ যাঁরা কবি ও খাঁটি অর্থে প্রগতিশীল, তাঁদের লেখা পড়লে শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নুয়ে আসে। চরম দৃষ্টান্ত তার আরাগঁ এবং এলুয়ার। এই দুজনই আজকের ফরাসী কাব্যের একটা মস্ত বড় দিকের একচ্ছত্র অধিপতি। আরাগঁ কবিতা লেখেন নি অনেকদিন এবং এলুয়ারের মৃত্যু ঘটেছে, তবু তাঁরা শুধু শ্রদ্ধেয় ও অহরহর আলোচ্যই নন, তাঁদের পিতা ব'লে সম্বোধন করেন এই সব জাক দ্যুবোয়া, আল্যাঁ গেরাঁ, জ়াঁ জ়ুরফ্‌ফু, জ়াক রুবো, তোয়া কেরে প্রমুখ কবিরা। এবং এই দুজনের আলোচনাতেই এ-পক্ষের কবিতার সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব, কারণ এঁদের বাদ দিলে তার কোনো অস্তিত্ব নেই, শুধু তার কেন, সাম্প্রতিক ফরাসী কবিতারই একটা মস্ত অংশের কোনো অস্তিত্ব নেই।

আরাগঁ অথবা এলুয়ার, এই দুজনের যে-কোনো একজনের কথা পাড়লে আরেকজনের কথা আপনা থেকেই এসে পড়বে—কারণ একজনের জীবন, চিন্তা-পদ্ধতি ও লেখা আরেকজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত, যদিও প্রকাশের রীতিতে একজনের সঙ্গে আরেকজনের আকাশ পাতাল তফাৎ। দুজনেই নিজের বৈশিষ্ট্যে জাজ্জ্বল্যমান।

এলুয়ার আশ্চর্য কবি, যত পড়া যায়, ততই মুগ্ধ হতে হয়। সারল্য ও আন্তরিকতা যে কতদূর যেতে পারে, তার এত বড় দৃষ্টান্ত জানি না আর কোথায় আছে। তাঁর কবিতা পড়তে বসলে কখনো অভিধান ছুঁতে হয় না, এ যেন সেই শিশুর লেখা যে-শিশু গাছকে গাছ ব'লেই চিনেছে, এখনো বৃক্ষ বলতে শেখেনি—তবু কী গভীরতা, কী দৃঢ়তা, বিশ্বাসের আশার কী মরণজয়ী স্বাক্ষর এই শিশুতে। এলুয়ার যখন স্যুররেয়ালিস্টদের দলে ছিলেন, তখনো তাঁর সারল্য ও আন্তরিকতা সমানই ছিল। তখনকার দিনের তাঁর একটি কবিতা শোনাই,

তোমায় বলেছি এই কথা মেঘের হ'য়ে
সমুদ্রে নিদ্রিত গাছের হ'য়ে
প্রতিটি ঢেউ-এর হ'য়ে বলেছি
পাতার আড়ালের পাখির কথা
পাথর ছড়ানো শব্দে হাতের পরিচিতিতে
সেই চোখ যা সহসা মুখ কিংবা নিসর্গ হ'ল
যে-নিদ্রার পরে আকাশ ফিরে পেল তার রং
তাদের সকলের হ'য়ে বাষ্পমথিত রাত্রির হয়ে
পথের বেসুরো ধ্বনি খোলা জানালা আর
নতুন ক'রে চেনা কপোলের হ'য়ে
তোমাকে বলেছি এই কথা তোমারি চিন্তার হ'য়ে
বলেছি তোমারি কথা।

পরে এলুয়ারের পরিণতি। এক জায়গায় আরাগঁ সম্বন্ধে বলছেন, যত কবিদের আমি চিনি, তাঁদের মধ্যে আরাগঁরই যুক্তি সমস্ত দানবদের বিরুদ্ধে, এমন কি আমার নিজের বিরুদ্ধেও, তিনি আমাকে দেখিয়েছেন ঠিক পথ এবং তা' তিনি আজও তাদের সকলকেই দেখাচ্ছেন যারা কখনো বুঝতে শেখেনি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানেই সুস্থ জীবন আদর্শের জন্য লড়াই করা, যে-জীবন অন্তহীন আশায় পুষ্পিত ও প্রকৃত বিশ্ব-প্রেমের দ্বারা উদ্বোধিত। এবং আরাগঁ বলছেন এলুয়ারের সম্বন্ধে, এক-

দিন পিয়ের দ্যুপ'কে নিয়ে লোকে পাগল হয়েছিল, আজকে এসেছেন এলুয়ার।

র‍্যাঁবোর সঙ্গে এলুয়ারের এত মিল, অথচ এত অমিলও। একই গীতি-প্রবণ মন, প্রকাশের রীতিও বহু জায়গায় ঠিক একই খাতে চলেছে, যদিও একজনের আমির সঙ্গে আরেকজনের আমির একটা মস্ত বড় পার্থক্য আছে—এলুয়ারের আমি সর্বজনীন। আত্মকেন্দ্রিক গ্লানির সমুদ্রে এক জনের মাতাল তরণী বানচাল হ'ল, নরকে-নরকে দীর্ঘ দিন যাপন ক'রে বেড়ালেন, আরেকজন দৃঢ় বিশ্বাসের পথে, সরল মানবতার পথে সমস্ত অন্ধকারকে লাথি মেরে গেয়ে উঠলেন,

আমার জন্ম এক বীভৎস পথের প্রান্তে
শুধু খেয়েছি হেসেছি স্বপ্ন দেখেছি আর সরমে মরেছি
বেঁচেছি যেমন ক'রে বাঁচে অন্ধকার
তবু সূর্যের গানও গাইতে শিখেছি

এইখানেই যথার্থ এলুয়ার। এ যেন সেই সনাতন আদাম, যার আষ্ঠে-পৃষ্ঠে শয়তানের সাপ—তবু আজো সে অপাপবিদ্ধ, সঙ্গী সমস্ত অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারকে ঐ লাথি মারবার জন্যেই উদ্যত। এলুয়ারের আরেকটি কবিতা দিয়ে তাঁর আলোচনা শেষে করি,

রীতির এমন উত্তাপ মানুষের
আঙুরকে তা মদে পরিণত করে
আগুন জ্বালিয়ে গালে কয়লা হ'তে
চুম্বন হতে নতুন মানুষের জন্ম দেয়

সে-রীতি এমনি কঠিন মানুষের
হাজার যুদ্ধ সত্ত্বেও হাজার
দুঃখ ও মৃত্যুভয় পেরিয়েও
নিজেকে ঠিক রাখে সে
রীতির এমনি মাধুর্য মানুষের
জলকে সে আলোতে রূপান্তরিত করে
স্বপ্নকে করে বাস্তব
শত্রুকে করে ভাই

একই সে-রীতি নতুন ও সনাতন
শিশু হৃদয়ের তলদেশ হ'তে

চরম পরিণতির পথে নিজেকে
কেবলি পূর্ণতর ক'রে চলেছে

আরাগঁ'র নাম ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি। তাঁর সম্বন্ধে এখানকার সাধারণ শিক্ষিত সমাজের ধারণা, এমন কি কোনো-কোনো সাহিত্যিক মহলের এই রকম মত যে তাঁর এবং এলুয়ারের মতবাদে হাজার সাদৃশ্য থাকলেও দুজনের প্রধান তফাৎ এইখানে, এলুয়ার মূলত কবি, আরাগঁ মূলত রাজনৈতিক। বাস্তবিক, আরাগঁ লেখা ছেড়েছেন বহুকাল, এখন তাঁরই সম্পাদিত *Lettres Francaises*-এ মাঝে মাঝে শুধু প্রবন্ধ লেখেন সাহিত্য-সংক্রান্ত রাজনীতি নিয়ে অথবা রাজনীতি সংক্রান্ত সাহিত্য নিয়ে। তবু যতদিন তাঁর কবিতায় চোখ বোলানো ছেড়ে তাঁকে অনুবাদ করতে না বসেছি ততদিন বুঝতেই পারিনি কেন এই রাজ্যসুদ্ধ লোক আরাগঁ'কে নিয়ে পাগল, কেন এলুয়ারের মত কবি আরাগঁ'কে তাঁর শ্রদ্ধেয় কবি ব'লে স্বীকার করেছেন, কেন শিল্পাচার্য পিকাসো এলুয়ারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরাগঁ'র স্তুতিগানে উচ্ছ্বসিত, কেনই বা আঁদ্রে জ়িদ হঠাৎ একদিন লিখে বসলেন, যাই বল, আরাগঁ অতুলনীয়, আরাগঁ যথার্থই প্রতিভাবান, আজ সকালে কাস্‌স্যুকে এই কথাই আমি বলেছি।

আরাগঁ'র একটি কবিতার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করছি। অনুবাদ যতই অসমর্থ হোক, এ-কথা বুঝতে কারুরই কষ্ট হবে না—যে আরাগঁ'র কোনো লেখা এর আগে পড়েনি, তার পক্ষেও নয়—যে আরাগঁ'র কবিতার ওপর কোনো ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে, প্রতিটি শব্দ-চয়নেও প্রতিভার স্বয়ং-সম্পূর্ণ জ্যোতি। কবিতাটি লেখা ১৯৩৯-৪০ সালে বিগত যুদ্ধের বিভীষিকার পটভূমিতে—পারী হস্তগত শত্রুর দ্বারা, কিং-কর্তব্যবিমূঢ় জনগণ, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে যথাসময়ে তবু বসন্ত, মাঠে মাঠে লীলা আর গোলাপের ছড়াছড়ি, সেই রঙে রঙ মিলিয়ে পাশাপাশি প'ড়ে আছে শহীদের তাজা রক্ত, এদিকে অসহায় উন্মত্ত জনতা ঘামে, ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে, শুধু পালাবার জন্যে, বাঁচবার জন্যে ব্যস্ত।

পুষ্পাকুল হায় ঋতু পরিবর্তনের
মে মাস নির্মেঘে গেলে জুন রক্ত ছুরিকা চিহ্নিত
ভুলব না কোনোদিন এই লীলা এই গোলাপেরে
ভুলব না যারা আজ বসন্তের আড়ালে আহত
ভুলব না কোনোদিন এই ক্রুর অকরুণ মায়া
সূর্য আর কান্না আর ভিড় আর সন্ত্রস্ত মিছিল

গাড়ীতে প্রেমের রঙগ বিকলাঙ্গ কিছু উপহার
বেলজিয়মের স্মৃতি বাতাসে আতঙ্ক পথে অনাবিল
মুখর মৌমাছিহীন জয়ের স্পর্ধায় কলহের ইতি
রক্তে রক্তে মেঠো ফুলে চুম্বনের ব্যাপ্ত পরিচয়
মরণ যাত্রীরা ঠায় দাঁড়িয়েছে স্তম্ভ ঘেঁষে ঘেঁষে
ঘিরেছে লীলার গন্ধ খ্যাপা এই লোকারণ্যময়

তবু এ-সব তো গেল কিছুদিন আগেকার কবিতা। অতি-আধুনিক অবস্থাটা বোঝা মুস্কিল। তবু এটা বুঝতে কিছু কষ্ট হয় না যে পাঠক-গোষ্ঠী আর কবিতা পড়তে চায় না। আপাতত এক অর্থে কবিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। তবু এইটুকু দেশে দশ হাজার কবি, প্রকাশকরা বই ছাপতে চায় না, পত্রিকার সম্পাদকরা উদীয়মানদের প্রেরিত পাণ্ডুলিপি ফেরৎডাকে চালান দেয়, যার পয়সা আছে সে নিজের বই নিজে ছাপে। উপন্যাস ও ছোটো গল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবিতা নাকি এগোতে পারছে না—বদ্ধ জলার ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে চরকি বাজী খাচ্ছে। একজন কবিকে জানি, তার কবিতা কেউ পড়ে না, ছাপতেও চায় না—সন্ধেবেলা সেন-এর তীরে শান বাঁধানো এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় প্রেম ক'রে বেড়ায় আর বলে, আমার প্রেমিকা যদি জানতে পারে যে আমি কবি, তক্ষুণি আমাকে বয়কট ক'রে দেবে। অথচ ছেলেটি বেশ লেখে। কবিতা পত্রিকাও এখানে একাধিক আছে, কী ক'রে চলে, কে জানে! কলকাতার বড়োবাজার মার্কা গলিতে তাদের আপিস, পোড়ো বাড়ি, দিনের বেল'তেই সর্বক্ষণ আলো জেবলে রাখতে হয়, কাঠের গুদামের পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি উঠে গেছে, ঘরের মধ্যে সম্পাদকের সামনে কয়েকজন ক্ষীণকায় তরুণ তাঁদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গদ-গদ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন—ধুতি চাদরটি পরিয়ে দিলে বাঙালি কবিদের সঙ্গে তাঁদের বড় একটা পার্থক্য থাকবে না।

অবশ্য কপালে থাকলে যদি একবার একটা আরাগঁ অথবা এলুয়ার হয়ে যাওয়া যায় তো আলাদা কথা। তখন কবিতার বই যেচে ছাপবে প্রকাশকরা, বই-এর দোকানের মালিক রাস্তার ধারের কাঁচের জানালায় লেখকের ছবি টাঙিয়ে দেবে, বই বিক্রীও হবে—তবে লোকে পড়বে কিনা বলা শক্ত। এক পরিবা'রকে জানি, তাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখি সুদৃশ্য টেবিলে থরে থরে এলুয়ারের রচনাবলী সাজানো রয়েছে—সেগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে কর্তা বল'লেন, মস্ত বড় কবি। একটা কবিতা আমি খুঁজছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, কোন বই-এ পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক খানিকটা ভেবে বললেন, তা তো বলতে পারি না, অল্পই পড়েছি, সব বুঝি না, আধুনিক কবি কিনা—

তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি কয়েকদিনের জন্যে গোটাকতক বই নিয়ে যেতে পার। ব্যাপারটা মুহূর্তেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এরা কবিতা পড়ে না—কারণ এলুয়ারকেও যে বুঝতে পারে না, তার বুদ্ধি বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ পর্যন্ত পৌঁছয় নি। অথচ সেই একই পরিবার বাল্মীকি-প্রতিভার কোন গানে বিদেশী কোন গানের ছাপ রয়েছে, তা একবার শুনলে ব'লে দিতে পারবে।

অর্থাৎ চলতি কালের ফরাসী কবিতার প্রসঙ্গে আরাগঁ এবং এলুয়ারে এসেই থামতে হ'ল। তাঁদের প্রতিভাকে সর্বান্তঃকরণে নমস্কার ক'রেও শেষে এইটুকু বলি, মানুষ যেখানে অনন্ত একলা, যেখানে একজনের সঙ্গে আরেকজনের অকূল অপারের দূরত্ব, সেখানেও সে বিরাজ করে, সেখানেও তার কথা, ভাষা ও সুরের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি জিনিসেরই দুটি রূপ আছে, এক রূপ তার আকাশের, এক রূপ নিভৃত অন্তরের—এক জায়গায় সে সর্বজনীন, সম্পূর্ণের একটি অংশ মাত্র, অন্য জায়গায় সে একান্তভাবে আপনার, নিজেই নিজের প্রভু। এ-দুয়ের মধ্যে যে-বিরোধ, সেটা আপাত মাত্র। সার্থক সমাজব্যবস্থা দুজনকেই গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, উল্টো-টাও মানি—কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় সর্বনাশ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারায় নপুংসকত্বের ঘোষণা ও জীবনের যথার্থ দিক হ'তে পলায়নবৃত্তি গ্রহণ করা।

৮

স্যাঁ-জন পের্স

তাঁর সম্বন্ধে বলার কোনো চেষ্টা তিনি নিজেই করেন নি ব'লেই নয়, স্যাঁ-জন পের্স সম্বন্ধে লেখার কিছু নেই। যা' আছে করার, যদি কিছু করতেই হয় তাঁর সম্বন্ধে, তো তাঁর কবিতা পড়ার, একবার নয়, দুবার নয়, বারবার। পড়া ততক্ষণ (এবং তার পরেও আরো আবার), যতক্ষণ না সেই কবিতার রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে পৌঁছোয় পাঠকের গন্তব্যে, যে পড়ছে সে ধরতে আরম্ভ করে যা ধরার। তাঁর সম্বন্ধে লেখার প্রগলভ প্রয়াসের ভূমিকায় তাই আমার সবিনয় মার্জনা-ভিক্ষা।

তবু কেন? যা বললাম, তা কি কম বেশি প্রযোজ্য নয় সমস্ত সার্থক কবিরই ওপর? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—অন্তত আপেক্ষিকভাবে। কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে আমরা এমন একটি স্বতন্ত্রের সামনে, তিনি এমন একটি মূর্ত স্বতন্ত্রতা যে তাঁর কথা সত্যিই আলাদা। একটি বিশেষ, যিনি অতুলনীয়, যাঁকে মেলানো গেল না, যিনি গেলেন না ঐতিহ্যের স্রোতে অথবা উজানে, কিন্তু গ'ড়ে তুললেন একটি ঐতিহ্য নিজে-নিজেই। সেই ঐতিহ্যের স্বরূপটি কী, তাই নিয়ে তাঁর অতি মুষ্টিমেয় যথার্থ ভক্তদের কয়েকজন লিখেছেন সামান্য। এবং তাঁর উপর যা-কিছু লেখা হয়েছে আজ পর্যন্ত, তা প্রায় ক্ষেত্রেই হয় তাঁর আঙ্গিক নিয়ে, অথবা নিয়ে তাঁর ভাষাগত বৈচিত্র্য বা ব্যাকরণের দিকটা। এবং যে ক'জন অবশেষে সেই কবিতার, পের্স-এর, সত্তাটি ছুঁতে অথবা তাকে আপন আপন ইচ্ছা ও অনুভূতির আলোকে উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা আগা গোড়া ব্যাপারটার ইতি টেনেছেন দুয়েকটি কথায়। আমি আজো দেখতে চাই, পাইনি, একটি স্বচ্ছ সুপরিস্ফুট বর্ণনা এই কবি মানসের। হয়তো একদিন তাঁর ওপর লেখা হবে ভূরি ভূরি, হয় তাঁর সিম্বলিজম নিয়ে বা তাঁর কাব্যিক আংগিকের ওপর—হয়তো তাঁর ভক্ত সংখ্যাও বাড়বে একদিন প্রভূতভাবে। তবু আমার বিশ্বাস সমানই দৃঢ় থাকবে, আশা করি, যে তাঁর সম্বন্ধে আর যা-কিছু লেখা চলতে পারে, তা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করেছেন তাঁর অতি বিশিষ্ট কবিতায়। আমি যা করতে চেয়েছি এখানে, তা শুধু শ্রদ্ধাঞ্জলি-অর্পণ।

পের্স-কে গত বছর* সুইডিশ এ্যাকাডেমি ভূষিত করলেন বিশ্বের

সর্বোত্তম সাহিত্যিক সম্মানে—তার আগে, একটি অতি ক্ষুদ্র সাহিত্য রসিক গণ্ডী বাদ দিয়ে, তাঁর নাম ছিল অকথিত ও তাঁর কাব্য অব্যাপ্ত। প্রথম প্রশ্ন যা সহজেই কোনো অনুসন্ধিৎসু জানতে চাইবেঃ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার এমন একটা প্রচণ্ড ব্যাপার—তাই তার সর্বশেষ অধিকারী এই অজ্ঞাতটি কে? এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে, এই লোকটিকে সেই প্রচণ্ড সম্মানটি দিয়ে সুইডিশ এ্যাকাডেমি কি সুবিচার করলেন? সুইডিশ (বা অন্য যে কোনো) এ্যাকাডেমির সুবিচার বা অবিচারের ওপর কোনো কাব্যের বা কবির নিয়তি নির্ভর করে না—কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তরের প্রয়োজন আছে।

তার আগে, আরো একটি ছোট্ট ও অতি সাধারণ কথা। সাধারণ, কারণ তা অবিশেষভাবে প্রযোজ্য সমস্ত বড় কবির রচনার সম্বন্ধে। কথাটি হ'ল এই। আমি তাঁদের হয়তো একজন নই, যাঁরা প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমে পড়েছেন পের্স-এর কবিতার সঙ্গে। যাঁরা ব'লে উঠেছেন, কয়েকটি পংক্তি মাত্র একটিবার প'ড়েই, কী অপূর্ব কাব্য, কী অপূর্ব কবি! অথচ আমি সেই তাঁদের নিশ্চয়ই একজন যাঁরা সেই কবিতায় যাত্রার প্রারম্ভের ও অন্তের দুটি বিন্দুর মধ্যে বহুদিন ধ'রে বহুবার আনাগোনা করার পর অনুভব করবেন আত্মার ঘামে যেন এইবার সিক্ত হ'য়ে উঠেছে হৃদয়, মেনে নেবেন পের্স-কে এ-যুগের এক শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে। যে-ভাবে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে পাশ্চাত্ত্য যেন রাতারাতি আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথকে, পের্স-এর সেই রকম কোনো আবিষ্কারের যাঁরা আশা করেন পৃথিবীর হোক না যে-কোনো প্রান্তদেশে, এই নোবেল পুরস্কারের পরেও, তাঁরা হয়তো অনেকখানি আশা করেন। এই ব'লে খাটো করছি না রবীন্দ্রনাথকে, অথবা পের্স-কে, শুধু মেনে নিচ্ছি দুটি কবির দুটি বিভিন্ন রাজ্যকে। তুলনা করার কোনো প্রশ্নই নেই কোনো বিশ্ব কবির সঙ্গে এই বিশ্ব কবিটিকে, এই সমুদ্রের, হাওয়ার, মরুভূমির, এই সময়হীন মানুষের ও বিচিত্র বিশ্ব জগতের কবিটিকে।

কী ভাবে বিচিত্র তিনি, বা কেন প্রথম দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যের সঙ্গে প্রেমে পড়া অসম্ভব—এর কোনো সার্থক আলোচনায় নিহিত প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি, যে-প্রশ্ন তোলা সুইডিশ এ্যাকাডেমির সম্ভব সুবিচার বা অবিচার প্রসঙ্গে। আলোচনার সুবিধার জন্যে, আগে নেওয়া যাক দ্বিতীয় অংশটি জিজ্ঞাসারঃ কেন তাঁকে ভালো লাগতে দরকার সময়ের?

স্যাঁ-জন পের্স নিশ্চয়ই 'শক্ত' কবি নন সেই অর্থে যে-অর্থে অন্যান্য অনেক আধুনিক কবি 'শক্ত' এবং তাঁর ভক্তদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই নিয়ে বেশ লাফালাফিও ক'রে থাকেন, তাঁর ভঙ্গীর সারল্য এক অর্থে

আজকের যুগে অভাবনীয়, তা নিছক আঙ্গিক-প্রেমিক এক শ্রেণীর পাঠকের খুব শ্লাঘার বস্তুও নয়। কিন্তু তিনি শক্ত, বা তাঁর কবিতা শক্ত, একেবারে অন্য অর্থে।

এ-ব্যাপারে যা প্রথম ও সবচেয়ে প্রধান কথা, তা হচ্ছে এই কবির কবিতার বালাই নেই কোনো বিশেষ ঐতিহ্যের, তাই বালাই নেই কোনো পরিচিত কাব্যিক সংস্কারের। মানস ভিন্ন ব'লেই তার প্রকাশের প্রয়াসও এখানে নিয়েছে ভিন্ন বাহ্যিক রূপ। পের্স-এর কবিতার প্রসঙ্গে তাতে এক অস্ফুট ঐতিহ্যের কথা অনেকে বলেছেন, যে-ঐতিহ্যের ধ্বনি র‍্যাঁবোতে, মালার্মে-তেও, ক্লোদেল-এ—সে-ধ্বনি ক্ষীণ। তবু মানতেই হবে, গত একশো বছর ধ'রে ফরাসী কবিতায়, তার ভঙ্গী ও মানসে, যে-বিপ্লব ঘটেছে, আজো ঘটে চলেছে, তা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা, ও তার প্রভাব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত কোনো কবিই নন আজকের ফ্রান্সে, নন পের্স-ও নিশ্চয়ই, তাঁর বহু বিশিষ্ট লেখা 'নির্বাসনে' লিখিত হ'লেও। কারণ সেই প্রভাবটা যদি বন্ধন, সেই বন্ধনকেই কবিরা নিয়েছেন মুক্তির উপায় হিসেবে।

এই বিপ্লবী কাব্য দেখল কবিতা মাত্রেই প্রতিবাদ, প্রতিবাদ অপূর্ণতার বিরুদ্ধে, বিরুদ্ধে অসুন্দরের, গদ্যের, খণ্ডের, যে-অসুন্দর, যে-খণ্ড একমাত্র অসত্য। সত্য তা-ই শুধু যা অসুন্দরের সেই স্তূপকে অস্বীকার করে, সত্য একমাত্র তা-ই যা ব্যক্তিগত মানসের ঊর্ধ্বে নির্বিশেষে পূর্ণ, নির্বি-শেষে সুন্দর। তাই প্রয়াস কেবলি ভাঙার, কেবলি নতুন ক'রে গড়ার, প্রয়াস বিশেষ হ'তে অবিশেষে যাওয়ার, ব্যক্তিগতের তীর হ'তে ওপারের অব্যক্তিক তীরে অভাবনীয় উত্তরণে। কিন্তু তা ঘটবে কেমন ক'রে, যখন সম্বল শুধু কথা আর অনুভূতি যা নির্মমভাবে নিতান্ত ব্যক্তিরই? স্বল্প কথায় ও খানিকটা হেঁয়ালির পথ ধ'রে (কারণ একটি মেঘকে স্বেচ্ছায় জোর ক'রে রেখে দিতেই হবে পর্দার মতন সমস্ত কাব্যিক অভিনিবেশে) উত্তর হবে তখনঃ একটা প্রচণ্ড সুবিধা র'য়ে গেছে কথায়, যা একান্তভাবে ব্যক্তিক নয়, যা সর্বসাধারণ অস্ত্র কবিদের। এবং সেই কথা যেহেতু সকল কাব্যের অনিবার্য বাহন, কবিতার সম্ভাবনা আছে অব্যক্তিক হবার। এই ছিল মালার্মের গোড়ার কথা। আর অনুভূতি, যদিও সে আরম্ভে মাত্র ব্যক্তি বিশেষেরই, তাকে কবির তপস্ পৌঁছে দিতে পারে একটি সামগ্রিক অনু-ভবের রাজ্যে, যখন তার ব্যাপ্তি ঘটতে পারবে হৃদয় হ'তে হৃদয়ান্তরে। আসল কথা, কবিতাকে হ'তে হবে একটি পূর্ণ অভিজ্ঞতা, নীরন্ধ্র, ভেজাল-হীন, অভিজ্ঞতা শুধু কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয়, যা নয় প্রতীক শুধু

সীমাবদ্ধ একটি বিচ্ছিন্ন জীবনের, কিন্তু যা প্রতীক মহাজীবনের। তাতে ছায়া পড়বে গতির ও স্তব্ধতার, তা যেন এক নটরাজের (ভারতীয় এই ভঙ্গিমার প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়তো অবান্তর ঠেকবে না) নাচের ছন্দে হবে একই সঙ্গে মুক্তিকামী ও মুক্তিদাতা। এমন কি তার বাহ্যিক উপাদান, কথা ও ভঙ্গী, হবে পাত্র অমৃত ধরার, তারা ছোঁবে, যেন তীরের মত গিয়ে বিঁধবে, অব্যক্তকে অব্যর্থভাবে. হবে নিজেরাই সকল প্রয়াসের সেই প্রার্থিত চরম, হবে অব্যক্ত। যত বড় বিপ্লবী সে হোক না কেন, এ-রকম একটি প্রয়াস শেষ পর্যন্ত কতখানি জয়যুক্ত হবার সম্ভাবনা রাখে, তা একবারে অন্য প্রশ্ন ও তার আলোচনার অবকাশ কবিতায় নেই, কবিরা ব্যস্ত তপে। এ একটি যাদুকরী প্রক্রিয়া, প্রায় বৈজ্ঞানিক, যাকে র‍্যাঁবো বললেন শব্দের রসায়ন, ও যার চেতনা উদ্বুদ্ধ করল শুধু গত একশো বছরের ফরাসী কাব্যের একটি বৃহৎ জগতকেই নয়, তার সুপরিস্ফুট ছাপ পড়ল সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের কবিতাতেও। তান্ত্রিক গুরু বোদলেয়ার ও তাঁর চেলা-গোষ্ঠী, 'দ্রষ্টা' র‍্যাঁবো, গণিত-প্রেমিক মালার্মে ও ভালেরি ও পরের স্যুর-রেয়ালিস্ত-রা আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন এই পদ্ধতিকে, ধাপের পর ধাপে, কবিতাকে ক'রে তুলতে এক ক্রমশই পূর্ণতর অভিজ্ঞতার অস্তিত্বমণ্ডিত, তাকে মুক্ত করতে আমি-র কেন্দ্রিকতা হ'তে। বাহির ও বস্তুর সঙ্গে নিজের এক অতি প্রাকৃত তন্ময়তার মাধ্যমে কবিতা চাইল মেলাতে সত্য ও স্বপ্নকে, কবি ও ভিড়কে। তাই এলুয়ার চাইলেন সেই শেষ মুক্তি কথার, যা দিয়ে গাঁথা হবে মানুষের ঐক্য। তাই বললেন রনে শারঃ 'কবিতা যে চেয়েছে আমাদের অব্যক্তিক ক'রে স্বাধীন করবে আমাদের, তাই তারই করুণায় আমরা ছুঁতে পারি সেই পূর্ণতা যাকে ব্যক্তির খেয়াল-খুশী ভাঙে-চোরে।' কিন্তু লক্ষ্য এক হলেও এই এত কবিদের পথ বিভিন্ন—অনন্তে পোঁছোনোর আগে তাঁদের কেউ যে কাউকে রাস্তায় খুঁজে পাবেন, সে-রকম সম্ভাবনা কম।

আপাত দৃষ্টিতে এই সাধারণ ঐতিহ্যের মূল ধারার সঙ্গে স্যাঁ-জন পের্স-এর সম্বন্ধ ক্ষীণ মনে হ'লেও গভীরের অন্তরালে তাঁর কবিতার একটি অন্যতম বক্তব্যের সঙ্গে এই ঐতিহ্যের প্রধান প্রতিপাদ্যের নাড়ীর যোগ। তিনিও চেয়েছেন কবিতাকে একটি সমগ্র চেতনার বস্তু ক'রে তুলতে, তাকে জাগাতে একটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার অভীপ্সায়। কথা তাঁর কবিতাতেও হয়েছে উপকরণ যাদুকরের, যদিও একটু অন্যভাবে। কথার ওপর এই জোর, ভঙ্গী বা আঙ্গিকের এই সর্বশক্তিমত্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই যে-প্রশ্ন, তার সম্যক আলোচনা একেবারে বাদ দিলে পোঁছোনো শক্ত

হবে এই শ্রেণীর কোনো উল্লেখযোগ্য কবির অন্তঃপুরে। কথা, বা ভঙ্গী, আঙ্গিক, তা যেন এই কবিদের হাতে হ'ল ক্ষুদ্রকায় একটি ছিপ, যা পার্থিব সমস্ত কিছুর মতই মর ও ভঙ্গুর, কিন্তু তাই দিয়েই তাঁরা ধরতে চেয়েছেন অব্যক্তের সেই রাঘব বোয়ালটিকে, নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে, অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্যকে অস্বীকার ক'রে, অটল প্রতিজ্ঞায়, অব্যর্থভাবে।

কিন্তু স্যাঁ-জন পের্স-এর ক্ষেত্রে কবির স্থান অতি চিহ্নিত, সে নয় যে-কোনো যাদুকর এবং যে-কোনো যাদুকরই নয় কবি। যে-কর্তব্যের অঙ্গীকার তার জীবনে, একমাত্র তারই ক্ষমতা আছে সেই অতি বিশিষ্ট কর্তব্য-পালনের। সেই পারবে রাঘব বোয়ালকে ডাঙায় তুলতে, অটুট প্রত্যয়ে, নির্ভুল নিরন্তর এক পদ্ধতিতে, যে-পদ্ধতির খুঁটিনাটী বিজ্ঞান জানা একমাত্র তারই। তারই অধিকার অভিজ্ঞতার সমগ্রতাটিকে লিপিবদ্ধ করার। সেই কবির উক্তি পের্স-এর 'সমুদ্রচিহ্ন'-এর আবাহন অংশে।

> "আমি নিয়েছি লেখার ভার, লেখার সম্মান করব আমি। যেমন সে-মানুষ যে এক মহান মনোযুক্ত কাজের ভিত্তিস্থাপনে এগিয়ে এসেছে, জানিয়ে যে সে তৈরি করবে লিপি আর ঘোষণা, তাকে ডাক দিলেন দাতা পরিষদ, এ-কাজের প্রতি একমাত্র তারই যে আছে ব্রতের ভাব। আর কেউ তো জানতো না কী ভাবে হাত দেবে কাজেঃ কোনো-কোনো পাড়ায় তুমি শুনবে কথা ঘোড়া-জবাইকার জহ্লাদদের অথবা ধাতু-দ্রবকদের, শুনবে জনজাগরণের মুহূর্তে—সন্ধ্যার আসা জানিয়ে যে-ঘণ্টা বাজবে আর যে-ডমরু ধ্বনিত হবে যুদ্ধং দেহি ঊষায়, তাদের অন্তর্বর্তীকালে...
>
> আর সকালে ইতিমধ্যেই সুরু সমুদ্রের আনুষ্ঠানিক, আর সে-মানুষের দিকে নতুন হাসিগুলি কার্নিসের ওপর থেকে। আর সে-সমুদ্র, এখন একটি বিদেশিনী, প্রতিভাত তার পাতায় পাতায়...কারণ এই কবিতার স্বাদকে যে সে কত না দিন ধ'রে শুশ্রূষা ক'রে এসেছে, তার প্রতি এমন একটি ব্রতীর আবেগে...এবং এক সন্ধ্যায়, তাইতে তার মনোনিবেশ করায় কতখানি মাধুর্য সেই, তাকে অবশেষে মেনে নেওয়ায়, এমন একটি আকুলতাকে। এবং তার আনুগত্যে তাতে সে যুক্ত হ'ল কী সেই হাসিতে...'আমার শেষ গান। আমার শেষ গান। যা হবে গান এক সাগরের মানুষের।'..."

এই উদ্ধৃতিতে যা' স্পষ্ট তা শুধু কবির ক্ষমতা বা কর্তব্য নয়, যদিও তাও নিশ্চয়ই পের্স-এর কবিতার অন্যতম প্রসঙ্গ—কিন্তু এর মধ্য দিয়ে

ধ্বনিত তাঁর আরো একটি বিশিষ্ট সুর, যা তাঁর সমস্ত কাব্যকে করেছে যজ্ঞের হোমাগ্নিপূত, তাকে করেছে যেন একটি বিরাট অনন্ত যজ্ঞই, যার গম্ভীর মন্ত্রের দ্যোতনায় গমগম করছে তাঁর পৃথিবীর আকাশ ও বাতাস, মরুভূমি ও সমুদ্র। বাদ মানুষও নেই, একেবারেই নয়—সবাই, সকলই অঙ্গ এক সামগ্রিক অতিমানুষিক প্রয়াসের। এবং এই যজ্ঞের পুরোহিত হচ্ছেন কবি, স্যাঁ-জন পের্স, কথা তাঁর উপকরণ, যে-কথা অগ্নয়ে স্বাহা ব'লে পড়ছে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি হ'য়ে। এ-কবিতার আছে এক নিমগ্ন নিহিত সর্বব্যাপ্তি, তার আলিঙ্গনে বাঁধা গোটা একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যে-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু চোখের জগতেরই নয়, নয় বাইরেরই, কিন্তু যা অতলস্পর্শ অন্ত-র্লোকেরও। গ্রীক নাটকের মত, পের্স-এর বিলম্বিত লয়ের দীর্ঘ ধ্রুপদাঙ্গ কবিতাগুলি যেন এক একটি শোভাযাত্রা সর্বভূতের, সর্বজনীন, কবি চলেছেন তার আগে আগে, তাকে পথ দেখিয়ে। এ-কবিতা স্বভাবতই তাই ধার ধারে না শ্রোতার, পাঠকের—কারণ এক কথায়, এ একটি যথার্থ সমগ্রের অক্ষত অভিজ্ঞতা। এ-কবিতা ভ্রূক্ষেপহীন, পূর্ণ আপনার সম্পূর্ণতায়। এবং সব ছাপিয়ে তাতে চেতনা যেন নামহীন এক পবিত্রতার, তা যেন একটি অখণ্ড প্রণাম যা স্বীকার করে নি দেবতাকে। পড়তে পড়তে মনে হয় তার সব কিছু যেন কোন দুর্গম ঊর্ধ্বের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তা নিশ্চয়ই সব তুচ্ছতার নাগালের একান্তভাবে বাইরে। কোনো সস্তা চমক দিয়ে তাক লাগানোর নেশা তাতে নেই, তার কবি যেন নিজেকে বসিয়েছেন মানসের কৈলাসে। সুর তাঁর দরবারী (যেমন অনেকে বলেছেন) বললে কম বলা হবে।

পের্স-এর কবিতা নিশ্চয়ই শক্ত নয়, আমি তো বলব তিনি বেশ সহজ-বোধ্য, যদিও বহু জায়গায় প্রাকৃতিক জগতের খুঁটিনাটী বর্ণনায় ও ছবির চিত্রণে তাঁর কবিতায় রহস্যময় আভাস ছড়ানো। কিন্তু তা তুচ্ছ বাধা ভাবের সম্পূর্ণতাটি ধরতে, তা আগলায় না পথ। পের্স নিশ্চয়ই কবিতায় অতিকথিত সেই আধুনিক ধারার সম্পূর্ণ বাইরে, এমন কি এক অর্থে তাঁর ভাষা ও বর্ণনার ভঙ্গী প্রাক আধুনিকদেরই। এবং তাঁর কবিতা, যাকে প্রথম দর্শনে মনে হ'তে পারে ফ্যাকাশে সমুদ্রের মত, যাতে সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হ'তে দ্বিধা হয়তো জাগতে পারে, তার অন্তর্নিহিত রস পেতে বিলম্ব হয় না যদি একটু লেগে থাকা যায়। আর, একবার সেই রসের আস্বাদন ঘটলে আর নিষ্কৃতি নেই, সেই সমুদ্রের তীরে বার বার আনন্দে আছড়ে পড়তে ফিরে আসতে হবে। এ-কবিতার আবেদন যত অকুণ্ঠিত তত আন্তরিক। এ-কবিতা গৃহীত হ'তে চায় নি, তাই তাকে হয়তো

অপেক্ষাকৃতভাবে আরো সহজে গ্রহণ করা যায়। তাকে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে আজকের ও আগামী পৃথিবীর।

তাঁর কবিতায় যে-এক সংজ্ঞাহীন পবিত্রতার কথা বললাম, তার কোনো তুলনা নেই আজকের বিশ্বসাহিত্যের কোনো কবিতায়। ক্লোদেল-এর কথা সহজেই মনে আসে, এবং অন্তত বাহ্যিক আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি নিশ্চয়ই প্রভাবান্বিত করেছেন পের্স-কে—কিন্তু ক্লোদেল-এর কবিতা তার প্রচণ্ড ক্যাথলিকতায় পৌঁছোতে পারে নি এমন ক'রে সর্ব মানবের অন্তর-মন্দির-দরজায়। শুধু ক্লোদেল কেন, তাঁর মত আরো অনেক উগ্র ধার্মিক সুকবি—বহু দেশের, বহু যুগের ও বহু সাহিত্যের—ব্যর্থ হয়েছেন এক বিশেষ জায়গায় অব্যর্থভাবে।

আমি ফিরে আসতে চাই বার বার পের্স-এর অনবদ্য কবিতায়, উদাহরণ দিয়ে আরো স্বচ্ছ ক'রে তুলতে যা বলেছি আগে অতি বিশদ ও সাধারণ-ভাবে এক শ্রেণীর নতুন কবিতার বাচ্য বা ভঙ্গীর সম্বন্ধে, তাতে কবির কর্তব্য সম্বন্ধে, সেই কবিতায় সমগ্র অভিজ্ঞতালাভের অভীপ্সার সম্বন্ধে। আর পের্স-এর সেই দৃঢ়, অথচ সুন্দর আনুষ্ঠানিকের উদাত্ত মন্ত্র, যা-ই হয়েছে তাঁর কবিতা। 'সমুদ্রচিহ্নে' তিনি বলছেন আবারঃ

"যে-আবৃত্তি সমুদ্রের সম্মানে, তার যাত্রায় সঙ্গী হবে কাব্য।
সমুদ্রকে বেষ্টন করে যে-যাত্রার গান, তার সহায় হবে কাব্য।
যেমন বেদীকে ঘিরে অনুষ্ঠান আর স্তবককে বেষ্টন করে সমবেত গীতের মহাকর্ষ।
এবং সাগরের এ এমন একটি গান যা আগে গাওয়া হয় নি কখনো, একটি গান যা' আমাদেরই
অন্তর্লীন যে-সমুদ্র, সে-ই গাইবেঃ
সমুদ্র, জাত আমাদের ভিতরে, তৃপ্তি দিয়ে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসের শেষকে,
সমুদ্র, আমাদের ভিতরে ধ'রে রেশমী শব্দ কত মুক্ত সাগরের আর বিশ্বের লক্ষ্মীর সকল
মহান সতেজতা।"

এখানে কোন বিশেষ স্থানটি কথার? কী ক'রে সে হ'তে পারবে অব্যক্তিক, সমগ্রের, শুধু কবির নয়? একই কবিতায় আবার বলেছেনঃ

"সঙ্কীর্ণ তরণীগুলি, সংকীর্ণ শয্যা আমাদের।
অপরিসীম ব্যাপ্তি জলের, আরো বিস্তার আমাদের সাম্রাজ্যের
বাসনার বন্ধ প্রকোষ্ঠে।"

স্যাঁ-জন পের্স-এর একটি বড় কৃতিত্ব হ'ল এই যে তিনি অন্যান্য অনেক সমসাময়িক ও পূর্ববর্তীদের মত আটকা পড়লেন না কোনো বিশেষ 'থিওরি'-র ঘূর্ণিপাকে, জোর দিলেন না নিছক বাচ্যের বা ভঙ্গীর বা কর্তব্যের ওপর, কিন্তু তাঁর কবিতাকে তিনি ক'রে তুলতে চাইলেন কবির জবানবন্দী এক দুঃস্থ অসম্পূর্ণ পৃথিবীতে, তাকে উদ্দীপ্ত করলেন নির্বিশেষ মানুষের অভিনিবিষ্ট চেতনায়, যে-মানুষ প্রতীক সমগ্রতার। তাঁর কবিতা লেখা না-গদ্যে না-পদ্যে—এমন একটি তার রীতি ('রীতি' ভারতীয় আলংকারিক অর্থে) যা হয়তো তাঁর ততটা মৌলিক নয়, তাতে আগেই পরীক্ষা চালিয়েছেন পল ক্লোদেল ও ক্লোদেল-এরও আগে র‍্যাঁবো তাঁর *Les Illuminations*-তে। পের্স-এর কবিতা অত্যন্ত ব্যক্তিগত এক অর্থে, আবার অন্য অর্থে তা অব্যক্তিক, তা স্থান কালের সীমার ঊর্ধ্বে—বিষয়বস্তুতে ও ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে তা নিশ্চয়ই বর্তমান যুগের একমাত্র (হার্ট ক্রেন-এর 'ব্রিজ' বেশ একটু ভিন্ন ধরনের) এপিক ধর্মী কবিতা। এবং যদিও এ-কবিতার সম্পূর্ণ ঝংকার ধরতে পারবে কেবল ফরাসীতে অভ্যস্ত কানই, এর অন্তরের নিশ্বাস ব্যাপ্তি চেনে যে-কোনো বিশেষ ভাষার প্রাদেশিকতার বাইরে। কবির এমন একটি আশ্চর্য অধিকার নিজের ওপর যে তাতে তিনি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাঁর কবিতাকে একটি অশেষের চলন্তিকায়, সেই কবিতাকে কেবলি নিয়ন্ত্রণ ক'রেও নির্দিষ্ট পরিসরে, তাকে একই সঙ্গে আলোকবর্ষী ক'রে। সেই কবিতায় প্রতিভাত যে-একটি অন্তর্দৃষ্টি, যে-একটি তুহিনশীতল অথচ আবেগদীপ্ত বুদ্ধি, সে স্বাদমুক্ত আমাদের যুগের খণ্ড যৌক্তিকতার। এ-কবিতায় স্বীকার আরো একবার কাব্যে অন্য এক মহত্তর ঐতিহ্যের, যা চিন্ময় সর্বকালের বেদনার্ত চেতনায়।

কিন্তু এই পৃথিবীর, এই মানুষের এত বড় আন্তরিক কবি যিনি, তিনি নিজেকে আড়ালে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন সমস্ত বাহ্যিক কিছুর আপাত-সংস্পর্শ হ'তে, মানুষের ভিড় হ'তে, ঘটনার জগত হ'তে। নিজের সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিতই তিনি দেন না তাঁর রচনায়, তাঁর বক্তব্যকে কোনো বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে বা কোনো আলাপেই চান নি ব্যক্ত করতে। শুধু যা স্টকহোল্মে নোবেল পুরস্কার গ্রহণের সময় দুটি-একটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন, যদিও তাও করেছেন হয়তো বাধ্য হ'য়ে নেহাৎই নিয়ম ও ভদ্রতার খাতিরে। যে-যুগে কবিরা তাঁদের বক্তব্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে বা অন্যান্য উপায়ে বলতে পঞ্চমুখ, সে-যুগে পের্স-এর মত একজন অতি বিশিষ্ট কবির নিজের বা তাঁর কবিতার সম্বন্ধে এই অকুণ্ঠ ইচ্ছাকৃত নীরবতা মনে হ'তে

পারে অস্বাভাবিক। অতীতেও, পো' হ'তে ভালেরি পর্যন্ত কোনো উল্লেখ-যোগ্য কবিই বাদ যান নি তাঁদের বক্তব্যটিকে জানাতে। এমন কি র‍্যাঁবোও তাঁর চারটি মাত্র বছরের সাহিত্যিক জীবনে সময় পেয়েছিলেন 'দ্রষ্টার' চিঠিটি লেখার, এক রকম যে-চিঠিকে ভিত্তি ক'রেই পরবর্তীকালে ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা সম্পর্কে তত্ত্বমূলক একটি সুপুষ্ট স্থূলকায় আলোচনা-সাহিত্য গ'ড়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু পের্স-এর ক্ষেত্রে সে-সবের কিছুই নয়, তাঁর কবিতাকেই তিনি চেয়েছেন তাঁর শেষ উক্তি হিসেবে। শুধু তাই নয়, নিজের সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ নিজের ব'লে মেনে নিতেও যেন তাঁর অনিচ্ছা। তাই তাঁর কাব্য হ'তে চেয়েছে যেন নামহীন, তারিখহীন, যেমন কবি হিসেবে তিনি নিজেই থাকতে চেয়েছেন বেনামী, এমন কি প্রায় পরিচয়-হীন। এই স্যাঁ-জন পের্স ব্যক্তিটি কে?

একেবারে কোনো সম্পর্ক নেই বলা হয়তো অন্যায় হবে, কিন্তু তাঁর ব্যবহারিক ও কবি জীবনের ভিতরে যে-সম্পর্ক, তা ক্ষীণ, তারা প্রায় দুটি ভিন্ন জীবন। যদিও তাঁর সেই ব্যবহারিক জীবনও (যা হ'তে তিনি আজ সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছেন) যে-কোনো উচ্চাকাংক্ষীর ঈর্ষার বিষয়।

স্যাঁ-জন পের্স-এর প্রকৃত নাম আলেকসি স্যাঁ-লেজে' লেজে'। জন্ম ১৮৮৭ সালে গুয়াদ্যলুপে (একটি ছোট্ট প্রবাল দ্বীপ আমেরিকার কাছে, ফরাসীদের অধিকারে), সেখানে তাঁর থাকা বারো বছর, পরে ফ্রান্সে আসা পড়াশুনার জন্যে, ১৯১৪ সালে 'ডিপ্লোম্যাটিক' জীবনে প্রবেশ (প্রধানত পল ক্লোদেল-এর প্ররোচনায়), সাটি বছর কাটানো চীনে, তারপর তাঁর নিয়োগ হওয়া ফ্রান্সে পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রায় উচ্চতম পদে, দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় তাঁর অসম্মতি ভিশি সরকারের অধীনে কাজ করার, পরে (জাতীয়তা হারিয়ে) যুক্তরাষ্ট্রে এসে পৌঁছোনো ১৯৪০ সালে ও সেখানে একটানা বাস সতের বছর ধ'রে। আরো একটি ছোট ও অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত খবরঃ ১৯৫৮ সালে তাঁর বিবাহ ওয়াশিংটনের ডরোথি মালবার্ন রাসেল-এর সঙ্গে। এখন তিনি বছরের খানিকটা কাটান ওয়াশিংটনে, বাকীটা দক্ষিণ ফ্রান্সে। আজো ওয়াশিংটনের টেলিফোন বইএ তাঁর যে-নাম পাওয়া যাবে তা আলেকসি লেজে'-ই।

সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ ১৯১০ সালে, কবির বয়স যখন ২৩। প্রকাশক গালিমার (*Gallimard*) বার করলেন তাঁর প্রথম কবিতার বই, "প্রশস্তি", সই করা তাঁর প্রকৃত নামে—স্যাঁ লেজে' লেজে'। আপাত দৃষ্টিতে বইটি কোনো সাড়াশব্দই তুলল না, যদিও বারো বছর পরে ১৯২২ সালে মার্সেল প্রুস্ট তাঁর "হারানো সময়ের অনুসন্ধানে"-র চতুর্থ খণ্ডে

স্যাঁ-লেজে' লেজে'-র প্রসঙ্গ তুললেন তাঁর একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে—উল্লেখটি কটাক্ষমাত্র, কবির দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে। কটাক্ষ হ'য়েও এ-ই প্রথম তাঁর উল্লেখ ফরাসী সাহিত্যে, যা মনে রাখবার মত।

১৯১০-এর পরে, এক দীর্ঘ নীরবতা। তাঁর কবিতা নিয়ে আগেও কেউ তেমন মাথা ঘামান নি, বিশেষত এই নীরবতা কবিকে প্রায় ঠেলে দিল পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে। ১৯২২-এ এসেছেন প্যারীতে কয়েকদিনের জন্য, দুই যাত্রার মধ্যে, তখন তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সবে চীন থেকে ফিরেছেন সাতটি দীর্ঘ বছর সেখানে কাটিয়ে। আঁদ্রে জ়িদ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। জ়িদ "প্রশস্তি" বেরোনোর পর হ'তেই পের্স-এর অনুরাগী, এবং "প্রশস্তি" যখন প্রথম প্রকাশ হয় তখনই তিনি প্রকাশক গালিমার-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে এও উল্লেখ-যোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"র অনুবাদ করার প্রেরণা জ়িদ পান পের্স-এরই কাছ থেকে। কবির (তখনো স্যাঁ-লেজে' লেজে'-ই) প্রতি জ়িদ-এর প্রথম হ'তেই একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। তাই তিনি চাইতে এলেন, ১৯২২-এ, লেজে' কোনো নতুন কবিতা দিতে পারবেন কি না তাঁদের পত্রিকার (গালিমার-এর 'নুভেল রভ্যু ফ্রাঁসেজ়') জন্যে। তোরঙ্গের দিকে দেখিয়ে লেজে' বললেন, 'খুঁজুন ওখানে, হয়তো কিছু পেতে পারেন।' জ়িদ পেলেনও, লেজে'-র সুস্পষ্ট হাতের লেখায় একটি বড় কবিতা। সরকারের অনুমতি না নিয়ে নিজের নাম এই কবিতার কবি হিসেবে ছাপানো হয়তো লেজে' সমীচীন নাও বোধ করতে পারেন ভেবে জ়িদ জানতে চাইলেন কোন নাম-এ ছাপাবেন কবিতাটি। চট ক'রে, বিশেষ কিছু না ভেবেই লেজে' উত্তর দিলেন 'স্যাঁ-জন পের্স।'

নামের ইতিহাস, যে-নামে 'বাস করাই' আজ তাঁর একমাত্র কাম্য, তা সংক্ষেপে হ'ল এই। 'পের্স' নামটির সঙ্গে রোমান কবি পের্সিয়ুস-এর সম্বন্ধ কী, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে—সব আলোচনাই মেনে নিয়েছে যে দুটি নামে কোনো সম্বন্ধই নেই। হঠাৎ কবির মনে এল, তাই বললেন, 'পের্স'। এ-ছাড়া এর ভিতরে অন্য কোনো গভীর অর্থ লুকোনো নেই। জ়িদ, যিনি স্বয়ংই তখন ভবিষ্য সাহিত্যের এক মহারথী, প্রথম শুনলেন কবির মুখ থেকে তাঁর নতুন নাম, যে-নাম চল্লিশ বছরেরও কম সময়ে জগতের সর্বত্র লোকের মুখে মুখে উঠবে।

যে-বড় কবিতাটি জ়িদ নিলেন, তার নাম *Anabase*, গ্রীক *Xenophon*-এর অভিযান বৃত্তান্তের অনুকরণে—এ-কবিতাও এক আন্তরিক অভিযান। বই আকারে প্রথম প্রকাশ ১৯২৪-এ, ও এর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কবির

খ্যাতির ব্যাপ্তি (যদিও তাঁর পাঠকের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ তখনো, যেমন আজো, গত বছরের নোবেল পুরস্কারের পরেও) দেশে দেশান্তরে। আকৃষ্ট হলেন রিলকে, হফমান্সতাল, টি, এস, এলিঅট, উংগারেত্তি ও আরো অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি, এবং ফ্রান্সেও রনে শার, ক্লোদেল, ইত্যাদি। ফ্রান্সে তাঁর স্বীকৃতি ঘটতে সময় লাগার কারণ ফরাসী কবিতা বহুকাল ধ'রে মেতেছিল (আজো খানিকটা আছে) যেন এক রাসায়নিক গবেষণায় র‍্যাঁবো-মালার্মে-ভালেরি-র ঐতিহ্যে। পের্স-এর কবিতার সুরটি সে-ঐতিহ্যের নয় সরাসরিভাবে। এলিঅট নিজেই *Anabase* -এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করলেন ১৯৩০ সালে।

Anabase প্রকাশের পর কবির আবার এক সুদীর্ঘ নীরবতা। এর মধ্যে লিখেছেন নিশ্চয়ই, কাজের অবসরে—কিন্তু মেলাতে চান নি তাঁর কবিতাকে সরকারী জীবনের সঙ্গে। দপ্তরের বড় কর্তা একদিন যখন হঠাৎ জানতে চাইলেন বাজারের গুজবটা সত্যি কি না, তিনি সত্যি সত্যিই কবিতা লেখেন কিনা, কবির উত্তর এল চটপটঃ গুজবটা নেহাৎই গুজব, একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখেছেন, সন্ধ্যায় অথবা ছুটীর অবসরে, লিখেছেন নিয়মিতভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্দিনে মতদ্বৈধতা ঘনিয়ে উঠল তাঁর তৎকালীন সরকারের সঙ্গে, তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন ওয়াশিংটনে ফরাসী সরকারের রাষ্ট্রদূতত্ব। পরে পালালেন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন ভিশি সরকার, তাঁর ফরাসী জাতীয়তাও লুপ্ত হ'ল (যদিও যুদ্ধোত্তর ফরাসী সরকার সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁর জাতীয় অধিকার, স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন ফ্রান্সের সরকারী কাজে, তাঁর জন্য বৃত্তির পর্যন্ত বন্দোবস্ত করেছেন)। ইতিমধ্যে পারীর পতনে নাৎসী বাহিনী গ্রাস ও নষ্ট করলেন তাঁর সঞ্চিত যত লেখা। শেষে আমেরিকার কবি আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশ তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন ওয়াশিংটনে ও তাঁকে দিলেন কংগ্রেস লাইব্রেরীতে এক সম্মানিত পদ। আমেরিকা আসার পরই, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে, চিকাগোতে প্রকাশিত হ'ল তাঁর তৃতীয় কবিতা *Exil* (নির্বাসন), ফরাসী ভাষাতেই। ফ্রান্সে, একটি পত্রিকায়, তার প্রথম পুনর্মুদ্রণ ঘটতে আরো দু বছর লাগল। পরে ধীরে ধীরে বেরোল *Vents* (হাওয়া), *Amers* (সমুদ্রচিহ্ন) ও তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশিত ১৯৫৯-এ, *Chronique* (ইতিবৃত্ত)। ইতিমধ্যে তাঁর নাম ও লেখা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়েছে দেশ দেশান্তরের বহু বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে, তাঁর কবিতা সমগ্রভাবে অনূদিত হয়েছে বহু ভাষায়।

ফ্রান্সেও তাঁর সম্বন্ধে সাড়া জেগেছে, তাঁর সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে. তিনি সেখানে হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন 'মহান অনুপস্থিত'। এমন সময়, সব ছাপিয়ে, এল গত বছরের নোবেল পুরস্কার।

ফ্রান্সের সব সাহিত্যরসিকই যে তাঁকে নির্বিশেষে মেনে নিয়েছেন, তা' নয়। এই তো সেদিনই একজন ফরাসী (যিনি স্বয়ং বিশাধিক গ্রন্থের লেখক) আমাকে বললেন, পের্স-এর মত একজন অকবিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় সেই পুরস্কারের সম্মান হানি হয়েছে। পের্স ফরাসী ভাষাকে নাকি জবাই ক'রে মেরেছেন, তাঁর চেয়ে বহু ভালো কবিতা লেখেন এমন দুয়েকটি অল্পবয়স্ক ফরাসী কবির নামও তিনি করলেন। তাঁর ধারণা, নোবেল পুরস্কারটা ক্রমশই হ'য়ে পড়েছে একটা রাজনৈতিক ব্যাপার এবং পের্স-এর পুরস্কারটা পাওয়ার পিছনে আছে নাকি ডাগ হ্যামারশল্ড-এর শ্রদ্ধা কবির প্রতি। অন্যদিকে, আরো একজন ফরাসী সাহিত্যিক, যাঁর সঙ্গেও দেখা হ'ল সম্প্রতি, তিনি পের্সকে আমার বিশেষ ভালো লাগে শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলেনঃ 'আমরা দুজনে তা হ'লে এক পৃথিবীর অধিবাসী।'

এ শুধু ব্যক্তিগত ভালো-লাগা-না-লাগার কথা, যা শেষ পর্যন্ত তেমন বেশী কিছু প্রমাণ করে না। নোবেল পুরস্কারও হয়তো সব ক্ষেত্রে কোনো কষ্টিপাথর নয় এ-ব্যাপারে। আমাদের আলোচ্য নয় তা। এই নোবেল পুরস্কারের দশ বছর আগেই বিশ্বের সাহিত্যিকরা কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন ফ্রান্সে প্রকাশিত একটি সংকলনে—সেই সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন জিদ, আঁদ্রে ব্রত, রনে শার, ক্লোদেল, স্টীফেন স্পেণ্ডার, আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশ, এ্যালেন টেট, খরখে গিইয়েন, রেনাতো পগগিয়লি, উংগারেত্তি ও আরো অনেকে। মাত্র দু' বছর আগেও তিনি ফ্রান্সের একটি মহাসম্মানজনক সাহিত্যিক পুরস্কার পেয়েছিলেন। কবিকে এ-সব কিছুই যে খুব বিহ্বল বা বিচলিত করেছে, এমন মনে হয় না। ফ্রান্সের পুরস্কারটি পাওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে রাজী হন নি। যিনি মার্সেল প্রুস্ট-এরই ন'-ন'টি চিঠির একটি জবাবও দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নি, তাঁর কাছে সাংবাদিকরা এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আর কী আশা করতে পারেন?

অল্প কথায় বলি (যা কথায় বলার বস্তু নয়, যা আলোচনার বিষয়ও নয়, যার সম্যক অনুধাবন সম্ভব একমাত্র তাঁর কাব্য-পাঠেই, যে-কাব্য এই কবির যথার্থ জীবন) কোথায় স্যাঁ-জন পের্স-এর মাহাত্ম্য। তাঁর কবিতায় অন্তর জগতের মানুষ ও তার অনাদি ইতিহাস পেয়েছে সর্বোচ্চ স্থান—তাঁর

কবিতায় দেখা আজকের মানুষকে সেই অনাদির পটভূমিকায়, তার আজ পর্যন্ত যা কিছু অর্জিত, তাকে নমস্কার, ইংগিত ভবিষ্যতেরও। এক কথায়, সেই কবিতায় অনুভব এক উজ্জ্বল সূর্যস্নাত অধ্যাত্ম-চেতনার, যে-চেতনা সম্ভব সেই মানুষে-ই যে-মানুষ হাজার মৃত্যু ও যুদ্ধ সত্ত্বেও অমর জীবনের অধিকারী। কবি হিসেবে তাঁর কর্তব্য হয়েছে সেই মানুষের সেই ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করা। 'প্রশস্তি' হ'তে 'ইতিবৃত্ত' পর্যন্ত, একটির পর একটি কবিতায় এই চেতনারই ধাপে ধাপে উন্নতি। অগভীর পাঠকই বলবে যে *Anabase* মাত্র একটি এপিক কবিতা মধ্য এশিয়ায় ভ্রমণের বিষয়ে, অথবা "নির্বাসন" নেহাৎই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্দিনের পটভূমিকায় লেখা ওয়াশিংটনে, কিম্বা "সমুদ্রচিহ্ন" শুধু একটি ধ্যান জগতের সমস্ত সাগরের সম্বন্ধে।

তাই "সমুদ্রচিহ্নে," একেবারে গোড়াতেইঃ

> 'এবং তোমরা, সমুদ্র, যারা আরো মহৎ স্বপ্নের ভিতরে দেখেছ, এক সন্ধ্যায় রেখে কি তোমরা আসবে আমাদের সহরের বেদীর সামনে, সর্বসাধারণের প্রস্তর আর তামাটে আঙুর পাতার মাঝখানে?
>
> আরো বিপুল, হে জনতা, আমাদের শ্রোতৃবৃন্দ পতনহীন এক যুগের এই নিম্নভূমিতেঃ সমুদ্র, প্রকান্ড ও সবুজ যেন একটি ঊষা মানুষের পূর্বাকাশে, সমুদ্র, তার পা ফেলার উৎসবে, যেন গাথাগান কোন এক প্রস্তরেরঃ আমাদের সীমান্তে-সীমান্তে পাহারা আর উৎসব, মর্মর আর উৎসব মানুষের উচ্চ মাপের প্রতি—সমুদ্র স্বয়ং আমাদের পাহারা, যেন এক ঐশী ঘোষণা ..'

একেবারে গোড়াতেই এই সুরে কবিতাকে বেঁধে কবি জানিয়ে দিলেন আসল উদ্দেশ্যটি তাঁর কী। এর মত অনন্যসাধারণ লিরিক কবিতাই বা কে আগে পড়েছে? পরে, একই কবিতায়, সেই মানুষের সঙ্গে (শুধু কবির সঙ্গে নয়) ঘটছে সমুদ্রের একাত্মতাঃ

> 'শেষে আবাহন করি তোমাকেই আমরা, কবির স্তবকের অতীতে। না-ই রইল আর আমাদের, জনতার ও তোমার মধ্যে, ভাষার অসহ্য প্রভা...'

কিন্তু দূরে সরিয়ে ফেলে দেবার যো নেই কবিকে, তার উপস্থিতি অপরিহার্য। "হাওয়া"য় পের্স বলছেনঃ

> 'এবং কবিও রয়েছে আমাদের সঙ্গে, তার যুগের মানুষদের পাকা রাস্তায়।

আমাদের সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, তাল রেখে এই মহান হাওয়ার সঙ্গে।

তার কাজ আমাদের মধ্যেঃ বার্তাটি স্পষ্ট ক'রে জানানো। এবং উত্তরটি তারি ভিতরের, পাওয়া হৃদয়ের উৎসারিত আলোয়।

লেখাটা নয়, কিন্তু জিনিসটাই একেবারে। পাকড়ানো তৎক্ষণাৎ ও তার সমগ্রতায়।

সংরক্ষণ আদির, নয় প্রতিলিপির। এবং কবির লেখা অনুসরণ করে দলিলকে।'

আর সেই মানুষের কথা, তাও "হাওয়া"তে, যেমন পের্স-এর অন্যান্য গ্রন্থেও বার বার তা উঠেছে অল্প বিস্তর প্রকাশ্যভাবেঃ

'কিন্তু প্রশ্ন যে মানুষই। তাই কখন সেই প্রশ্নটি উঠবে স্বয়ং মানুষকে নিয়ে? --কেউ কি পৃথিবীতে তুলবে তার গলা?

কারণ মানুষই প্রশ্ন, তার মানুষী সত্তায়; আর চোখ আরো বড় ক'রে তাকানো মহত্তম আন্তর সমুদ্রের দিকে।

তাড়া কর। তাড়া কর। সাক্ষ্য মানুষের!'

এমন কবি, সেই মানুষেরই, স্যাঁ-জন পের্স। তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার মধ্যে তিনি দেখলেন সম্মান দান করা হ'ল কবিতাকেই ও তার কারণকে—সে-সম্মান নয় কোনো বিশিষ্ট কবিকে, নয় স্যাঁ-জন পের্স-কে। পুরস্কার গ্রহণের সময় যে-দু চারটি কথা তিনি বলেছিলেন (যা গালিমার পরে ভিন্নভাবে *Poésie* নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন), তাতে কবি আরো একবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে জানালেন তাঁর আজীবন বিশ্বাসের কথাঃ 'একেবারে জীবনের সঙ্গে সমান ব'লে কবিতা জানে নিজেকে।' আরো বললেন, বিজ্ঞান ও কবিতা দুটি জন্মান্ধ, দুটিই 'হাতড়ে বেড়ায় আদি রজনীর অন্ধকার,' শুধু তাদের 'হাতড়ানোর' উপায় বিভিন্ন। এবং যদি কবিতা সত্যিই না হ'তে পারে নিজেই সেই পারমিক সত্য, সে-ই একমাত্র পৌঁছোতে পারে সে-সত্যের সীমারেখার সবচেয়ে কাছাকাছি।

নিজের জীবনের সঙ্গে তাঁর কবিতার এমন একটি আন্তরিক একাত্মতা খুব কম মহাকবিই অর্জন করেছেন। সেই 'একক ও দীর্ঘ বাক্য, যা যতি-হীন ও যা চিরকালের বোধের অতীত,' তাই পের্স-এর একমাত্র স্বদেশ। এর মানে এই নয় যে তাঁর যথার্থ স্বদেশের প্রতি তাঁর প্রেম কম। একেবারেই নয়। ফ্রান্স দেশ, তা তাঁর মনে একটি আত্মস্থ রূপ নিয়েছে একটি ভাষার। এক চিঠিতে তিনি জানানঃ 'ফ্রান্স সম্বন্ধে বলার কিছু নেইঃ সে আমিই, আমার সব। সে আমার কাছে একটি ও একটি মাত্র পবিত্র

প্রজাতি, যাকে, ব্যতীত আমার সম্ভব নয় ধরা অথবা প্রকাশ করা কোনো কিছু সর্বজনীনের, কোনো কিছু মৌলিকের। যদি আমি নাও হতাম একটি প্রাণী যে অনিবার্যভাবে ফরাসী, একটি মাটী যা সারত ফরাসী (এবং প্রথমটির মতো আমার শেষ নিশ্বাসটিও হবে রাসায়নিকভাবে ফরাসী), ফরাসী ভাষা তবু আমার পক্ষে থাকত কল্পনীয় একমাত্র আশ্রয়, একটি অনবদ্য মাটী ও আবাস, পৃথিবীর একমাত্র জ্যামিতিক স্থান যেখানে আমাকে থাকতেই হ'ত কিছু বোঝার, বা চাওয়ার, বা ত্যাগ করার জন্যে।'

এ তাঁর স্বদেশের (স্ব-ভাষার বরং) সঙ্গে একটি পরম একাত্মতা, যাকে আমরা অফরাসীরা নিশ্চয়ই নমস্কার করতে পারি। তবে তার চেয়ে বড় যা কথা, তা' তাঁর কবিতা, 'দরজা খোলা বালুর ওপর, দরজা খোলা নির্বাসনে,' যা' 'উৎসর্গ নয় কোনো তীরকে, যা অর্পিত নয় কোনো পৃষ্ঠায়।' আবার বলি, এই কবিতা চিহ্নিত মহানের বিশিষ্ট চিহ্নে, এর কবি বর্তমান শতাব্দীর এক মহাকবি। তাঁকে জানার ও প্রণাম করার দায়িত্ব আজ আমাদের।

গ্রন্থ-বিবরণী

[এ-গ্রন্থের আলোচ্য যাঁরা, তাঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ্য কোনো লেখা বাংলা ভাষায় অন্য কেউ বার করেছেন ব'লে আমি জানি না। শুধু দুয়েকটি বাংলা রচনার কথা মনে এল, সেগুলি তলায় দিলাম। ফরাসী সাহিত্য অনুশীলনে আমি ফরাসী ভাষারই আশ্রয় সর্বত্র নিয়েছি, তাই নিম্নে দেওয়া ইংরেজী রচনার তালিকাটিও যৎসামান্য হ'ল। মুখ্য তালিকা যেটি, সেটি ফরাসী গ্রন্থেরই। এবং যেহেতু পৃথিবীর এই সব থেকে শিক্ষিত ও অভিজাত ভাষাটির দ্রুত প্রসার আজকের বাংলা দেশেও ঘটছে, আশা রাখলাম নিম্নে উল্লিখিত ফরাসী বইগুলি আগ্রহশীল বাঙালী পাঠকদের কাজে লাগবে। গ্রন্থ-বিবরণীটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করলাম। বাংলা দেশে সহজপ্রাপ্য দুয়েকটি অনুবাদ ছাড়া যে-কবিরা আমার আলোচ্য, তাঁদের নিজের নিজের কাব্যগ্রন্থাবলীও এই তালিকা হ'তে বাদ দিলাম। —লো. না. ভ.]

বাংলা

প্রমথ চৌধুরী : "ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়," প্রবন্ধ।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : "স্বগত," কলকাতা, ১৯৫৭।
বুদ্ধদেব বসু : "শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা," কলকাতা, ১৯৬০।
বিষ্ণু দে : "হে বিদেশী ফুল;" বহু ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী কবিতার অনুবাদ; কলকাতা, ১৯৫৬।
র‍্যাঁবো : "নরকে এক ঋতু;" অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য; কলকাতা, ১৯৫৪।
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় : "র‍্যাঁবো ভের্লেন এবং নিজস্ব," কলকাতা,
স্যাঁ-জন পের্স : "বৃত্তান্ত"; অনুবাদ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়;

ইংরেজী

T. S. Eliot: "Baudelaire," Introduction to Baudelaire's *Intimate Journals*, London, 1930.
T. S. Eliot: *The Use of Poetry and the Use of Criticism*, London, 1933.
Enid Starkie: *Arthur Rimbaud*, Oxford, 1947.
Peter Quennell: *Baudelaire and the Symbolists.*

Stephen Spender: *The Creative Element.*
Arthur Rimbaud: *Illuminations*, translated by Wallace Fowlie.
Arthur Rimbaud: *The Drunken Boat*, poems translated by Brian Hill.

ফরাসী

Marcel Raymond: *De Baudelaire au Surréalisme*, Paris, 1947.
P. Martino: *Parnasse et Symbolisme*, Paris, 1925.
Jean-Paul Sartre: *Baudelaire*, Paris, 1947.
Rolland de Renéville: *Rimbaud le Voyant*, Paris 1947.
R. Etiemble: *Le Mythe de Rimbaud*, Paris.
Baudelaire par lui-même, Editions du Seuil, Paris.
Verlaine et les Poètes Symbolistes, Classiques Larousse, Paris.
A. Thibaudet: *La Poésie de Stéphane Mallarmé*, Paris, 1913.
Claude Edmonde Magny: *Arthur Rimbaud*, Paris, 1949.
A. Thibaudet: *Paul Valéry*, Paris, 1923.
Paul Valéry: *Poésies Choisies*, Librairie Hachettee, Paris, 1952.
Paul Valéry: *Variété*, Vols. I, II, III, IV, V, Paris.
Paul Eluard, Poètes d'Aujourd'hui, Paris, 1953.
Aragon, Poètes d'Aujourd'hui, Paris.
Alain Bosquet: *Saint-John Perse*, Paris, 1953.
Léon-Paul Fargue, Poètes d'Aujourd'hui, Paris.
André Rousseaux: *Le Monde Classique*, Paris, 1951.
René Lalou: *Les Etapes de la Poésie Française*, Paris. 1951.